রবীন্দ্রদর্শন

রবীন্দ্রদর্শন

শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
পবিত্রকুমার রায়
নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৭৫

CENTRE OF ADVANCED STUDY IN PHILOSOPHY
VISVA-BHARATI · SANTINIKETAN
কর্তৃক প্রকাশিত

সাধনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৭৬ বিপিনবিহারী গাংগুলি স্ট্রীট · কলিকাতা ১২
কর্তৃক মুদ্রিত

আশীর্বাদ

বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য মহাশয় সম্পাদিত এবং বিশ্বভারতীর তিন জন নবীন কর্মীর সহযোগিতায় রচিত 'রবীন্দ্রদর্শন' পুস্তকটি ভবিষ্যৎ রবীন্দ্রালোচনার পক্ষে অপরিহার্য হইবে বলিয়া আশা করি।

এই পরিকল্পনাটি যাঁহাদের প্রচেষ্টায় সফল হইল তাঁহাদের সকলকেই আমার আশীর্বাদ ও শুভকামনা জানাইতেছি।

১৯শে পৌষ, ১৩৭৫
উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন

প্রতিমা দেবী

মুখবন্ধ

'দার্শনিক' শব্দটি তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে দার্শনিক বলতে আমরা তাঁকেই বুঝি যিনি অপ্রাকৃত এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলী আংশিক অথবা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং সেই উপলব্ধির প্রসাদেই মানুষের যা-কিছু পরমার্থ এবং তার নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের যা-কিছু মূলসূত্র সবগুলিই সুন্দরভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে একজন শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের দার্শনিক।

সঙ্কীর্ণ অর্থে 'দার্শনিক' শব্দে আমরা অন্য এক গোষ্ঠীর চিন্তাশীল লোকদের বুঝি। এঁদের চিন্তাধারা মূলত তত্ত্ব-আবিষ্কারের পথে চলে না। সত্যদ্রষ্টা কবি-ঋষিদের আবিষ্কৃত তত্ত্বাবলী এঁরা সুসংহতভাবে আলোচনা, বিশ্লেষণ ও বিচার করেন, এবং বিশ্বাস করেন যে এই জাতীয় প্রয়াসের ফলে, এবং এরই মাধ্যমে ভবিষ্যতে কোনো দিন তত্ত্বলাভ হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ত প্রথম থেকেই তাঁরা তত্ত্বের কিছুটা আভাস পেয়ে থাকেন, কিন্তু সেই আভাস নিশ্চয়াত্মক স্থিররূপ গ্রহণ করতে পারে একমাত্র বিচার-বিশ্লেষণ, যুক্তি-তর্কাদির মাধ্যমে। এই সঙ্কীর্ণ অর্থে রবীন্দ্রনাথ একদিক থেকে মাত্র আধা-দার্শনিক, অন্যদিক থেকে একেবারে অ-দার্শনিক। তাঁর কাব্যগ্রন্থাদিতে কোথাও তিনি অনুভূত তত্ত্বাদির শাস্ত্রসম্মত বিচার-বিশ্লেষণ করেন নি, যুক্তি-তর্কের অবতারণা আদৌ করেন নি, কেবল অনবদ্য রসাত্মক বাক্যে সেগুলি অপূর্ব ভঙ্গীতে প্রকাশ করে গেছেন। অন্যদিকে আবার *'Sadhana'*, 'মানুষের ধর্ম', *'Personality'*, *'Religion of Man'* প্রভৃতি গ্রন্থে সঙ্কীর্ণ দার্শনিকের মতো কিছুটা বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু স্পষ্টতই বিচার-বিশ্লেষণ সেখানে গৌণ, তত্ত্ব-আবিষ্কারের অঙ্গীভূত। বিচার-বিশ্লেষণের প্রাধান্য সেখানে নেই। সঙ্কীর্ণ অর্থে দার্শনিকরা কিন্তু বিচারাদিরই প্রাধান্য দেন।

'দার্শনিক' শব্দের সঙ্কীর্ণতর অর্থে কেবল তাঁরাই দার্শনিক যাঁদের তত্ত্ব আবিষ্কারের, তত্ত্বোপলব্ধির কোনো বালাই নেই। এঁরা কেবল বিচার-বিশ্লেষণ ও যুক্তি-তর্কের জাল বিস্তার ও তুলনামূলক আলোচনা করেন। এঁদের গ্রন্থে ছত্রে ছত্রে ক্ষুরধার বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বহু দার্শনিক মতবাদ এঁরা একেবারে নস্যাৎ করে দেন, অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে এঁরা কয়েকটি মতবাদকে নিছক সত্য রূপে তুলে ধরতে পারেন, প্রয়োজন হলে এঁরা অপ্রাকৃত ও আধ্যাত্মিক সমগ্র তত্ত্বরাজ্যটিকেই ধূলিসাৎ করে দেন। কিন্তু এঁদের চিন্তাধারা উপলব্ধির মহিমায় মহিমান্বিত নয়। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথকে কেউই দার্শনিক বলবেন না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই অর্থে দার্শনিক হতে চাইবেন না।

অথচ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা দর্শনশাস্ত্র পড়েন বা পড়ান তাঁরা দর্শনের বিষয়বস্তুকে সাধারণত দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থে, এবং অনেক সময় কেবল তৃতীয়, বোঝেন। এঁদের কাছে সুসংহত বিচার-বিশ্লেষণ, কঠোর যুক্তি-প্রয়োগ এবং তুলনামূলক সমালোচনাই দর্শনের মুখ্য কাজ। অবশ্যই এই জাতীয় কাজ যথেষ্ট মূল্যবান। দর্শনের নামে যে যা-খুসি বলবে, এটা যদি বরদাস্ত করা না হয় তাহলে অবশ্যই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

বিচার-বিশ্লেষণ, কঠোর যুক্তি-প্রয়োগ এবং তুলনামূলক সমালোচনা বেশ সুসংহতভাবে করতেই হবে। যাঁরা নিজ প্রয়াসে তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারেন না, যাঁরা অপরের কাছ থেকে তত্ত্ব সংগ্রহ করেন তাঁদেরও এই বিচারাদির কষ্টিপাথরে ঐ সব ধার-করা তত্ত্ব যাচাই করে নিতে হবে। নচেৎ প্রবঞ্চিত হবার সম্ভাবনা। অবশ্য, শুধু বিশ্বাসের জোরে পরের তত্ত্ব গ্রহণ করা যায়। কিন্তু আধুনিক কালে বুদ্ধিগর্বে গঠিত মানুষ এই জাতীয় বিশ্বাসকে জ্ঞাতসারে আমল দিতে চায় না। তাই বর্তমান যুগে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কীর্ণতর দার্শনিকদেরই প্রতাপ বেশী।

রবীন্দ্রদর্শন যতই জনপ্রিয় হোক না কেন, যতই প্রকৃত সুধীজনগ্রাহ্য হোক না কেন, স্কুল, কলেজের দর্শন চত্বরে প্রবেশাধিকার লাভ করতে হলে তাকে ঐ জাতীয় বিচারশুদ্ধ, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষিত এবং হিমশীতল কঠিন যুক্তির আবরণে নিষ্পেষিত হয়ে আসতে হবে। রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিতে এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ হয়তো একেবারেই নিষ্প্রয়োজন, রবীন্দ্রানুরাগীদের কাছে হয়তো সমস্ত ব্যাপারটাই কৌতুকাবহ, এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে বীভৎস। কিন্তু কলেজীয় কৌলীন্যলাভও আধুনিক যুগে অনভিপ্রেত নয়।

সেইজন্যই, সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই, আমার অনুজোপম শ্রীশচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপবিত্রকুমার রায় ও শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রদর্শনের এই কলেজীয় দার্শনিক রূপায়নে ব্রতী হয়েছেন। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রদর্শন-প্রতিপাদ্য চরম তত্ত্বটি—যার অপর নাম 'সত্তা' সেটি—নিয়ে সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কীর্ণতর দার্শনিক ভঙ্গীতে বিশদ আলোচনা করেছেন। শ্রীরায় এই চরমতত্ত্বের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রমতে মানুষের জীবনের পরমপুরুষার্থ কী হবে, তার আধ্যাত্মিক জীবনের রূপটি কী রকম হবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তাকে এক জায়গায় সুসংবদ্ধ করে একটি সামগ্রিক রূপ দিয়েছেন, এবং তাঁর নিবন্ধটি গ্রন্থের শেষভাগে সন্নিবেশিত হয়েছে বলে পাঠক বিনা আয়াসে বুঝতে পারবেন রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা কীভাবে তাঁর সত্তা-চিন্তা ও শ্রেয়-চিন্তার সঙ্গে সম্বদ্ধ।

বিশ্বভারতীর 'Centre of Advanced Study in Philosophy'র উদ্যোগে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হল। প্রথম দুই জন এই Centre-এর অধ্যাপক, তৃতীয় জন অন্য এক বিভাগের অধ্যাপক। তাঁদের এই সমবেত প্রচেষ্টা একেবারে নূতন ধরনের। রবীন্দ্রনাথের দশন সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থই এ-যাবৎ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থটি একেবারে নূতন ধরনের। প্রথম প্রচেষ্টা বলে এতে অনেক ভুলপ্রমাদ ত্রুটি থাকতে পারে—সেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত নয়। তবুও মনে রাখতে হবে, এই পথে এই প্রথম পদক্ষেপ। বিদগ্ধতর অন্য কেউ পরে এই পথে অগ্রসর হয়ে উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ রচনা করুন, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।

২০শে পৌষ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ
বিশ্বভারতী, দর্শনসদন
শান্তিনিকেতন

কালিদাস ভট্টাচার্য

নিবেদন

প্রকাশন মাত্রেই একটি ভূমিকা থাকা আবশ্যক। তদুপরি বক্তব্য বিষয় যদি হয় বহু আলোচিত, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত আর একটি বই লিখবার জন্য নিদেনপক্ষে কিছু অজুহাতের প্রয়োজন।

অদ্যাবধি যে-সব গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের দর্শন বিষয়ে রচিত হয়েছে, সেগুলি সামানাত রবীন্দ্রনাথকে কবি হিসাবেই ধরে নিয়ে, কিঞ্চিৎ অনুকম্পা মিশ্রিত স্বীকৃতি দিয়েছে যে তাঁর কবি-স্বভাবে কিছু দার্শনিকতার বৃত্তি উপস্থিত। এই দৃষ্টিভঙ্গীর যাথার্থ্য-বিচার এই বইয়ের অন্যত্র করা হয়েছে। এইখানে মাত্র এইটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক জনৈক আধুনিক ভারতীয় দার্শনিকের দর্শনচিন্তার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। এই গ্রন্থে কুত্রাপি রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মতবাদকে তাঁর কবিত্বের অনুষঙ্গী মূলহারা ভাবনা হিসাবে গণ্য করা হয় নি। রবীন্দ্রনাথের কবিতার উদ্ধৃতি প্রধানত তাঁর দার্শনিক চিন্তার উদাহরণরূপেই ব্যবহার করা হয়েছে।

এ-কথাও উল্লেখ্য যে আমরা রবীন্দ্রনাথের গদ্য বা কবিতা কোন রচনারই ব্যবহারে প্রকাশের কালক্রম অনুসরণ করি নি দার্শনিক কারণেই। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার সাধারণ সামগ্রিক রূপটিই লেখকদের ধ্যেয়, তাঁর দার্শনিক চিন্তার প্রকাশের কালানু-ক্রমিতা নয়।

এই বক্তব্যের সমর্থনে কিছু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও প্রণিধানযোগ্য। উপরে লিখিত দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে নিঃসন্দেহে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। এ থেকে এ-কথা কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন যে এই গ্রন্থ প্রণেতৃগণ রবীন্দ্রমনীষায় অহেতুক বিচ্ছেদ আরোপ করেছেন। অর্থাৎ কবি রবীন্দ্রনাথ ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ এই দ্বৈত-সত্তা স্বীকার করে প্রথমটিকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয়টি ব্যাখ্যাত হয়েছে, এমন কথা মানার কোন কারণ নেই। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতায় তাঁর স্বাধর্ম্যই মানা হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে কবি রবীন্দ্রনাথ ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের অভেদ কল্পনাই এই গ্রন্থের চিন্তাভূমি। মোট কথা, প্রকাশিত পুস্তকের বাহুল্য থাকা সত্ত্বেও কবি ও দার্শনিকের অভেদ কল্পনার অন্যায্য অভাব বা স্বল্পতাই অধিকতর পরিলক্ষিত হয়।

অকপটেই বলা যায় রবীন্দ্রনাথের দর্শন মানবভিত্তিক। আধুনিক সমাজের সমস্যা, সংক্ষেপে, মানবমুক্তির সমস্যা। সংগ্রাম, হিংসা ও সংহারী-শক্তির ক্রমবর্ধমান চণ্ডতা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই বিচলিত করে তোলে। কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্ত্যে উদার মনীষা মাত্রই এই উদ্ধত সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সোচ্চার। রবীন্দ্রনাথের দর্শনও এই ভাব ও অনুপ্রেরণার পর্ণাঙ্গ উদ্বোধন। "যে একলা মানুষ সেখানে তার প্রকাশ নেই।" মানুষের একাকিত্বের বেদনা পরাভূত মানুষেরই সৃষ্ট ঐক্য-চেতনায়। এই ঐক্য মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে বিশ্বের — তাবৎ তথ্যকূটের ঐক্য। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ

দার্শনিক মেধা এই ঐক্য-চিন্তার বিশ্লেষণে নিয়োজিত। বিশ্বের মূল রহস্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে-ঐক্যে বা সামঞ্জস্য-চেতনায়, রবীন্দ্রনাথের কাছে তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে 'বৈজ্ঞানিকে'র বিধি অন্বেষণ নয়, সৃজনশীল মানবের কৃতি-নির্ভর। সামঞ্জস্য হয়ে নেই—বিধান করতে হয়।

এই গ্রন্থে প্রতিপাদ্য বিষয় তাই রবীন্দ্রনাথের দর্শনে সামঞ্জস্য-চেতনা এবং লেখকদের মতে সামঞ্জস্যই তাঁর দর্শনের মূল ভাবধারা। এই গ্রন্থ এক অর্থে তিনটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকার সংযোজন। সত্তায়, আদর্শে ও সমাজে মানবমনের সামঞ্জস্য-প্রয়াসই যে মূলসত্য তা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। সামগ্রিক সাফল্য বা পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা কতটা সফল হয়েছে তা সহৃদয় পাঠকের বিচার্য। আর একটি কথা বলা প্রয়োজন যেহেতু রবীন্দ্রমনীষার বিস্তার অকল্পনীয়। রবীন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তা আরও নানা দিক দিয়ে আলোচনা করা যায়—সে কথা বলাই বাহুল্য এবং লেখকরাও সেই বিষয়ে অনবহিত নন। কেবল সামর্থ্য ও স্থানাভাবই এই গ্রন্থের প্রস্তাবিত রূপ ও পরিকল্পনার জন্য দায়ী। তবে দার্শনিক কৌতূহল অতৃপ্ত থাকবে এমন আশঙ্কা বর্তমান গ্রন্থের স্বল্প পরিসর সত্ত্বেও পোষণ করার কোন কারণ নেই বলেই লেখকদের বিশ্বাস। পূর্ব-প্রকাশিত রবীন্দ্রদর্শনের আলোচনামূলক গ্রন্থনিচয়ে সর্বক্ষেত্রেই কিঞ্চিৎ শিথিল ঢিলেঢালা পদ্ধতির আলোচনা-রীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রচলিত দার্শনিক রীতি এই পুস্তকে প্রয়োগ করতে গিয়ে হয়তো অনেক ক্ষেত্রে নৈয়ায়িক সততা রক্ষার্থে আপাত-দুর্বোধ্যতা এসে থাকতে পারে। প্রথম প্রচেষ্টার এই অনিবার্য অথচ অনভিপ্রেত ত্রুটি আশা করি পাঠকের ক্ষোভ বৃদ্ধি করবে না।

বাংলা ভাষায় দর্শনের কোন স্বীকৃত পরিভাষা নেই বলে কোন শব্দ-নির্ঘন্ট দেওয়া গেল না। গ্রন্থের সর্বত্র মোটামুটি 'চলন্তিকা' অভিধানে অনুসৃত বানান-রীতি মানা হয়েছে। আন্তরিক প্রয়াস ও প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও হয়তো বহু স্থানে নানা প্রমাদ লক্ষিত হতে পারে। এর জন্য পাঠকবর্গের কাছে আমরা মার্জনা প্রত্যাশা করি।

অবশেষে এই গ্রন্থ প্রণয়ন-পরিকল্পনার অনুপ্রেরণার জন্য বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশ্বভারতী দর্শনভবনের অধ্যক্ষ ও অধুনা উপাচার্য শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য মহাশয়ের সুযোগ্য সম্পাদনা ব্যতীত এ-পুস্তক প্রকাশ কদাপি সম্ভবপর ছিল না। বহু শ্রম স্বীকার করে তিনি স্বয়ং এই পুস্তকের সমগ্র পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছেন ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিয়েছেন। এ-গ্রন্থে কোন উৎকর্ষ যদি সাধিত হয়ে থাকে তার জন্য তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। যদিচ ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য লেখকরাই সম্পূর্ণ দায়ী। বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের কুশলী কর্মী শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের ও সুহৃদ শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অনলস শ্রম ও তৎপর সহযোগিতা ব্যতীত এই গ্রন্থের প্রকাশন বহুলাংশে হীন হতো। লেখকরা এঁদের কাছে তাই ঋণী। শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঠাকুরের আশীর্বাদের জন্য আমরা তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে ঋণী রইলাম।

শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
২০শে পৌষ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ পবিত্রকুমার রায়
শান্তিনিকেতন নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

সত্তাদর্শন

শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দার্শনিকতার স্বরূপ ও রবীন্দ্রনাথ

কবি হওয়ার (তাও আবার অসামান্য হলে) সর্বাপেক্ষা বড় অসুবিধা সত্য কথা সুন্দর করে বলার দক্ষতা। সত্য কিঞ্চিৎ গুরুগম্ভীর, কুঞ্চিত-ভ্রূ, কপোল-কীলিত-কর দার্শনিক-দের সাধনার পরিণাম; তা সহজ হলে না সত্য, না দার্শনিক কারও মর্যাদাই রক্ষিত হয়। অবশ্যই এটা প্রহসন, কিন্তু এর পিছনে বেশ কিছু তথ্য আছে। রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক কি না—এটা দার্শনিক জিজ্ঞাসা হতে পারে—কিন্তু এ সংশয় যদি মাত্র উদ্ভূত হয় রবীন্দ্র-নাথের কাব্য-প্রতিভার বিস্তার থেকে, তাহলে নিশ্চিত সেটা যুক্তি নয়—দার্শনিকতা ত নয়ই। অথচ, দুর্ভাগ্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই জাতীয় আলোচনা প্রায়শই শুনতে হয়। এ আলোচনা দু-ভাবে চরম-পন্থীর অসারতা প্রকাশ করে। প্রথমত, কবিরা ভাবেন, দার্শনিক হলে কবির যে সহজ সুষমা সেটা স্বভাবতই অস্বীকৃত হবে (পাঠকের কাছে অবশ্যই নয়, কিন্তু অলিখিত সাহিত্যের ইতিহাসে)। অপর পক্ষে দার্শনিকরা ভাবেন, বা ভাবতে চেষ্টা করেন যে কবির চিন্তা অতি শিথিল, সৌন্দর্যপিপাসু; অতএব বিশ্ব-সত্যের উগ্র অনুসন্ধান ও ক্ষুরধার বিশ্লেষণ তাঁর সামর্থ্যের বাইরে। সেক্ষেত্রে কোনও কবিকেই দার্শনিকের মর্যাদা দিতে তাঁদের বাধে। এ সমস্যা পাশ্চাত্ত্য জগতেও দেখা দেয়নি তা নয়। তবে রবীন্দ্রনাথের বিশাল প্রতিভা এই দ্বিধা ও হাস্যকর দৃষ্টিভঙ্গীকে তীক্ষ্ণ আকারে তুলে ধরেছে। রবীন্দ্রনাথ যে (পাশ্চাত্ত্য জগতে, গ্যেটে, লুক্রেশিয়াস ইত্যাদি, কবি-দার্শনিক) প্রতিভার অধিকারী ছিলেন সে জাতীয় প্রতিভা সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে দর্শন ও সাহিত্য উভয়কেই সমৃদ্ধ করেছে। তাই এ সমস্যা এত বিরাট ভাবে পৃথিবীতে কখনও ওঠেনি। অর্থাৎ অন্তে এই দুপক্ষই কবি ও দার্শনিক সত্তায় পরস্পর বিরোধ আরোপ করেছেন। শ্রীবিশ্বনাথ নারাবানে[১] এ বিষয়ে সুন্দর উক্তি করেছেন। টম্‌সনের মতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাশৈথিল্যের জন্যই তাঁর দার্শনিক অপটুতা ও অনিশ্চয়তা এসেছে। এরই উত্তরে শ্রীবিশ্বনাথ নারাবানে বলেছেন "টমসন যেটিকে দ্বিধা মনে করেছেন, বস্তুত সেটিই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর ঔদার্য ও পরমত সহিষ্ণুতা"। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক কুশলতায় ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ও যথেষ্ট আস্থা পোষণ করেন নি। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাকে কোনও সমস্যানিয়ামক চিন্তার পর্যায়ে ফেলা যায় না। তিনি যা প্রকাশ করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে সৌন্দর্য-চেতনারই ফল। অর্থাৎ প্রজ্ঞার (দার্শনিক জ্ঞান ও উপলব্ধির)

১ V. S. Naravane, *Rabindranath Tagore : A Philosophical Study*, (Allahabad : Central Book Depot) p. 59.

পথ ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ প্রেম ও সৌষম্যের পথেই তাঁর ভাব প্রকাশ করেছেন।[২] অপরপক্ষে অনেকে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত কবিত্বের উপর অহেতুক দার্শনিকতার প্রভাব আবিষ্কার করেছেন।[৩] সোনার তরীর 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার মর্মোদ্ধার প্রয়াসে সমালোচক লিখেছেন, "এই কবিতায় প্লেটোর জীবন-স্মৃতি মতবাদ, নিওপ্লেটোনিক মতবাদ— জড়ে আত্মার অস্তিত্ব এবং জার্মান দার্শনিক শেলিং-এর একাত্মতা-মতবাদ, যেন একত্র মিশ্রিত হইয়া কবিত্বে মণ্ডিত হইয়াছে"। (মধ্যবর্তী মনোভাব দেখি কিছু সমালোচকদের মধ্যে —যেমন, ডঃ সুশীলকুমার মৈত্র, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ইত্যাদি।) বিরোধ যে বিষয়েই হোক, বিরোধ অবসানের যেখানে সম্ভাবনা নেই সেখানে বিরোধ প্রায়শই বিচারহীন বাক্যব্যবহারে প্ররোচিত করে। এই শূন্যতার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রথমেই ঠিক করে নেওয়া উচিত দর্শন বা দার্শনিকতা বলতে কি বোঝা হয়েছে বা বোঝা উচিত। অতঃপর কোনটিকে আমি 'দর্শন' বলব তা হল নিতান্তই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত যার ইতিহাসে ইতরজন উৎসাহী নয়। বস্তুত যাঁরা মনে করেন রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক নন, তাঁরা এই নিগমনে এসেছেন কোন্ ব্যাপ্তি-জ্ঞান সঞ্চারে?

"যাঁরা কবি, তাঁরা দার্শনিক নন,
রবীন্দ্রনাথ একজন কবি
———————————
রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক নন।"

এই অনুমানের বলে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতা অস্বীকার করতে হলে প্রাথমিক বাক্যটির সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে হয়। অথচ তা হওয়া সম্ভব নয়; কেননা দর্শনের নানা ভঙ্গী, নানা চলন; তার মধ্যে কবি, বিশেষ করে ভারতীয় মতে যাঁরা 'ক্রান্তদর্শী', তাঁরা কেন স্থান পাবেন না তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয় দিয়ে নির্ধারিত করতে হলে বলতে হয় প্রায় এমন কোন বিষয় নেই, যা রবীন্দ্রনাথ ভাবেননি; সে অর্থে ধর্ম, নীতি, সত্তা, সত্য, সৌন্দর্য, বিশ্ব, প্রকৃতি, মানব ইত্যাদি নানা পরা ও অপরা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। (সত্য কি মিথ্যা, সেটা প্রশ্ন নয়।) যাঁরা এতৎ-সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকে দার্শনিক বলতে আপত্তি জানান তাঁদের মত,—বিষয়-মাত্র দ্বারা দর্শন অদর্শন—নির্ধারিত হয় না। যদিও বিষয়গোষ্ঠী বিশেষ ধরনের, তবুও তাদের আলোচনা-পদ্ধতির ধারাই 'দার্শনিকতা'র পরিপোষক। এই পদ্ধতি বিচারে রবীন্দ্রনাথ, বা এই অর্থে 'কোনও কবিই দার্শনিক নন'। এই বক্তব্যের মর্মোদ্ধার করার পূর্বে এটুকু বলা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক কি না এটা যদি মাত্র (১) a priori বিচার হয় তাহলে আলোচনা নিষ্ফল, (২) যদি verbal বা ভাষাগত বিচার হয় তাহলে বাক্যটি মিথ্যা, (৩) যদি সঠিক বিশ্লেষণে নির্ধারিত হয়, তবেই বাক্যটি স্বীকার্য। এই জাতীয় দার্শনিক বিশ্লেষণ করে দেখা কর্তব্য রবীন্দ্রনাথ কি অর্থে দার্শনিক বা দার্শনিক

২ নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, পৃঃ ২-৩।
৩ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি-রশ্মি, ১ম খণ্ড, পরিমার্জিত ৫ম সংস্করণ, (কলিকাতা: ১৩৬৭) পৃঃ ৩১৪।

নন। রবীন্দ্রনাথ যে দার্শনিক এটা অবশ্য, এক অর্থে, প্রমাণিত করা হয়ত যায় না। বিশেষ করে এ প্রচেষ্টার অসার্থকতা পরিস্ফুট হবে যদি শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ বিষয়ে মতামত আলোচনা করা হয়। লেখক রবীন্দ্র-চিন্তার প্রভূত বিস্তার জন্য—বিশেষ করে বহুধারায়—যে দুরূহতা, তা সুন্দর ভাবেই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তথাপি দার্শনিকতার বিচারেঃ "যদিও এই ভাবে দার্শনিক বিষয় তাঁর কবিতা ও অন্য রচনার একটি মূল প্রেরণার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তবু এ কথাটি আমাদের বিশেষ করে মনে রাখার প্রয়োজন হবে যে মূলতঃ তিনি দার্শনিক নন, তিনি কবি।···মোটামুটি বলতে পারা যায়, যাকে সাধারণ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বলি তা তাঁর মাঝখানে পাই না।"[৪] এই বক্তব্যের সমর্থনে শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রদর্শনের মূল নিয়ামক করলেন, ঐতিহাসিক স্বাজাত্যাভিমান। উক্ত মনোভাব দর্শনের অনুপ্রেরণা হলেও হতে পারে, কিন্তু দার্শনিক ব্যবহারের সক্রিয় কারণ হিসাবে নিতান্তই অবান্তর—"একদিকে যেমন বাংলার পক্ষ হতে বিশ্বকে কিছু শোনাবার ইচ্ছা সাহিত্য রচনায় তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল, সেইরূপ অতীতের ঋষির অমৃতবাণীকে নূতন করে জীবনে প্রতিফলিত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ সম্ভবতঃ দর্শনরচনায় তাঁকে প্রণোদিত করেছিল"[৫] উপরের উদ্ধৃতি গুলিতে কিছু অস্পষ্টতা প্রথমেই চোখে পড়ে—(ক) 'মূলতঃ কবি'—মূলত অর্থে যদি হয় পারিমাণিক বিচার তাহলে অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু মূলত অর্থ যদি হয় মুখ্যত, অর্থাৎ প্রধানত তিনি কবি ও গৌণত তিনি দার্শনিক অথাৎ দর্শন গৌণ, তাহলে বোধ হয় অবিচার করা হবে। দর্শন যিনি করেছেন তিনি হয় তাতে সফল হয়েছেন, নচেৎ হননি। তিনি যদি সফল হন তাহলে সেটা 'মূলতঃ'ই করুন আর 'অ-মূলতঃ'ই করুন সে কথা দার্শনিকতা বিচারে অবান্তর, যদিও ঐতিহাসিক বিচারে এর সারবত্তা থাকতেও পারে।

দ্বিতীয়ত, "প্রাচীন ঋষির বাণী নূতন করে জীবনে প্রতিফলিত করাই তাঁর দার্শনিক অনুপ্রেরণা" হতে পারে, নাও হতে পারে; এটাও ঐতিহাসিক বিতর্ক। কেননা "জীবনে বাণী প্রতিফলিত" করার জন্য নবতর বাণী প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা নেই, অন্তত সে 'প্রয়োজনীয়তার' আবশ্যিকতা (necessity) নেই, এটা নিছক আকস্মিক (accidental)। তাতে এটাও মানা হয় যে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় দার্শনিক সততা বা সত্যান্বেষণ ছিল না। অবশ্যই শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা বলতে চান না। এ অস্পষ্টতার মূল কিন্তু সেই উপরি-উক্ত দর্শন সম্বন্ধে একটা বিশেষ 'দৃষ্টিভঙ্গির' সার্বভৌমিকত্ব স্বীকার—"তাঁর মানসিক গঠন সেই ধরনের যা কবির দেখা যায়। তা ভাবপ্রবণ, তা অনুভূতিপ্রধান, তা শুষ্ক, নীরস, সূক্ষ্ম বিতর্কমূলক বিচারে পরাঙমুখ"।[৬] এ নিতান্তই অসার। প্লেটো, বের্গসঁ এঁদের দার্শনিকতা কি শুষ্ক? ('শুষ্ক', 'সরস'—এ পদব্যবহার কোনো গুরুতর চিন্তা সম্বন্ধে কি করে প্রযুক্ত হয়, ভাবলে ব্যাহত হতে হয়।) যাই হোক, এ জটিলতা চিন্তা

৪ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-দর্শন, (কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৯) পৃঃ ১৯-২০।
৫ ঐ, পৃঃ ১৮।
৬ ঐ, পৃঃ ২০।

থেকে মুক্ত করতে হলে মোটামুটি 'দার্শনিকতা' পদটির ব্যবহার বিশ্লেষণ করা নিতান্তই প্রয়োজন।

('দর্শন' (philosophy) শব্দের সংজ্ঞা নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতবিরোধের অন্ত নেই। কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে (বিশেষ করে পাশ্চাত্যে) 'দর্শন' শব্দের নানা অর্থ করা হয়েছে। প্রাচীন গ্রীক অর্থে জ্ঞান-প্রেম। এরই জন্য এ্যারিস্টটলের মতে দর্শন সুরু হয় বিস্ময় থেকে। কিন্তু কিসের বিস্ময়? যা আছে সব কিছুরই বিস্ময়—সব কিছু বিষয়ে বিস্ময় ('বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান')। অর্থাৎ অন্তে অস্তিত্বের বিস্ময়। কোন একটি জিনিস 'কি ভাবে আছে' অর্থাৎ তার গুণাবলী, তার বৈশিষ্ট্য আমাকে বিস্মিত করে, যেমন এই পৃথিবী—এর অসংখ্য গুণ, সম্বন্ধ সব মিলিয়ে এ আমাদের কাছে এক পরম বিস্ময়; কিন্তু এত গেল রূপের কথা—রসের কথা। মাত্র এর থাকাটা—পৃথিবীর 'কেবল সত্তা'—এটাও কম বিস্ময়ের নয়। অকস্মাৎ যেন মনে হয়—'কি আশ্চর্য, আমি আছি—এ পৃথিবী আছে'। কিন্তু কেন আছে? এ জিজ্ঞাসা অন্তহীন—এ 'চির প্রশ্নের বেদী' সম্মুখে নানা দার্শনিক নানা মতের অবতারণা করেছেন। খুব অস্পষ্টভাবে বলতে গেলে এই 'অস্তিত্বে'র রূপ-মাত্র নয়, তার খ্যাতিতেও যাঁরা জিজ্ঞাসু হলেন—গভীর প্রশ্নের অবতারণা করলেন তাঁরাই দার্শনিক। এ অর্থে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিতই দার্শনিক। আরও বিশদ করা যাক। 'দর্শন' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল 'দেখা'। অর্থাৎ যে কোন দেখাই এক অর্থে দর্শন। কিন্তু তাহলে একটা পাখী দেখাও দার্শনিকতার পরিচায়ক। অথচ তা স্বীকার করা যায় না। এ অর্থ নিলে সবাই দার্শনিক। অর্থাৎ, দেখার অর্থ করতে হবে 'গভীরে দেখা'। সার বস্তুর অন্বেষণ—কোন অস্তিত্বের মূল-অন্বীক্ষণ করাই হবে দর্শন অর্থাৎ বিশেষ দেখা নয়—সাধারণকে বিশেষের মধ্যে আবিষ্কার করা। এই সাধারণীকরণের গভীরে পৌঁছাতে যে-দৃষ্টি তারই নাম 'দর্শন'।)

সংস্কৃতে অবশ্য 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ ঘটে অনেক পরে, "ষড়দর্শনসংগ্রহে" প্রথম আধুনিক অর্থে 'দর্শন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তৎপূর্বে অবশ্যই দর্শন ছিল, কিন্তু বিভিন্ন শব্দের দ্বারা দর্শনের প্রকারভিন্নতা জ্ঞাপিত হত, যেমনঃ 'ত্রয়ী', 'আন্বীক্ষিকী', ও 'বার্তা'। প্রথমটিতে সূচিত হত তথাকথিত অধ্যাত্ম-জ্ঞান বা তত্ত্ব-বিদ্যা; দ্বিতীয়টির দ্বারা ন্যায় বা বিচার ও পর্য্যালোচনা (অনেকেই অজ্ঞতাহেতু এটিই দর্শনের একমাত্র অর্থ ধরেন এবং সেই সূত্রে স্বাভাবিক ভাবেই রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতায় সংশয় প্রকাশ করেন)। "শব্দকল্পদ্রুম" 'দর্শন' শব্দের অর্থে দুটিই অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যথাঃ 'বুদ্ধি', 'উপলব্ধি'। অর্থাৎ দার্শনিকতার একটি সরল অর্থ হবে উপলব্ধি। তৎ তৎ উপলব্ধি নয় যার দ্বারা বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের গ্রহণ হয়, সেই জাতীয় উপলব্ধি-সামান্য যার দ্বারা মূল রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। অবশ্য অনেকে মনে করতে পারেন এ পরাজ্ঞান আসে বুদ্ধিমাধ্যমে। কারও বা মতে উপলব্ধিমাধ্যমে। আবার কেউ বা তৎ-সামান্যেই সংশয়ী হতে পারেন, হতে পারেন জ্ঞান-সংশয়ী। কিন্তু এঁরা প্রকৃত অর্থে সকলেই হবেন দার্শনিক। রবীন্দ্রনাথকে এর কোনটির মধ্যেই না পাওয়া অন্যায়ই নয় অজ্ঞতাও বটে। যাই হোক আমাদের বক্তব্য

হল, 'দর্শন' শব্দের প্রচলিত বা ঐতিহ্যবাহী এমন কোনও অর্থই পাচ্ছি না যেটি এক এবং যার সুবাদে নিশ্চিতরূপে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক নন। রবীন্দ্রনাথ হয়ত 'আন্বীক্ষিকী' অর্থে দর্শন করেন নি, কিন্তু 'ত্রয়ী' অর্থে করেছেন। পরে আমরা রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক পদ্ধতি বিচার কালে দেখব তিনি প্রকৃত জ্ঞানলাভে বুদ্ধি ও বিচার নিষ্ফল মনে করতেন। কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্ত্যে দর্শন অর্থে এক চূড়ান্ত জ্ঞান-সামান্যীকরণ বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক দুজন স্টেশনে ট্রেন ধরতে গেছে। কিঞ্চিৎ দেরি হওয়ায় দুজনে ট্রেন পেল না, অর্থাৎ তাদের উদ্দিষ্ট স্থানে যাওয়া হল না। তার মধ্যে একজন, ধরা যাক 'ক', বলল "ইস্ ট্রেনটা পেলাম না"। 'খ' এ বাক্যে সায় দিয়ে খানিকটা বিস্ময়, খানিকটা বেদনা নিয়ে বলল "জীবনে এম্নি করেই সব কিছু হারাতে হয়"। 'খ' যে দার্শনিকতা করল 'ক'র বুঝতে একটুও দেরি হল না, কিঞ্চিৎ উষ্ণ হয়ে সে বলল "থাক্ থাক্ আর দার্শনিকতা করতে হবে না।" এ উদাহরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে দর্শনের সাধারণ ব্যবহার। বিশেষ একটি ঘটনা, "কোনও একদিন, কোনও এক সময়ে, কোনও একজন, কোনও এক ট্রেন পেল না"—এই বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত করে অর্থাৎ স্থান কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়ে, বিশেষ বিষয় অর্থাৎ ট্রেনের জগতের বাইরে নিয়ে 'খ' প্রকাশ করল এক অতি-সাধারণ বা সামান্য বাক্য (generalization)—এটাকেই বলা যেতে পারে মূল দার্শনিক ভঙ্গী। অর্থাৎ বিশেষ কোনও জ্ঞান থেকে মূল সত্যে উপনীত হই এক অবিশেষ সাধারণ জ্ঞানমাধ্যমে। অনেকে মনে করতে পারেন বিজ্ঞানও ত তাই করেন তাহলে দুটিতে পার্থক্য কি?

এ সমস্যা দর্শনশাস্ত্রে বহুভাষিত এবং এই গ্রন্থে এটি পুনরায় আলোচিত হওয়া অবাঞ্ছিত। মাত্র এটুকু বলা উচিত যে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে নিবিড় যোগ থাকলেও প্রচুর পার্থক্য—(১) বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতালব্ধ (ইন্দ্রিয়ানুগ) উপলব্ধির এক বিশেষ ধারা আছে, তাকে বলা যেতে পারে 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি'। কিন্তু দর্শনের এমন কোনও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই জ্ঞানের গ্রহণ বা পরিবেশনে—বিভিন্ন পদ্ধতির সমাহার এখানে দেখা যায়। (২) বিজ্ঞানের অপেক্ষাও অধিকতর সাধারণ স্তরে দর্শন প্রকাশিত হয়—দার্শনিক বাক্যকে এই অর্থে 'সামান্যতম' (highest generalization) বাক্য বলা যেতে পারে। এবার আলোচনা করা যাক বিভিন্ন প্রকার দর্শনের মূল পার্থক্য-নির্ণয়ী অভিজ্ঞতা-উৎসের।

দর্শনের ইতিহাস কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করলেই দেখা যাবে প্রধানত দুটি ধারায় দার্শনিক প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়েছে—(১) অভিজ্ঞতা-অজন্য বুদ্ধি দ্বারা ও (২) অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। প্রথমটি ভারতবর্ষের দার্শনিক চিন্তায় কখনই প্রযুক্ত হয়নি। অতএব দ্বিতীয় পন্থাটি নিয়ে আলোচনা করা বিধেয়। এই পন্থাটি আবার দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটিকে বলা যেতে পারে (১) 'পর্যবেক্ষণের' পথ, অপরটিকে বলা যেতে পারে (২) 'তন্ময়তার' (তৎ+ময়) পথ। অভিজ্ঞতায় তন্ময়তার পথ এক ধরনের আত্মকরণের পথ—পাশ্চাত্ত্য-দর্শনে যাকে বলা হয় 'স্বমুখীনতা' (subjective)।

কোনও এক ঘটনার সম্মুখীন হয়ে আমি বহু সময় সেই ঘটনায় অবগাহন করি, অংশীদার হই। সমস্ত পরিবেশটি, ঘটনাকে কেন্দ্র করে, আমাকে আচ্ছন্ন বা অঙ্গীভূত করে। এই অমোঘ আচ্ছন্ন-ভাব হয়ত আমি একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কাটিয়ে উঠতে পারি—বিচার করতে পারি—দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারি। তৎসত্ত্বেও প্রাথমিক অভিজ্ঞতায় (এ জাতীয় অবস্থায়) আমি যে আপ্লুত হলাম, একাঙ্গীভূত হলাম এটা অনস্বীকার্য। অভিজ্ঞতা থেকে এক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিত্বকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার প্রশ্নই ওঠে না। অথচ অনুভবের এই প্রগাঢ়তা পরিবেশ পরিচয়ে আনে কিছু বৈশিষ্ট্য। কোনও বস্তু বা ঘটনার সম্মুখীন হয়ে তার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে ফেলা—এই নির্বন্ধ ব্যক্তিচৈতন্যে আনে এক ধরনের অস্বস্তি। যে বহির্বিশ্ব জ্ঞেয় মাত্র, এই নিবিড় সাক্ষাৎকারে তা যেন শ্বাসরোধকারী হয়ে আমার উপর প্রস্থাপিত হয়; আর যেন কিছুই আমার ইচ্ছাধীন থাকে না। অনেকটা যেন পাশবদ্ধ লাগে। মুক্তিকামী চেতনার তখন প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব (এই 'দায়িত্ব' এসে পড়াটাই এ জাতীয় অনুভবের বৈশিষ্ট্য) এ থেকে পরিত্রাণ। আত্মরক্ষার নানা কৌশল তখন ব্যবহার করি। খুব সহজ এবং সফল পথ হল সামাজিক নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা—হয়ত বা একটু আত্মস্থ হওয়ার জন্য বোধি (intuition) ব্যবহার করা। আমার জ্ঞানরাজ্যে দূরত্ব আনতে, স্বীয়-পরের ভেদ আনতে, গ্রহণ করি সিদ্ধান্ত—পরিস্ফুট মূল্যায়নের পথে। একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে পরিষ্কার করা যাক। হয়ত ঘোর নিশীথে আমি পথে ঘুরছি অন্যমনা হয়ে। অকস্মাৎ দেখা হল কোন এক পরিচিত কনিষ্ঠের সঙ্গে বা ছাত্রের সঙ্গে কোনও অবাঞ্ছিত মুহূর্তে বা স্থানে। এটি নিঃসন্দেহে একটি ঘটনা। কিন্তু যেহেতু আমি এ ঘটনার মধ্যে স্থিত, আমি হলাম অস্বস্ত, ক্ষুব্ধ—কিছুটা অসহায় ও ভীতও বটে। আমার তখন প্রথম কর্তব্য এ থেকে উত্তরিত হওয়া। ব্যবহার করলাম সুনিশ্চিত মূল্যায়ন—"একি! তুমি এ সময়ে এখানে কি করছ?" অর্থাৎ এটা অন্যায়! আমার সিদ্ধান্ত আমাকে বাঁচিয়ে দিল। একটা নির্দিষ্ট ভাবধারার আশ্রয় নিতে হল আমাকে—ভাল লাগা, মন্দ লাগা বা অবহেলা করা, এই দৃষ্টিভঙ্গী আমাকে যেমন ঘটনাটি পরিগ্রহে সাহায্য করল, তেমনই অনিবার্য ভাবে প্রবুদ্ধ করল প্রদত্ত পরিবেশকে মূল্যমণ্ডিত করতে—জ্ঞান ও আবেগের এক মিশ্র দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে। অভিজ্ঞতার এই এক পর্যায়। এ পর্যায়ে সত্য আকৃতিময়—'ফ্যাক্‌ট' ও 'ভ্যালু' অঙ্গাঙ্গী জড়িত। ব্যক্তির চৈতন্যে সত্য মাত্র উদ্ভাসিতই নয়, রঞ্জিতও। এই সিদ্ধান্তশীল দৃষ্টিভঙ্গী উদ্ভূত হয় আত্মরক্ষার তাগিদে। অভিজ্ঞতার জড়তা যেন প্রাণময় হয়ে উঠে,—হয় সার্থক, ব্যক্তিমানস স্পর্শে। এমতাবস্থায় বিষয়কে ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, অভিজ্ঞতার আর একটি ধারাকে বলতে পারি 'পর্যবেক্ষণ'। এ প্রথায় কর্তা ও বিষয় সুরুতেই বিচ্ছিন্ন—ঘটনা বা পরিবেশে দুইয়ের কোনও সম্মিলনক্ষেত্র রচিত হয় না। যা দেখি সেটা আমি হতে পৃথক—দূরস্থিত; আমাকে তা পাশবদ্ধ ত করেই না, এমন কি ব্যক্তিগত আবেগের কারণ হলেও বিষয়ের অস্তিত্ব বা সত্য এবং আমার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে স্বতন্ত্র রাখি। পর্যবেক্ষণে ব্যক্তি কখনও অভিভূত হয় না। অপ্রস্তুত থাকে না—

দ্রষ্টার থাকে ইচ্ছাধীন, সচেতন মনঃসংযোগ। ফলে সব ঘটনাই উপস্থিত হয় সমমূল্যের দাবী নিয়ে—বস্তুত মূল্যনিরপেক্ষ হয়ে। এটাকে বিজ্ঞানের পথ বলা যায়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, বিবরণে আবেগ পরিহার করে—বিবৃতি-বাক্য ও আকুতি-বাক্যের সমন্বিত ঐক্যে তাই বিজ্ঞান উৎসাহী নয়। ঘটনা-প্রকৃতি নির্ণয়ে মূল্যায়ন মাত্র অপ্রয়োজনীয়ই নয়, অপ্রমার জনকও হতে পারে। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ বিবৃতির প্রমেয় সংগ্রহে ব্যস্ত। তন্ময়তা এদলের মতে সত্য দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে। এ জ্ঞানের প্রমাণ স্বভাবতই ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি :বোধি এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। যাঁরা দর্শন বলতে 'আন্বীক্ষিকী' বোঝেন তাঁরা সকলেই এই মতাবলম্বী। কিন্তু এ পথে আবার নবতর সমস্যা দেখা দেয়। বিষয় বা ঘটনা বা গৃহীত পরিবেশ যদি মূল্যনিরপেক্ষ হয় তাহলে মূল্যমান নির্ণয় করি প্রাথমিক প্রত্যক্ষে নয়, অপর কোন স্বেচ্ছাচারে বা সর্বজনসম্মত তন্ত্রপ্রয়োগে। কিন্তু উৎসে বা আদিতেই যদি মূল্য না থাকে তাহলে সত্যের মূল্য যাচাইয়ের সার্থকতা কি? যে ধারা-প্রয়োগেই মূল্যায়ন করি, সে ধারার যাথার্থ্য কি? এ সমস্যা তাই এ জাতীয় অভিজ্ঞতা-বাদীদের চিরন্তন সমস্যা। যা আদিতে নেই, তা অন্তে বা মধ্যে আনা ন্যায়সম্মত হয় না। উপরের অভিজ্ঞতাশ্রয়ী দার্শনিকতার দ্বিধারার পর্যালোচনায় এটা স্বভাবতই মনে হয় যে দ্বিতীয় পদ্ধতি সুখবোধ্য কেননা সহজ ও সাধারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য; জটিলতাও কম, যেহেতু সত্যাসত্য নির্ধারণ বহুলাংশে ব্যক্তিনিরপেক্ষ। বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয়ে ব্যক্তি-তান্ত্রিকতা বা মানব মূল্যায়ন অপরিহার্য নয়। দার্শনিকের অন্বিষ্ট যদি প্রমা বা সত্যজ্ঞান হয়, সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় পন্থা শ্রেয়। কিন্তু 'এহো বাহ্য'। প্রকৃত দার্শনিক ভঙ্গী বজায় রাখলে দেখা যাবে দ্বিতীয় পথটিও অন্তে প্রথম পথের রাজ্যে প্রবেশপ্রার্থী। এটি বিশদ করতে এখন যা বলা হবে তা অধুনা পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মহতী সমস্যা। অতএব বিস্তৃত আলোচনা করতে হলে এ পরিসর নিতান্তই স্বল্প এবং আমাদের মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থীও বটে। মাত্র কয়েকটি কথা এ প্রসঙ্গে বলে এই দুই ধারার সম্পর্ক দেখাবার প্রচেষ্টা করা যাক।

দ্বিতীয় ধারার সর্বজনস্বীকৃত আদর্শ দৃষ্টান্ত বিজ্ঞান। বিজ্ঞান যদিও বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে বিশ্বাসী তথাপি তার সাংগঠনিক সততার জন্য প্রয়োজন এই বিশেষ অভিজ্ঞতা-কূটকে সামান্য বাক্যে সংশ্লিষ্ট করা। অর্থাৎ বিজ্ঞান মাত্র খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতার সমষ্টি নয়, বিধি-নিয়ন্ত্রিত জ্ঞানতন্ত্র। এখানেই এক প্রবল সমস্যা পাশ্চাত্ত্য নৈয়ায়িকদের বিপর্যস্ত করছে। বিশেষ থেকে সামান্যে যাওয়ার কোন যুক্তিগ্রাহ্য প্রবাহ নেই। যাকে বিজ্ঞানে বিধিবাক্য (laws) বলা হয় তার অর্থ ও সত্যতা নির্ধারণেরও কোন সুবিদিত বা ন্যায়সম্মত মান এযাবৎ অজ্ঞাত (অনেকেরই মতে অজ্ঞেয়)। তাহলে এ বিধিবাক্যের যাথার্থ্য নির্ধারিত হবে কি ভাবে? অনেক পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর মতে বিধি-বাক্যগুলির দ্বারাই সমগ্র বিজ্ঞানের সত্যাসত্য নির্ধারিত হয়। অথচ তাদের সত্যাসত্য নির্ধারণের পথ জানা নেই। এ কারণেই অনেকের মতে বিজ্ঞানের সর্বান্তিক যোগ্যতা মাত্র 'প্রচলিত মত-সামঞ্জস্য' (conventionalism; যথা: Duhem, Poincare, ইত্যাদি)। আবার কারও কারও মতে বিজ্ঞানের মূল অন্বিষ্ট 'সারল্য' (simplicity—অবশ্য এ পদটিকে

একটি বিশেষ অর্থ দেওয়া হয় — কিন্তু তৎসত্ত্বেও মতবিরোধ আছে) — কারও মতে বা 'সৌন্দর্য'। অর্থাৎ বিবরণ যদিও মূল্য বা আকৃতি নিরপেক্ষ — বিবরণের মূলে নিবিষ্ট সেই আবেগবীক্ষিত ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সিদ্ধান্তরাশি। এই অর্থেই প্রথমে বলেছিলাম : দ্বিতীয় ধারাটি "প্রথম ধারার রাজ্যে প্রবেশপ্রার্থী"। অতি অল্পে যা বলা হল তাতে অবশ্যই প্রমাণিত হয় না যে দ্বিতীয় ধারা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না বা প্রথম ধারাই একমাত্র স্বীকার্য পদ্ধতি; কিন্তু নিঃসন্দেহে এটি প্রমাণিত হয় যে গভীর দার্শনিক বিশ্লেষণে দুই ধারার বিরোধিতা আপাতদৃষ্টিতে যা প্রতিভাত হয় তদপেক্ষা অনেক কম। এতদ্ব্যতীত প্রথম ধারা এমন কিছু অবাস্তব বা অযৌক্তিক নয় যাতে এটিকে দার্শনিক পদ্ধতি হিসাবে মানতে হলে বুদ্ধি-কৃপণ হতে হবে। বুদ্ধিতন্ত্রের সর্বোৎকৃষ্ট কাঠামোয় নির্মিত বিজ্ঞানও যদি অন্তে কতিপয় আবেগময় সিদ্ধান্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে, যে দার্শনিক তাঁর পদ্ধতিতে এই তন্ময়তার পথ নির্বাচন করলেন তিনি কিছু অ-দার্শনিক কাজ ত করলেনই না, এমনকি অ-বৈজ্ঞানিক কাজও করলেন না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দার্শনিকতার জন্য অভিজ্ঞতায় তন্ময়তার পথ (১ম ধারা) নিয়েছিলেন। এ পথে বের্গসঁ, হোয়াইটহেড (অংশত), ক্রোচে, সত্তাবাদী দার্শনিকবৃন্দও (existentialists) দার্শনিক সমাধানের প্রচেষ্টা করেছেন। অতএব দেখা গেল 'পদ্ধতি বিচারে' রবীন্দ্রনাথকে অ-দার্শনিক বলার কোনও বিশেষ হেতু নেই। তদুপরি সফল ও প্রখ্যাত দার্শনিকগণের (অবশ্য বিশেষ তত্ত্বপিপাসু দার্শনিকবৃন্দ বা metaphysicians-দের) ন্যায় রবীন্দ্রনাথও মূল একটি দার্শনিক ধারণা বা ভাবধারার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বরহস্য সমাধানের নিদান দিলেন। রবীন্দ্রদর্শনের এই মূল ভাবধারাটির নাম 'সামঞ্জস্য' (harmony) বা 'সমন্বয়'।

যাই হোক, আমাদের মূল বিচার্য ছিল, রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক কিনা। উপরে এটাই দেখাবার চেষ্টা করা হল যে, রবীন্দ্রনাথকে দার্শনিক বলায় কোনও দার্শনিক আপত্তি থাকতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বিনয়বশত নিজেকে দার্শনিক বলতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন;[৭] সেটা নেহাৎই তাঁর নম্রতা বা বিচারের ত্রুটিও হতে পারে। এ আলোচনার উপসংহারে এটুকু বলে রাখা কর্তব্য যে, যে-পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক চিন্তায় অনুসরণ করলেন তা কবিচরিত্র বিরোধী ত নয়ই, উপরন্তু গভীর ও সার্থক কবি-মননের পরিপূরক। অতএব শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বা ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক ও যুক্তিহীন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে দার্শনিক বলা মানেই কোনও একটি বিশেষ দার্শনিক গোষ্ঠীতে প্রস্থাপিত করা নয়, এটাও বলা প্রয়োজন। যদিও ঐতিহাসিক অর্থে তাঁর উপর উপনিষদ, বৈষ্ণববাদ, বৌদ্ধমত ইত্যাদির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তবুও তাঁকে এরই কোনও একটি দলে আবদ্ধ করা অনুচিত ও অযৌক্তিক। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার প্রবল মৌলিকতা তাঁর দর্শনকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। এই কথাটি শ্রীসুধীর নন্দী মহাশয় তাঁর

৭ Tarak Nath Sen, 'Western Influence on the Poetry of Tagore' in *Rabindranath Tagore : A Centenary Volume (1861-1961)*, (New Delhi : Sahitya Academi, 1961).

পুস্তকে দেখিয়েছেন। এমনকি শ্রীসুধীর নন্দী যে রবীন্দ্রনাথকে 'সহজ সমন্বয়বাদী' বলে অভিহিত করেছেন সেটিও ঠিক নয়।[৮] কেননা 'সমন্বয়বাদ'-ও বিশেষ 'বাদ' এবং এ জাতীয় দার্শনিক শ্রেণিবিভাগ সাধারণত সেই সকল দার্শনিকবৃন্দ সম্পর্কেই প্রযোজ্য যাঁরা স্বীয় চিন্তার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনে অসমর্থ। যাই হোক, এ দ্বন্দ্ব হয়ত নিতান্তই ব্যাকরণবিধৃত। রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক কি না—এ প্রশ্নের সদুত্তর মেলে দার্শনিক পদ্ধতির বৈচিত্র্য ও দার্শনিক ভাবধারায় ঐক্যবদ্ধ আকার নির্মাণে। এই দুটিই রবীন্দ্রনাথ অভিব্যক্ত করেছেন তাঁর বিভিন্ন রচনায়, যেমন, 'মানুষের ধর্ম', 'ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন' এবং সর্বাধিক তাঁর *Religion of Man* নামক গ্রন্থে। কোনও একটি মূল ভাবধারার আশ্রয়ে যে যাবতীয় বিশ্বরহস্য ব্যাখ্যাত হয় তা রবীন্দ্রনাথ পূর্ণভাবে দেখালেন *Religion of Man* নামক গ্রন্থে।

এ প্রসঙ্গে হয়ত রবীন্দ্রনাথের দর্শনে বিভিন্ন প্রভাব—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—আলোচনা করা বৈধ হত; কিন্তু এ ব্যাপারে ইতিপূর্বেই নানা লেখকের কুশলী লেখনী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। মোট কথা, প্রাচ্য ভাবধারায় বৈষ্ণববাদ, বৌদ্ধধর্ম ও উপনিষদ তাঁকে বিপুল অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। এতৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রদর্শনের মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য।

এ পরিচ্ছেদ, তাই, শেষ করব শুধু রবীন্দ্রদর্শনের মূল পটভূমিকায় দুটি পূর্বস্বীকৃত বিশ্বাস উল্লেখ করে। এ দুটি হল, (ক) নাস্তিত্ব বা মৃত্যু, (খ) মানবকেন্দ্রিকতা। এ দুটি সত্য রবীন্দ্রদর্শনপ্রবাহে বিচার-বিশ্লেষণে, বা অভিজ্ঞতা-সমারোহে প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি; কিন্তু যে কোনও চিন্তাধারায় যেমন কিছু প্রাথমিক সত্য (যাকে অনেকে স্বতঃসিদ্ধ, postulates বলে থাকেন) মেনে নিয়ে সুরু করা হয় সেইরূপ রবীন্দ্রনাথ উপরে উল্লিখিত দুটি বিশ্বাস নিয়ে তাঁর দার্শনিক চিন্তা—কি কাব্যে, কি জীবনে—প্রকাশ করলেন।

এক পরম শূন্যতার অনুভব যা ভয়াবহ মনে হতে পারে অথচ যা অনিবার্য তাকে অস্তিত্বের ধারায় সার্থকতা দেওয়া বা মৃত্যুকে অমৃতের রূপে সাজান যেমন কবিকে অত্যাধুনিক অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মূল বক্তব্যের কাছাকাছি নিয়ে এল, তেমনই আবার ঔপনিষদিক অমৃত-চেতনা তাঁকে মৃত্যুর বিভ্রম, নাস্তিত্বের বা শূন্যতার সংহারী-রূপ অতিক্রম করতে সাহায্য করল।[৯] বৈপরীত্য সংযোগে এই নাস্তিত্ব বা বিধ্বংস গভীর সত্তার অনুভবে নিয়ে গেল তাঁর দর্শন; অর্থাৎ না থাকার হাহাকার অনন্ত সত্তায় হল বাধিত। ফলে 'থাকাটা' হল পরম প্রশ্ন। তদুপরি 'মানবিকতা বোধ' এই 'থাকা' ক্রিয়ায় কর্তার সার্থকতা প্রদান করল, ফলে মূল স্বীকৃতি হল "আমি আছি"। এই "আমি আছি"-র দ্বিন্দ্বময়ই হোক, বা রহস্যই হোক, রচনা করল রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার সুস্পষ্ট পটভূমি। সমগ্র দর্শনের ব্যাখ্যানে এই মানবকেন্দ্রিকতাকে রবীন্দ্রনাথ মূল সত্য ধরে নিয়েছিলেন। এ জাতীয় মনোভাবকে দার্শনিকরা, বিশেষত পাশ্চাত্য দর্শনে, এক ধরনের দোষ মনে করছেন। অর্থাৎ সত্তাবিচারে এ সংস্কার অনেকের মতে স্বচ্ছদৃষ্টির প্রতিবন্ধক।

৮ শ্রীসুধীর নন্দী, রবীন্দ্র-দর্শন অন্বীক্ষণ, (কলিকাতা: শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী) পৃঃ ১২।
৯ 'মৃত্যুর প্রকাশ' শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড। 'কালরাত্রে' শ্যামলী।

বিশ্বকেন্দ্রে মানবিকতাকে সর্বসত্যের আকর ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মানার কোনও অধিকার আমাদের অর্থাৎ মানুষের নেই। এই anthropomorphism অথচ রবীন্দ্রনাথের দর্শনের মূল ও প্রাথমিক ভিত্তি। এই মানবকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা দোষ কি গুণ এর তাত্ত্বিক বিচারে আমরা এখনই প্রবেশ করব না; মাত্র কয়েকটি কথা বলে এ প্রসঙ্গ এখানে পরিত্যাগ করব। কোনও একটি ধারণা বা ভাবনা স্বতঃই গুণার্হ বা দূষণীয় নয়। দার্শনিক ব্যাখ্যায় তার দোষ-গুণ নিরূপিত হবে এ ভাবনার সমগ্র চিন্তাধারার কাঠামোয় যোগ্য অর্থময়তা বা প্রয়োজনীয়তায়। সত্য যদি মাত্র তাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয় না হয়, তা যদি দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত হয়—হয় অর্থক্রিয়ার জনক—জীবনদর্শনের অনুপ্রেরণা—তাহ'লে সত্য কদাপি মানবিক যোগছিন্ন হতে পারে না বা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এই কারণেই বোধ হয় বহু ভাববাদী দার্শনিক, যেমন ক্রোচে, বা ব্রাড্‌লে—বহু সত্তাবাদী দার্শনিক, যেমন সার্ত্রে বা ইয়েস্‌পার্স (Karl Jaspers)—আধুনিক দর্শন করেও মানবমন-নিরপেক্ষ সত্যে উৎসাহী হতে পারলেন না। ইয়েস্‌পার্সও আধুনিক শিক্ষায় মানবিকতা বোধের অভাবে রীতিমত বিচলিত হলেন। গ্রীক দার্শনিক প্রোটাগোরাসের মত প্রায় রবীন্দ্রনাথও উচ্চস্বরে মানবপ্রাধান্য ঘোষণা করলেন।[১০] তবুও রবীন্দ্রনাথের মানবিকতাবোধে আছে এমন এক পার্থক্য যাতে তাঁর দর্শন ঠিক দূষণীয় অর্থে মানবকেন্দ্রিক হয়ে উঠল না। রবীন্দ্রনাথের কাছে মানুষ মাত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি নয়—'অহং'-এর বিশিষ্ট নামরূপধারী প্রতিভূ নয়—সে স্বয়ম্ভূও নয়। মানবেতর বিশ্বের সঙ্গে নিবিড় ঐক্য সাধনেই মানবের স্বকীয়তা—তার সার্থকতা। অর্থাৎ যা সত্য তা এক অপূর্ব সামঞ্জস্যময় চৈতন্য-স্পন্দিত। এই নিখিল চৈতন্যের লীলাভূমিই অস্তিত্ব। 'যা আছে' তা সবই 'চৈতন্য-লাঞ্ছিত' বলেই আছে বা সত্য বলে প্রকাশিত হচ্ছে। চৈতন্য-নিরপেক্ষ প্রকাশ নেই; প্রকাশ-নিরপেক্ষ সত্তা নেই। অতএব সত্য ও চৈতন্য পৃথক নয়। এই নিগূঢ় ভাববাদী অর্থে রবীন্দ্রনাথ anthropomorphic—এ মানবকেন্দ্রিকতা তাই পাশ্চাত্ত্যের humanist existentialists-দের থেকে পৃথক ধরনের, 'অহং-হীন,' নিরাসক্ত, তথাচ সৃজনশীল মানবিকতা। সত্যের প্রবাহে কোন ছেদ নেই—একা হ'য়ে থাকা যায় না; আর চৈতন্যেই ঐক্য বিধৃত বা আশ্রিত। তাই মানববোধ-নিরপেক্ষ সত্য নিতান্তই প্রাতিভাসিক। কয়েকটি উদ্ধৃতিতে আমার বক্তব্য বিশদ হবে। *Religion of Man* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"the first stage of my realization was through my feelings of intimacy with nature".[১১] এই বক্তব্য বিস্তারিত করতে গিয়ে অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন—"শুধু প্রথম স্তর নয়, সকল স্তরেই দেখিতে পাই, একদিকে বিশ্বপ্রকৃতি, আর একদিকে বিশ্বমানব জীবন—এই উভয়ের সঙ্গে পরিপূর্ণ অন্তরঙ্গতায় রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা সার্থকতা লাভ

১০ 'Man is the measure of everything.'

১১ Rabindranath Tagore, *Religion of Man*, (London: George Allen & Unwin, 1949) p. 18.

করিয়াছে।"[১২] অর্থাৎ "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যদ্‌কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" এই সনাতন ঔপনিষদিক পরিগ্রহ রবীন্দ্রনাথের মানবিকতাকে এক অপরূপ মহত্ত্ব প্রদান করেছে। বস্তুত রবীন্দ্রমানসে মানবকেন্দ্রিকতা এক রহস্যঘন ঔদার্যে উদ্‌বুদ্ধ; ফলে সঙ্কীর্ণতার অভিযোগ এ দর্শনের বিরুদ্ধে উপস্থিত করা মাত্র অজ্ঞতার পরিচায়কই নয়, অন্যায়ও বটে, রবীন্দ্রনাথ একখানি চিঠিতে লিখেছেন ঃ

"যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে, এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে।"[১৩]

রবীন্দ্রনাথ নিজের ভাষায় 'নৈবেদ্যে' লিখেছেন ঃ

"এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধূলায় ধূলায়,
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধরে
অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।"

অর্থাৎ উপনিষদের ভাষায় যে মূল সত্য উদ্ধৃত হল—"য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতি"। এই যে বিশ্বের অনিবার্য আত্মীয়তা—'আংশিক কিছু' হবার উপায় নেই, "কিছু হতে হলেই", "সব কিছু হতে হবে"—এই মূল বাণী রবীন্দ্রনাথের মানব-কেন্দ্রিকতায় যে ঔদার্য প্রদান করেছিল তাতে গোঁড়ামি বা অন্ধতা বিনষ্টই হয়, তাদের আকর হতে পারে না। রবীন্দ্রদর্শনের অপর যে প্রাথমিক স্বীকৃতি অর্থাৎ 'মৃত্যু-চেতনা', তার সম্বন্ধে অবশ্যই কিছু ভণিতার প্রয়োজন নেই। যে-কোন জীবনদর্শনেই এ সত্য-গ্রহণ অনিবার্য—তাতে কোনও দার্শনিকই দ্বিমত হবেন না।

উপরি-উক্ত যে দুটি প্রাথমিক বিশ্বাস নিয়ে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক প্রতিভা বিস্তারিত হল তা এমন কিছু বিশিষ্ট নয় যা রবীন্দ্রদর্শনকে কিঞ্চিৎমাত্র অস্বাভাবিক বা অ-দার্শনিক ভঙ্গী দেয়। উপরন্তু এ দুটি বিশ্বাস এতই সাধারণ যে, যে-কোনও জীবন-দর্শনের স্রষ্টা এগুলি বর্জন করতে পারেন না। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের যে নিবিড় ঐতিহ্যময়তা তাতে "মৃত্যুং তীর্ত্বা", "অমৃতস্য পুত্রাঃ"-র জয়গান যে ঘোষিত হবে এত নিতান্তই ন্যায়সিদ্ধ নিগমন। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে একদল হীনমন্য সমালোচক বা বাচক-বৃন্দের মতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা, কি কাব্যিক, কি দার্শনিক, বহুলাংশে পাশ্চাত্ত্য চিন্তা-শূরদের প্রভাব-পুষ্ট। এর অর্থ যদি হয় যে অবিশ্বাস্য পরিশ্রম ও সময় রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন বিভিন্ন বিষয় পঠনে এবং সময়ের জারক রসে হয়ত বা অবচেতন মন

১২ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস, পৃঃ ৬৩।
১৩ ঐ, পৃঃ ৫৫।

সে সব চিন্তাধারা পরিপাকও করেছিল, অস্বীকার করব না। কিন্তু যদি প্রামাণ্য হয়, রবীন্দ্রনাথ সচেতন মনে এ ধারণারাশি ধার করে তাঁর চিন্তাধারা গড়ে তুলেছিলেন তাহলে সে মত নিতান্তই বাতুলতা। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে স্মরণ করছি অধুনা লিখিত শ্রীশীতাংশু মৈত্রের 'রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্ত্য' পুস্তকটি (কলিকাতা, ১৯৬৫)। বইটির উপলক্ষ্যে লেখক আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন—"আমার অগ্রজতুল্য, অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ জানকীবাবুর হাতে বই পৌঁছে না দিলে, এ বই হয়ত মাঠে মারা যেত"। বাংলা ভাষা যে এ কয় পংক্তিতেই মারা গেল সেটা অবশ্য লেখক খেয়ালই করলেন না। তাঁর এ পুস্তকের ঐ আশঙ্কা কার্যকরী হলে খুব খেদের কারণ থাকত বলে মনে নাও হতে পারে। মাত্র সদৃশ শ্লোক তুলে যাঁরা প্রভাব প্রদর্শন করেন তাঁদের ঐতিহাসিক চেতনায় ত বটেই, এমন কি ন্যূনতম চেতনাতেও আস্থা স্থাপন করা রীতিমত কঠিন হয়ে পড়ে। এ জাতীয় অপচিকীর্ষার বিরুদ্ধে শ্রীতারকনাথ সেনের প্রবন্ধ চূড়ান্ত বক্তব্য পেশ করেছে।[১৪]

এর পরেও শ্রীশীতাংশু মৈত্রের বই যুক্তি-তর্কের সাবিক অসারতারই পরিচায়ক। এ অংশে আমি অবশ্যই কিছুটা আলোচ্যবিষয় অতিক্রম করে অন্য বিষয়ে পরিভ্রমণ করছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ বিচারে নানা অসার্থক পথের এটি অন্যতম। অন্তত এই কারণে আমার এ বিক্ষোভ মার্জনীয়। এ ত গেল প্রভাবের কথা। অতি-উৎসাহী আর একদল আন্তর্জাতিক সাহিত্যের রসামোদী তথাকথিত সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সৃজন-প্রতিভার বিশিষ্ট দিক বিচারে তাঁর সদৃশ পাশ্চাত্ত্য শিল্পীর তুলনায় তাঁকে রীতিমত হীন মনে করেন। যেমন শ্রীশিবনারায়ণ রায়, শ্রীবুদ্ধদেব বসু ইত্যাদি। এঁদের মতে "রবীন্দ্রনাথ কবি হিসাবে আইরিশ কবি ইয়েট্‌সের চেয়ে বা জার্মান কবি গ্যেটের চেয়ে হীন, নাট্যকার হিসাবে শেকস্পীয়রের চেয়ে হীন ইত্যাদি"। এ কথা যদি এঁদের ভাবাবেগের স্বেচ্ছাচার হয় তাহলে অবশ্যই কারও কিছু বলার থাকে না। কিন্তু প্রায়শই এগুলিকে প্রথা রূপে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ সত্যোচ্চারণের দাবী করা হয়। এরূপ অবস্থায় কিছু বিচারগত আপত্তি উঠতে বাধ্য। সংক্ষেপে নিম্নলিখিত কারণগুলি উল্লেখ করছি ঃ

প্রথমত, এ জাতীয় সিদ্ধান্ত (যদি এগুলি 'সিদ্ধান্ত-বাক্য' হয়) করতে মত-পোষকের 'তুলনা' ও 'তুল্য' দুই সাহিত্যেই সমান পারদর্শিতা থাকা প্রয়োজন। সাহিত্য ভাষা ব্যতিরেকে অনুধাবন করা যায় না, অতএব ন্যায়ত, দুই ভাষাতেই সমান কুশল হওয়া অবশ্য কর্তব্য। আলোচনার খাতিরে মেনে নিলাম এঁরা এইরূপ প্রতিভাধর ভাষাদক্ষ (যদিও শ্রীশিবনারায়ণ রায় বা শ্রীবুদ্ধদেব বসুকে জার্মান ও বাংলা বা ইংরাজি ও বাংলায় সমদক্ষ ভাবা কিঞ্চিৎ অবাস্তব প্রতিভাত হয়)। তথাপি আর একটি যুক্তি না মানা পর্যন্ত

১৪ "Western influence on Tagore is too often treated with Flucken's logic : 'There is a river in Macedon, and there is also moreover a river at Monmouth...' Parallels are cited between him and this or that western poet and conclusions drawn accordingly."—Tarak Nath Sen, 'Western Influence on the Poetry of Tagore' in *Rabindranath Tagore : A Centenary Volume (1861-1961)*, (New Delhi : Sahitya Academi, 1961), p. 255.

এ জাতীয় বক্তব্য বা 'বাক্য', 'আকাংক্ষা-আসত্তি-যুক্ত' হলেও 'যোগ্যতা'র আশ্রয় হয় না। অবশ্য কাব্য অর্থময়, এই অর্থময়তা বা ব্যঞ্জনা বা রস তার মূল আকর্ষণ, এতৎসত্ত্বেও এ বৃত্তিসমুদয় শব্দাশ্রয়ী, ভাষা-নির্ভর। আধুনিক ভাষাবিদ্‌দের অনেকেরই মতে ভাষার কোনও অন্তর্নিহিত আপেক্ষিক হীনতা নেই।[১৫] অতএব একথা বলা অসত্য যে যেহেতু রবীন্দ্রনাথ বাংলায় লিখেছেন সেইহেতু তিনি হীন। এটা নিঃসন্দেহে অত্যুক্তি; অভিযোগ-কারীরাও একথা কেউই বলেন না। কিন্তু সাহিত্যের ভাব বা আধেয়ের বিচার যে ভাষা নিরপেক্ষ বা বিশিষ্ট পটভূমি নিরপেক্ষ হতে পারে না, একথা যে কোনও আধুনিক সমালোচকই মানবেন।[১৬] একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে সুরু করা যাক — "রবীন্দ্রনাথের চেয়ে শেক্সপীয়র মহত্তর নাট্যকার"। এই প্রতিজ্ঞাবাক্য সত্য কি মিথ্যা নির্ণয় করার পূর্বে জানা প্রয়োজন এর অর্থ কি? অসার্থক বাক্য বা অর্থহীন বাক্যের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ধারণের কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। যেমন "মংগলবার লাল কি না" এ নিয়ে মীমাংসাকামী কোন বিচারই হতে পারে না, কেন না বাক্যটি অসার্থক বা অর্থহীন। এখন দেখা যাক পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা বাক্যটির অর্থ কি? স্পষ্টতই মনে হয় যে সাহিত্যবিচারে অস্পষ্টতা এমনই অধিক যে এ-জাতীয় জটিল তুলনা-মূলক বাক্য যে আরও দুর্বোধ্য হবে তাতে সন্দেহ নেই। তথাপি বাক্যটির কিঞ্চিৎ অর্থ থাকলেও তা থেকে পরিস্ফুট অর্থে পৌঁছানর চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উপরি-উক্ত বাক্য একেবারেই অসার্থক, কেন না অর্থপ্রদায়ী কোনও নিয়মই উল্লেখ করা যাবে না।[১৭] ধরা যাক 'ক' ও 'খ' দুই শিল্পী। 'ক' লিখেছেন 'ব' ভাষায় এবং 'খ' লিখেছেন 'ভ' ভাষায়। 'ব' ও 'ভ' দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষা যাদের কোনও সাধারণ ধর্ম পরিদৃশ্যমান নয় (অর্থাৎ যে অর্থে 'হিন্দি' বা 'বাংলা' ভিন্ন বা 'ইংরাজি' বা 'জার্মান' ভিন্ন সে অর্থে নয়। কেননা এদের মধ্যে কিছু সাধারণ ঐতিহ্য বা অন্য কোনও ধর্মসাম্য পরিদৃশ্যমান হতে পারে)। এক্ষেত্রে যখন বলি 'ক' 'খ'-এর থেকে ভাল সাহিত্যিক তখন নিশ্চিতই বলি না 'ব', 'ভ'-য়ের থেকে ভাল ভাষা। বক্তব্য হল 'ব' ও 'ভ'-এর আধারে অভিব্যক্ত ভাব (content, এক্ষেত্রে literary content) এর তর-তম। কিন্তু একথা বলতে গেলে ধরে নিতে হয় যে — (১) ভাব ভাষা-নিরপেক্ষ হয়ে মনন-গ্রাহ্য। অর্থাৎ নিরবলম্ব ভাব মনে গৃহীত হতে পারে। (২) অথবা তৃতীয় কোনও ভাষা 'ম' আছে যাতে 'ব' ও 'ভ' নিঃশেষে অনূদিত হতে পারে। প্রথমটি আধু-নিক মনোবিজ্ঞান বা যুক্তিবিজ্ঞানে এতই অস্বীকৃত যে সম্ভাবনা হিসাবে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। এ জাতীয় নিরবয়ব বা বিমূর্তভাব হৃদয়গ্রাহী হলেও হতে পারে (এবং হৃদয়ের আকুতি, বিবরণের সত্যাসত্যের সীমানা বহির্ভূত) কিন্তু কদাপি মনন বা বুদ্ধি-গ্রাহ্য হতে পারে না। সঙ্কেত (symbol) ব্যতীত সঞ্চারের রহস্যরাজ্যে অপার মহিমা থাকতে পারে

১৫ *Man, Culture and Society*, edited by Shapiro.

১৬ W. Haas, 'Translation', *Philosophy*, July 1962.

১৭ C. Cherry, *On Human Communication*, (Cambridge, Mass., M. I. T. Press, 1966).

কিন্তু বিচারের রাজত্বে তা নিতান্তই ফাঁকি বা শূন্যগর্ভ, বস্তুত অসৎ। এই রূপহীন বিচার তাহলে অসম্ভব। অতএব দ্বিতীয় সম্ভাবনা ধরা যাক, অর্থাৎ 'ব' ও 'ভ' এই দুই ভাষায় আশ্রিত শিল্প-ভাব 'ম' নামক তৃতীয় ভাষার আধারে অনূদিত হয়ে প্রতীয়মান হল যে 'ক', 'খ' অপেক্ষা উন্নততর শিল্পী। কিন্তু এমন কোনও তৃতীয় ভাষা অকল্প্য। অর্থাৎ বলতে হয় যে 'বাংলা' ও 'ইংরাজি'-র দুটি ভাষাতে শিল্পরচনা কোনও তৃতীয় ভাষায়,—ধরা যাক ফরাসীতে অনূদিত হল। কেবল তখনই 'ক' ও 'খ'-র শিল্পকর্মের সার্থক তুলনা চলতে পারে। কিন্তু এভাবে বিচার করে নিশ্চিতই উপরি-উক্ত বা সমজাতীয় প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারিত হয় না। এতদ্ব্যতীত অনুবাদে যে মূল রস হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তা সর্বজনবিদিত। এবং এই হ্রাসের কোনও পরিমাণগত বা গাণিতিক হিসাব না থাকায় মূল বক্তব্যের অর্থান্তর হল। মৌলিক শিল্প-কর্মের বিচার হল না—হল অনূদিত শিল্প-কর্মের বিচার। অর্থাৎ 'ব' ও 'ভ'-এর বিচারের পরিবর্তে হল 'অনূদিত-ব' ও 'অনূদিত-ভ'-এর বিচার। কিন্তু সেক্ষেত্রে ত প্রথমে যে বিচার্য প্রতিজ্ঞা ধরা হয়েছিল তা পরিবর্তিত হল। অর্থাৎ 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'গ্যেটের' বিচার হল না, হল 'রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ' ও 'গ্যেটের অনুবাদ'-এর তুলনামূলক বিচার। এবং এ বিচার যে কত দুঃসাধ্য ও জটিল তা যে কেউই অনুমান করতে পারেন। তদুপরি মূল বক্তব্যের অর্থ নিশ্চিতই এই বিশ্লেষণ লব্ধ অর্থ ছিল না, তা বক্তারা নিজেরাই স্বীকার করবেন। অতএব দেখা যাচ্ছে ন্যায়ত, প্রস্তাবিত বাক্যের (অর্থাৎ "রবীন্দ্রনাথ কবি হিসাবে . . . ইত্যাদি") কোনও অর্থই দেওয়া গেল না—অর্থাৎ বাক্যটি অর্থহীন বা অসার্থক। এবং অসার্থক বাক্যের সত্যাসত্য নির্ধারণের প্রশ্নই ওঠে না। আধুনিক দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রে বা এমন কি নন্দনতত্ত্বেও এ আলোচনা প্রচুর হচ্ছে বা করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে এখানেই শেষ করব। আমাদের বক্তব্যের মর্মার্থ হল যে এ জাতীয় বাক্য (মূল তুলনা-মূলক বাক্যটি) আকূতি-জ্ঞাপক (emotive) হতে পারে কিন্তু কখনই বিবৃতি-মূলক (descriptive) হতে পারে না। অর্থাৎ "গ্যেটে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মহত্তর শিল্পী" —এই বাক্য হয় (১) আকূতি-জ্ঞাপক (emotive), নয় (২) অর্থহীন (nonsense)। ফলে সর্ব ক্ষেত্রেই এই বাক্যটি সম্পর্কে সত্যাসত্য নির্ধারণের বিচার বা আলোচনা অসঙ্গত ও বিভ্রান্তিকর। অর্থাৎ যে বাক্যের বিবৃতিমূলক ভিত্তি নেই, সে বাক্য কোনও ব্যক্তির অন্তর্মুখীন আবেগ প্রকাশ করলেও, বিবেচ্য প্রমা বা প্রকল্পের আশ্রয় হতে পারে না। সাহিত্য বা শিল্প-বিচারও বিচার, আর তাই এ জাতীয় বাক্য-বিনিময় অবৈধ ও নিষিদ্ধ গণ্য হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সত্তাদর্শন

জনৈক আধুনিক দার্শনিক[১৮] মেটাফিসিকস্ বা তত্ত্বদর্শনের শ্রেণিবিভাগ করতে গিয়ে বলেছেন যে — হয় তা (১) সংস্কারপন্থী, অর্থাৎ বিশ্ব বা মানব সম্বন্ধে আমাদের অভিনব ধারণায় উদ্বুদ্ধ করে, নয় (২) বিচার ও বিবরণমূলক। আমাদের সত্যদৃষ্টি প্রায়শই থাকে আচ্ছন্ন। প্রকৃত বিশ্লেষণ করে যা আছে তার স্বরূপটি ধরিয়ে দেওয়া এই দ্বিতীয় বিভাগের কাজ। অবশ্যই শ্রেণিবিভাগ হিসাবে এ পদ্ধতি হয়ত ত্রুটিপূর্ণ, কিন্তু লেখকের মূল উদ্দেশ্য সুবোধ্য। আমাদের সত্য-দৃষ্টি খুলে দেওয়ার জন্য কোনও নবতর চিন্তা-পরিকল্পনা না দিয়ে আমাদেরই ব্যবহৃত বাক্য ও ধারণা-সামগ্রীর বিবরণমূলক বিশ্লেষণ মাত্র করা। মূল কথা দর্শন বিবরণমূলক হলে কোনও নূতন তথ্য উপস্থিত হয় না। ঐতিহাসিক বিচারে অবশ্যই অধিকাংশ দার্শনিক প্রথম বিভাগে যাবেন, এবং রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম নন। (যথা: প্লেটো, দেকার্তে, স্পিনোজা, বের্গসঁ, হোয়াইটহেড, ইত্যাদি।) রবীন্দ্রনাথ মাত্র (স্ট্রসনের ২য় ধারায়) 'যা দেখি' তার নিপুণ বিশ্লেষণ করেই ক্ষান্ত হননি, 'যা দেখি না' তারও বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। অর্থাৎ সত্য-সংজ্ঞা দিয়েছেন বিশ্ব ও মানব সম্পর্কে নবতর দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে, পরাতথ্য উপস্থাপিত করেছেন তাঁর দার্শনিক কাঠামোয়। যুগ যুগ ধরে দার্শনিক এই 'গভীর দৃষ্টির' পরিচয় প্রদান করেই স্বীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। আধুনিক পাশ্চাত্যে ভিট্‌গেনস্টাইন ও সমজাতীয় দার্শনিকবৃন্দ এবং তদীয় শিষ্যমণ্ডলী অনেকে দার্শনিকের কাজ কেবল অর্থ-বিশ্লেষণ বা ভ্রমাত্মক বাক্যজাল থেকে মুক্তিদান, একথা প্রচার করেছেন বা করছেন।[১৯] রবীন্দ্রনাথ যে এ-জাতীয় দার্শনিক নন তা আমরা প্রথমেই বলেছি। এক্ষেত্রে এটি বলা প্রয়োজন মনে করছি যে আমরা এই দুই জাতীয় দার্শনিকতার পার্থক্য নিরূপণ করে মাত্র রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতার স্বরূপ নির্ণয় করছি — কোনটি ভাল বা কোনটি মন্দ এ সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ আমাদের আদৌ উদ্দেশ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের দর্শনের ঐতিহাসিক স্বরূপ নির্ণীত হলে তাঁর দার্শনিক বক্তব্যও অনেকাংশে স্বচ্ছ প্রতিভাত হবে। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক তথা দার্শনিক হোয়াইটহেডের দর্শন-সংজ্ঞা আলোচনা করলে আশা করি রবীন্দ্রদর্শনের রূপ নির্ণয় (তথাকথিত ঐতিহাসিক পটভূমিকায়) সহজসাধ্য হবে। (প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ ও হোয়াইটহেডের জন্মসাল এক, অর্থাৎ ১৮৬১ খৃ্রী) এই পাশ্চাত্য দার্শনিকের মত উল্লেখ করার আরও একটি বিশেষ কারণ হল এ দু'জনের

১৮ P. F. Strawson, *Individuals* (London : Methuen & Co).
১৯ "Showing the fly a way out of the fly-bottle."

২

বিস্ময়কর চিন্তা-সাদৃশ্য। হোয়াইটহেড সম্পর্কে তাঁর মত-ব্যাখ্যাকার ভিক্টর লো বলেছেন —"সত্তাই শ্রেয়। প্রতি সত্তা-স্পন্দনের অজ্ঞাত লক্ষ্য কোন প্রকার সৌন্দর্য"[২০]। সে যাই হোক প্রকৃত দর্শন তাঁর ভাষায় হল "speculative philosophy"। এরই বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত *Process and Reality* পুস্তকে প্রকৃত দর্শনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।[২১]

আপাত দৃষ্টিতে হোয়াইটহেডের দার্শনিক সংজ্ঞা নিতান্তই রবীন্দ্রদর্শন বিরোধী — কেননা হোয়াইটহেডের মতে দার্শনিক চিন্তা হবে একটি "system", "logical" এবং "necessary" (অর্থাৎ সারাৎসার বা essence অন্বেষণকারী), এর কোনটিই রবীন্দ্রদর্শনের স্বীকৃত বৈশিষ্ট্য নয়। কিন্তু বিস্ময়কর হল এই সংজ্ঞায় পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক জগৎ ও সত্য সম্বন্ধে যে বক্তব্য পেশ করলেন তা একান্তই রবীন্দ্রনাথের দর্শনের সমধর্মী। এর কারণ কিন্তু ঐ দার্শনিক সংজ্ঞা বা "speculation" এর উপর জোর দেওয়া। এ জাতীয় দার্শনিক সংজ্ঞার একটি মূল উদ্দেশ্য হল অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকে সাধারণতম পদ্ধতি প্রয়োগে গ্রহণ করা। ফলে সত্যকে মানবীয় অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হল না। হোয়াইটহেড আরও বললেন যে এ দার্শনিকতা অর্জনের মূল পদ্ধতি হল কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ। যে সত্য সামান্যতম তাকে কেবল ভাব প্রত্যক্ষে ধরা যায় না। পেতে হয় অন্তর্দৃষ্টি বা 'insight' এ। কোন একটি বিশিষ্ট ধারণা বা ভাবধারা প্রয়োগ করে অভিজ্ঞতার রাজ্যে সর্বোত্তম বা ব্যাপকতম ভাবধারায় উপস্থিত হওয়াই সত্যান্বেষণ।[২২] আর এমন একটি সাধারণতম সত্য হোয়াইটহেডের সিদ্ধান্ত যা রবীন্দ্রনাথেরও সামান্যতম ভাবধারা। হোয়াইটহেডের মতে 'সত্তাবাদ যা, তা সর্বদাই শ্রেয়-চৈতন্যমণ্ডিত'।[২৩] এ তুলনার মূল উদ্দেশ্য হল এটাই দেখান যে যদিও রবীন্দ্রনাথ কোন সুপরিকল্পিত দার্শনিক সংজ্ঞা নিয়ে চিন্তা-পদ্ধতি গড়ে তোলেন নি তবু তাঁর দর্শনকে উপরি-উক্ত 'speculative philosophy'র সমগোত্রীয় ভাবা অবৈধ হবে না। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার চরম বিচার মেনে সামান্যতম এমন ভাবধারায় উপনীত হতে হবে যে ভাবধারা সমগ্র অভিজ্ঞতাকে সুষ্ঠু ও ঐক্যবদ্ধ রূপ দেবে। এরই নাম হোয়াইটহেড দিয়েছেন 'coherence' এবং 'adequacy' — রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'harmony' বা 'সামঞ্জস্য'। আমাদের প্রাথমিক বক্তব্য ছিল রবীন্দ্রনাথের দর্শন যে 'গভীর-দৃষ্টির' মাধ্যমে অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকে কল্পনামণ্ডিত করে এক সর্বব্যাপী ভাবধারা প্রকাশ করল তাকে তথাকথিত 'বিশ্লেষণাত্মক দর্শনের' মধ্যে না ফেলে সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিণত পরিধির মধ্যে স্থাপিত করলে প্রকৃত মূল্যা-

২০ "Sheer existence is a value and beauty of some sort is unconscious aim of each pulse of existence." — 'Introduction to A. N. Whitehead' in *Classics of American Philosophers*, edited by Max H. Fisch (New York : 1951) p. 417.

২১ "Speculative philosophy is the endeavour to frame a coherent, logical, necessary system of general ideas in terms of which every element of an experience can be interpreted."—*Process and Reality*, (New York : 1929) p. 4.

২২ ঐ, পৃঃ ৮।

২৩ "An actual fact is a fact of aesthetic experience", ঐ, পৃঃ ৪২৭।

য়ন সম্ভব। এরই ঐতিহাসিক সমর্থন ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য আমরা হোয়াইটহেডের কথা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করলাম। দ্বিতীয় কারণ হল, অনেকের স্বতই মনে হতে পারে রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য দার্শনিকের মত (যেমন হোয়াইটহেডও করেছেন) বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে পারতেন, কেন না বৈজ্ঞানিকও ত অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় রত। বস্তুত চরমতম সত্য এমনই ব্যাপক যে তা সাধারণতম উপলব্ধি ব্যতীত মেলে না; বিজ্ঞানের আংশিক ও বিমূর্ত (abstract) দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সে সত্য লাভ হয় না — এ জাতীয় সত্য speculative philosophyর মাধ্যমেই পেতে হয়।[২৪] বিজ্ঞান ও দর্শনের আরও বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে পরিবেশিত হবে যাতে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা বিশদ হবে। বস্তুত রবীন্দ্রদর্শন মাত্র সমস্যার সমাধান অন্বেষণ করেই ক্ষান্ত হয় নি, প্রকৃত ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসাবে দিয়েছে এক মহৎ জীবনদর্শন যা দিয়ে মাত্র তত্ত্বের জগৎ ব্যাখ্যা করা নয়, জীবন-জগৎও (জার্মান দার্শনিক হুসার্লের মতে এই জগতই প্রকৃত বিচার্য। একে তিনি বলেছেন *Lebenswelt*) উদ্ভাসিত হয়। এই অর্থে যদি রবীন্দ্রদর্শনকে 'মেটাফিসিক্স' বলা হয় সে অভিযোগ মানতেই হবে। আর এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ 'মৃত্যুর' মত নেতিবাচক অভিজ্ঞতাও তাঁর চিন্তা থেকে সরিয়ে রাখতে চাইলেন না। ব্যাপকতম সত্য অনুসন্ধানের অনিবার্য পরিণতি রবীন্দ্রদর্শনের সামান্য-দৃষ্টি। একই অনুপ্রেরণায় Whitehead অন্বেষণ করলেন "complete fact" (*Adventure of Ideas*), এ্যারিস্টটল করলেন "being",[২৫] রবীন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন সেই ঐক্যবদ্ধ পূর্ণ সত্যের স্বরূপ।

কোনও সার্থক ও সফল দার্শনিক ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য হল যে বহু ভাবধারা পরস্পর সম্বদ্ধ হবে ও অন্তে কোনও একটি বা কতিপয় ভাবধারায় পর্যবসিত হবে। রবীন্দ্রদর্শনে এ বৈশিষ্ট্য পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান। তাঁর মূল ব্যাখ্যা-ধারা "সামঞ্জস্য"। এই সামঞ্জস্যই সত্যের প্রকৃতি ও লক্ষণ। আবার সমগ্র চিন্তাধারা এমনই সম্বদ্ধ যে এই একটি ভাবধারার ক্রম-পর্যায়ে ব্যাখ্যাত হয় সত্তা, মানব, সৌন্দর্য, কল্যাণ, প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়-সামান্য ও জ্ঞান-সামান্য। তদুপরি উল্লিখিত ধারণাটি যদি সর্বাত্মিক সত্য-রূপ হয় তাহলে তাকে জানার উপায় যে বুদ্ধি নয়, কল্পনা-সঞ্জীবিত বোধি, একথা বোধ হয় বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ 'প্রকৃত জ্ঞান-স্বরূপ' রবীন্দ্রদর্শনে কি হবে তা ঐ ধারণা-নির্ধারিত। সমগ্র দর্শন এমনই ঐক্যবদ্ধ যে চিন্তা-সজ্জা যেন স্ব-রূপেই বিশ্ব-প্রকৃতির মূল-সজ্জা ও ঐক্য প্রতিফলিত

২৪ তাই হোয়াইটহেড সম্বন্ধে A. E. Murphy লিখেছেন :
"It is for this reason that speculative philosophy can pursue, in a single hypothesis, the general and the concrete. For we are in search of what is common to all things in so far as they are concrete : 'finally actual', 'ultimately real', or the like and since nothing in its final reality can be a mere abstraction, we are naturally led in a different direction from that which the sciences pursue"—'Method of Speculative Philosophy' in *Philosophy of Alfred North Whitehead*, edited by P. H. Schilpp (New York : Library of Living Philosophers, 1951) p. 357.

২৫ *Metaphysics*, translated by Ross, z. 1. 1028, 2-8.

করেছে। এর চেয়ে বৃহত্তর দার্শনিক সাফল্য আর কি হতে পারে? রবীন্দ্রনাথের মতের সঙ্গে আমাদের বিরোধ হতে পারে—কিন্তু এমন অনবদ্য বিবরণ সুবোধ্য হবেই। এবং এ জাতীয় সাবলীল চিন্তাধারার একটি সুস্পষ্ট ফল এই যে, এ মতবাদের আংশিক বিরোধিতা প্রায় অসম্ভব।

সনাতন দার্শনিক প্রথায় রবীন্দ্রনাথও তাঁর সত্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন সর্বাধিক সাধারণ যে তত্ত্ব—অর্থাৎ সত্তা—তার উপর। সত্তার অনুপ্রেরণায় যে বিস্ময় তা তাঁর দার্শনিক মনীষাকে আলোড়িত করল। দার্শনিক পদ্ধতির যে আলোচনা পূর্বে আমরা করেছি তারই জের টেনে এই পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের সত্তাদর্শন আলোচিত হবে। দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম অভিজ্ঞতা-লব্ধ চিন্তা বা অভিজ্ঞতা-অজন্য (a priori) চিন্তার সামান্যীকরণ দার্শনিকতার মূল লক্ষণ। যে কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে চিন্তা শুরু করে স্তরে স্তরে সামান্যতম ভাবধারায় উপনীত হওয়া দার্শনিক বৈশিষ্ট্য; আর এই কারণেই যুগ যুগ ধরে দার্শনিকবৃন্দ বিশ্বের মূল উপাদান-কোটি অন্বেষণ করেছেন এবং তারও চেয়ে ব্যাপকতর বিষয় তাঁদের উদবুদ্ধ করেছে। ভাবধারার ক্রম পর্যায়ে ব্যাপকতম বিষয় বলা যেতে পারে সত্তা। তাই ভারতীয় দর্শনে সত্তা-চিন্তা অসামান্য স্থান অধিকার করেছে। আমাদের দেশে ন্যায়-দর্শন সত্তাকে জাতি হিসাবে বলেছেন "পরা-জাতি"; অর্থাৎ যার উপরে আর জাতি নেই। এমন কি পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও Parmenides, Socrates, Aristotle থেকে শুরু করে Sartre পর্যন্ত এই সত্তা-চিন্তাকে কেন্দ্র করে প্রকাশ করেছেন তাঁদের দার্শনিক প্রতিভা। এই 'being' কে কেউ হয়ত বলেছেন 'essence' বা substance, আবার কেউ বা বলেছেন 'existence'। কিন্তু সকলেই 'being' এর বিশ্লেষণ, দর্শনের অনিবার্য প্রকাশ বলে মনে করেছেন।[২৬] হোয়াইটহেডও যখন বললেন যে দার্শনিকের প্রাথমিক দায়িত্ব হল "complete fact" পর্যালোচনা করা তখন তিনিও Aristotle এর 'being' আলোচনার কথাই বললেন।[২৭]

দুটি উদ্ধৃতি থেকে একটি মূল কথা সূচিত হয় যে সত্তা কোনও গুণ-সামান্য নয়—অর্থাৎ কোনও অমূর্ত নির্বিশেষ ধর্ম মাত্র নয় যা সবকিছুর মধ্যে আছে, পরন্তু মূর্ত, বিশিষ্ট অস্তিত্ব। এই জন্য Aristotle একে বলেছেন 'substance', Whitehead বলেছেন

২৬ "Now since we are seeking the first principles and the highest causes, clearly there must be something to which these belong in virtue of its own nature. If then those who sought the elements of existing things were seeking these same principles, it is necessary that the elements must be elements of being not by accident but just because it is being. Therefore it is of being as being that we also must grasp the first causes."—Aristotle, *Metaphysics*, translated by W. D. Ross, Bk. I. 1. 25-30.

২৭ হোয়াইটহেডের জনৈক দার্শনিক সমালোচকের মতে:
"When Whitehead says the problem is to 'conceive a complete fact' he means thereby what Aristotle meant in dealing this problem to be 'what that is which is in this sense'."—Ivor Leeberg, *Whitehead's Metaphysics*, (London: George Allen & Unwin, 1958) p. 17.

'fact' রবীন্দ্রনাথও তাই লিখেছেন — "বিশ্বমর্মের নিত্যকালের সেই বাণী 'আমি আছি'।"[২৮] যা দিয়ে সকল চিন্তা সুরু হবে তাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দর্শনে কখনই অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ, নির্বিশেষ, নিরবলম্ব গুণ-সামান্য বলে মানতে স্বীকৃত হন নি। হয়ত এর কারণ তাঁর প্রকাশ-ধর্মী কবি-মানস। অবশ্য উপরি-উক্ত দুই পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক ছাড়াও আধুনিক সত্তাবাদী দার্শনিকগোষ্ঠীও রবীন্দ্রনাথকে পূর্ণ সমর্থন জানাবেন।

ভাব বস্তুর সর্বোচ্চ বিকাশ পদার্থ-সত্তায়। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য ন্যায়ের ভাষায় বলা যায় "universal class"; হয়ত এর সমকক্ষ বিস্তার আছে এরই বিপরীত ধারণা "নাস্তির" রাজ্যে। কিন্তু সে ত হল 'অভাব' পদার্থ। আর সেই কারণে চিন্তার শুরুতেই তাকে উপস্থাপিত করলে অচল অবস্থারই সৃষ্টি হবে। এতৎসত্ত্বেও অস্বীকার করব না যে এই 'নাস্তি' একেবারে বাদ দিয়ে সত্তা ব্যাখ্যা সম্ভব নয় — সত্তা-বোধের পূর্ণ নিরূপণ হয় না। বহু পাশ্চাত্ত্য ভাববাদী দার্শনিক এ কথা সজোরে ঘোষণা করবেন। বৌদ্ধবাদও হয়ত এই 'নাস্তির' সার্থকতায় সম্মোহিত। ন্যূনাধিক সমধর্মী দার্শনিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথও 'নাস্তিত্ব' বা অভাব-চৈতন্যকে বাদ দিয়ে তাঁর সত্তাদর্শন পরিবেশন করেন নি।

"সত্যহারা শূন্যতার গর্ত থেকে
কালো কামনার সাপের বংশ
বেরিয়ে এসে জড়িয়েছে কাঙালকে—
নাস্তিত্বের সেই শিকল-বাঁধা ভৃত্যকে—
নিরর্থের বোঝায়
বেঁকেছে যার পিঠ,
নেমেছে যার মাথা।[২৯]

মানব-সত্য তার অভিযাত্রায় নিশ্চিত হয় এই নাস্তিত্বকে উত্তীর্ণ হয়ে, কিন্তু তার সঙ্গে যোগ তার নিবিড়।

রবীন্দ্রনাথের সত্তাদর্শন আলোচনার পূর্বে আমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে সত্তা কথাটির অর্থ নিয়ে কিঞ্চিৎ সাধারণ মন্তব্য পেশ করা। প্রয়োজন-বিধায় আমরা অপরাপর পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের মতও সন্নিবিষ্ট করব; অবশ্য সেটুকুই যা প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের সত্তা-বোধ ব্যাখ্যার তাগিদে। প্রতিনিয়ত আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা সত্তাজ্ঞাপক বাক্য ব্যবহার করছি: যেমন, "পৃথিবীতে মানুষ আছে", "টেবিলে বই আছে", "ঈশ্বর সর্বত্রই আছেন" এবং সর্বাপেক্ষা জটিলতম বাক্য, "আমি আছি"। এই ব্যবহার বুদ্ধি-গ্রাহ্য বা / এবং হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে অসৎ বা যা নেই তা না ভেবে উপায় নেই। কেন না কিছু আছে একথা বুঝতে বা জানতে হলে তাকে বাকি জিনিস থেকে অবচ্ছিন্ন করছি। (অবশ্য মাত্র সেই সব লোক-ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেখানে গুণ দ্বারা বস্তুটির অস্তিত্ব নির্ধারিত হচ্ছে।

২৮ শেষ সপ্তক, ৩৬।
২৯ 'কালরাত্রে' শ্যামলী।

তুলনীয় পাশ্চাত্য দার্শনিক Spinoza'র বিধি "Determinatio est negatio" বা গীতার নেতিবাচক আত্মা বর্ণনা।) কিন্তু 'কি নেই' এটি নিরূপণ করা কঠিন বা প্রায় অসম্ভব। দৃষ্টান্ত দিয়ে পরিষ্কার করা যাক: কোনও একটি শূন্য ঘরে আমি প্রবেশ করে ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপের পর উত্তেজিত অভিমত প্রকাশ করলাম এই ঘোষণা করে যে "ঘরে ত কেউ বা কিছু নেই"। অবশ্যই ঠিক, কিন্তু এই 'কিছু-র' মধ্যে ত বিশ্বের তাবৎ পদার্থ অন্তর্ভুক্ত, যদিও ঈপ্সিত নয়। ঘরে "আগুন নেই", "নদী নেই", "বাঘ নেই" "সূর্য নেই" ইত্যাদি। কিন্তু এগুলি মাত্র উল্লেখ্য বিষয় নয় তাই নয়, এদের উল্লেখ বাক্যের সার্থকতা বিরোধী। এর কোনও একটি উল্লিখিত হলে হাস্যকর অর্থ হবে। কেন না ঘরে ব্যক্তি বা সচরাচর রক্ষিত বিষয়-সত্তাই বক্তার বিবক্ষা। কিন্তু এই যোগ্য আকাঙ্ক্ষার ব্যাঘাত নেতিবাচক বাক্যটির নাস্তিত্ব (মানুষ বা গৃহ-শোভন দ্রব্যে) সূচিত করেছে। অর্থাৎ আমার (এ ক্ষেত্রে 'বক্তা') স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা-রাজ্যে ঘরে নদী বা সূর্যের আকাঙ্ক্ষা অযোগ্য, তাই তার উল্লেখ মাত্র নিষ্প্রয়োজনই নয়, নিরর্থকও বটে। অথচ এই বিশেষ পরিবেশে আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষার বিশেষ যোগ্যতা নির্ধারিত হয় প্রাক্তন ভাব-অভিজ্ঞতার বুদ্ধি-সংস্কারের দ্বারা। সত্তা-সূচক বাক্যে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে সত্তাই বিধেয় পদ — অর্থাৎ সত্তা যেন একটি গুণ বা গুণ-সমষ্টি, কিন্তু কান্ট থেকে যে ন্যায় শুরু হয়েছে তাতে বারংবার প্রমাণিত করা হয়েছে যে সত্তা কোনও ধর্ম বা গুণ নয়। যদি সত্তাকে বিধেয় বলি তাহলে ন্যায়গত ত্রুটি ঘটবে। যখন বলি "ফুলটি লাল" তখন তার রং উদ্দেশ্য-দ্রব্যের গুণ এবং বিশেষণ অর্থে অবচ্ছেদকও বটে। কিন্তু গুণ বলা মাত্রই স্বীকৃত হল দ্রব্যটির সম্পর্কে অন্য গুণ বা/এবং ধর্মও প্রযুক্ত হতে পারত, অর্থাৎ "ফুলটি লাল ও উৎপল"ও বলা যেতে পারত। কিন্তু যখন বলি "ফুলটি আছে" তখন পূর্বোক্ত বাক্যটির ন্যায় ধর্মান্তর প্রয়োগের প্রশ্নই ওঠে না। সত্তা প্রাক্‌সিদ্ধ না হলে ধর্ম আরোপের কোনও অবকাশ নেই। অতএব রবীন্দ্রনাথ ন্যায়সঙ্গত ভাবে সত্তাকে দ্রব্যের ধর্ম বা গুণ হিসাবে না নিয়ে সরাসরি সত্যের স্বরূপ ধরে নিলেন। অর্থাৎ (এক অর্থে রবীন্দ্রনাথ সত্য ও সত্তা একাঙ্গীভূত করলেন। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথকে ভাববাদী দার্শনিক (idealist) বলা অন্যায় হবে না।) এ ছাড়াও তিনি এই সত্তাকে নৈর্ব্যক্তিক পদার্থপ্রকার দিলেন না — নির্ভরশীল করলেন সবিশেষ চৈতন্যের আশ্রয়ে — "আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ . . . "। পাশ্চাত্য জগতে ক্রোচে এরই তুল্য কথা বললেন।[৩০] এখন দেখা যাক সত্তা-সত্যকে চৈতন্য-নির্ভর করা কতটা যুক্তিযুক্ত। "সত্য কি?" এ প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা দর্শনের প্রচেষ্টা হলেও এ যাবৎ সফল হয়নি। বোধ হয় কোন মীমাংসাই চূড়ান্ত নয়, হয়ত কল্যাণকরও নয়। এই জন্য, কোনও প্রদত্ত মীমাংসার আন্তর সংহতির দ্বারাই দার্শনিক সাফল্য নির্ধারিত হবে। "যা আছে, তাই সত্য, যা নেই, তা অসত্য" — সংজ্ঞাটি অস্পষ্ট ও ব্যাপক। "যা আছে তাই সত্য" এটি বিবাদের বিষয় নয়। সমস্যা "কি আছে" বা "কাকে থাকা বলব"? পরিবর্তনশীল, কালাক্রান্ত এই জগতে সবই চলমান। বস্তুত 'জগৎ' অর্থই ত "যা চলছে"। যা

৩০ গ্রন্থকারের 'ক্রোচে' প্রবন্ধ, ভারতকোষ-২য় খণ্ড, (কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)।

আজ আছে তা কাল নেই, যা নেই তাই হচ্ছে। এই দ্রুত স্পন্দনশীল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার জগতে রবীন্দ্রনাথ সত্য অন্বেষণ তাই নিষ্ফল মনে করলেন। এ কারণে "থাকার" (সত্তার) তিনি করলেন স্তর-বিভাগ। খণ্ড, বিচ্ছিন্ন ঘটমান ইন্দ্রিয়বৃত্তি অর্থাৎ প্রত্যক্ষে যা দেখি, যা ঘটে, সে থাকা সত্য নয়। তা তথ্য মাত্র, প্রয়োজনের সামগ্রী। ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ অতিক্রম করে মনোময় জগতে যে পূর্ণ স্থিতি, চৈতন্যের সে অসীমতা তাই সত্য। "কবি তব মনোভূমি রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেন। সেই সত্য যা রচিবে তুমি..." [ভাষা ও ছন্দ]। আরও সঠিকভাবে বলা উচিত, সত্য কেবল অসীম চৈতন্যের স্থিতি নয়, বস্তুত তারই লীলা-ক্ষেত্র এবং এই লীলাই চৈতন্যের স্বরূপ। সত্তা-সত্য-লীলা-চৈতন্য তাদাত্ম্য সম্বন্ধে লীন। অর্থাৎ সৃজনশীল চৈতন্যই "আছে", ফলত তাই একমাত্র সত্য। কিন্তু সত্য ত উপলব্ধি বা অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ নয়; অথচ "চৈতন্যই আছে" এমন অনুভব হয় না। বিশিষ্ট অনুভবের বিষয় হল "তুমি আছ", "সে আছে", "আমি আছি", ইত্যাদি। কিন্তু পূর্ব সংজ্ঞানুযায়ী, "চৈতন্যের থাকা'' অর্থ "চৈতন্যের লীলা", "চৈতন্যের সৃজনশীলতা"। কিন্তু "লীলা" বা "সৃজনশীলতা"র উপলব্ধি পরাশ্রয়ী হওয়া সম্ভব নয়, স্বাশ্রয়ী হতে হবে। অর্থাৎ লীলা মাত্রই আত্মকেন্দ্রিক, ফলে, "সে আছে", "তুমি আছ" এই আপাত-ভিন্নতা "আমি আছি"র অন্তরে ঐক্য-লীন। অতএব নিশ্চিত নিগমন হল— "কি আছে"র একটিই যথার্থ যুক্তিসঙ্গত উত্তর "আমি আছি"। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, "সত্য তাই যা আছে"; অতএব সত্যের স্বরূপ "আমি আছি"। যথা:

"সে-সব দুর্মূল্য নিমেষ
কোনো রত্নভাণ্ডারে থেকে যায় কিনা জানিনে;
এইটুকু জানি—
তারা এসেছে আমার আত্ম-বিস্মৃতির মধ্যে,
জাগিয়েছে আমার মর্মে
বিশ্বমর্মের নিত্যকালের সেই বাণী
'আমি আছি'।"

অথবা "...'আছি আমি আছি'—
যে বাণীতে উঠে নাচি
মহাগগন-সভাঙ্গনে আলোক-অপ্সরী
তারার মাল্য পরি।" [শেষ সপ্তক]

এখানে একটি আপত্তি উঠতে পারে যে, "আমি আছি" এ বাক্যে নিশ্চিতই কোনও জ্ঞানের প্রকাশ হয় না। 'আমি', 'তুমি', 'সে', 'এই', 'ঐ', এ সকল পদ-উচ্চারণেই সত্তা সূচিত হয়— প্রায় অঙ্গুলি-নির্দেশের মত। যেমন কোনও একটি ফুলের দিকে আঙুল দিয়ে দেখানরও যা সঞ্চার, "ঐ ফুল" বলারও তাই। অতএব এ. জে. এয়ার প্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতে এ জাতীয় বাক্য নিরর্থক— নির্দেশক পদ-

সমূহের (index terms) সমগোত্র। অতিরিক্ত একটি ক্রিয়াযুক্ত হয়ে তদধিক কিছু প্রকাশিত হয় না।[৩১] মূলত, "ঐটি আছে" যেমন, "আমি আছি"-ও তেমন পদমাত্র, কোন নবতর জ্ঞান-সঞ্চারী বাক্য নয়। অতএব এমনই একটি অর্থ-সঙ্কুচিত বাক্যের উপর সমগ্র সত্য-সংস্থা নির্ভর করলে দার্শনিক ব্যর্থতা অনিবার্য। তাহলে রবীন্দ্রনাথের দর্শনে এর একটা উত্তর থাকার প্রয়োজন—এবং সে উত্তর আছেও। বিস্তৃততর আলোচনার পটভূমিতে এ উত্তর দৃঢ়তর প্রতীয়মান হবে। এখানে শুধু সংক্ষেপে জবাবটি দেব। এই যে নির্দেশ-মূলক পদ "আমি", এটি যদি কোনও বাক্যে কর্তা হয়, তাহলে পরবর্তী কোনও ক্রিয়া যোগে বাক্যটি অর্থবান হবে কিনা সে সিদ্ধান্ত আপেক্ষিক। অর্থাৎ যে কাঠামোয় এ বাক্য ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই কাঠামোর যা প্রাথমিক পদার্থ তার প্রকৃতি নির্ণয়ের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ "আমি" যদি কোনও দেশ-কাল অবস্থিত প্রত্যক্ষ ব্যক্তিকে বুঝায়, (যেমন এয়ার প্রমুখ এঁরা বোঝেন) তাহলে তাঁদের আপত্তি অবশ্য প্রযোজ্য, নচেৎ নয়। রবীন্দ্রনাথের যে "আমি" পদ সে কোনও একটি ব্যক্তি বোঝায় না (পরে বিশদ ব্যাখ্যা পাব), বোঝায় বিশ্ব-মানবকে—এক সামঞ্জস্যময় 'অহং-সমাহার'কে। অস্তিত্ব ঘোষণা করছে এই সমাহারের সত্যতা — যেটি অঙ্গুলি-নির্দিষ্ট নয়। এই অতিরিক্ত অর্থবান হওয়ায় "আমি" পদটি, "আমি আছি" বাক্যে সার্থক পদ-ব্যবহারের সহায়তা করছে। যে 'আমি' এবম্বিধ উপলব্ধি-গ্রাহ্য, বোধিলভ্য বিশ্ব-মানব —তার থাকাটা বা অস্তিত্ব ঘোষণা করা নিশ্চিতই জ্ঞানাত্তিনবস্থ বহন করে। দ্বিতীয়ত, 'থাকাটা' বা সত্তা বা অস্তিত্ব ক্রিয়া বিশেষ নয়, অর্থাৎ ব্যক্তি-ধর্ম বা দ্রব্য-ধর্ম নয়। বস্তুত "আমি" ও "আছি" রবীন্দ্রদর্শনে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সংযুক্ত। তাদাত্ম্য সম্পর্ক বা সম্বন্ধ উল্লেখে কোনও সার্থক বিবৃতি বাক্য হতে পারে কিনা[৩২] এ প্রশ্ন তোলা অসমীচীন নয়, কিন্তু সেটা একেবারেই স্বতন্ত্র প্রশ্ন। মূল কথা হল "আমি" শব্দের রবীন্দ্রদর্শনে যে অর্থ-দ্যোতনা তাতে "আমি আছি" এ ব্যবহার অসার্থক, একথা কোনক্রমেই বলা যায় না। সত্তার সঙ্গে "আমি আছি"র এই সম্পর্ক মাত্র রবীন্দ্রনাথই করেন নি, ভারতীয় ঐতিহ্যে এ অতি প্রাচীন কথা — প্রায় প্রবাদ-বাক্য বলা চলে। এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য জগতে সত্তাবাদী দার্শনিকরাও, যদিও কিঞ্চিৎ ভিন্ন অর্থে, এই তাদাত্ম্য (অর্থাৎ সঠিক বললে সত্তা ও মানব-সত্তার তাদাত্ম্য) ঘোষণা করেছেন।[৩৩] সত্তাকে বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সার্ত্রে আরও লিখেছেন—"মানব সত্তাই প্রাথমিক এবং এই সত্তাই তাকে ভবিষ্যৎ সৃষ্টির অনুপ্রেরণা দেয়"।[৩৪] এ কথাটি মনে হয় যেন রবীন্দ্র-

৩১ "To say 'I exist' or 'this is occurring now' is like saying 'look !' or pointing without words." — A. J. Ayer, *Problems of Knowledge* (London : Pelican Series, 1956) pp. 50-51.

৩২ শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন', শারদীয় সাহিত্যপত্র, ১৩৭২।

৩৩ সার্ত্রে লিখেছেন existentialism এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে :
"a doctrine . . . which affirms that every truth and every action imply both an environment and human subjectivity."—*Existentialism and Humanism*, (London : Methuen & Co, 1960) p. 24.

৩৪ "For we mean to say that man primarily exists—that man is, before all

নাথের *Religion of Man* পুস্তকে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারত। মানব-সত্তার তাগিদ যে কত প্রাথমিক, কত গভীর একথাই সার্ত্রে-প্রমুখ সত্তাবাদীরা বলতে চাইলেন। আর রবীন্দ্রনাথ সত্তাকে "আমি আছি"-তে রূপান্তরিত করে এই মানব-অভিযাত্রাকে আরও জয়যুক্ত করলেন—বিশ্বকে বুঝতেও এই "আমি আছি" বুঝতে হবে, অপর আত্মাকে বুঝতে হলেও এই "আমি আছি" বুঝতে হবে। আমাকে বা আমার ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষাকে বাদ দিয়ে "অপর" কিছুই বোধ্য হয় না, হতে পারে না। জার্মান দার্শনিক হুসার্লও এই সত্যকে বলেছেন প্রাণ-জগৎ (Lebenswelt)।[৩৫] রবীন্দ্রনাথই যে শুধু এই মানব-কেন্দ্রিকতাকে "স্বমুখীনতা" বা বিশিষ্ট আত্ম-কেন্দ্রিকতায় পরিপুষ্ট করলেন তা নয়, ঐ সকল দার্শনিকও সে কাজই করতে শুরু করলেন। দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ সর্ববিশ্বে এই আত্মানুভব, এই 'স্ব-বিস্তার' সত্যতার বা সত্তার স্বরূপ হিসাবে গ্রহণ করলেন।[৩৬] রবীন্দ্রনাথের ভৃত্য যতদিন জ্ঞানের (বহির্নির্দিষ্ট) বিষয় ছিল ততদিন ছিল অসৎ, অসত্য; যখন কবি তাঁকে তাঁরই মত কন্যার পিতা ভেবে একাত্ম করলেন সে সত্য হয়ে উঠল। অর্থাৎ বিষয়কে আপন পটভূমি থেকে দূরে রেখে সত্তার চেতনা হয় না— তাকে স্বাঙ্গ করে নিতে হবে।[৩৭] *Personality* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — "I see you when you are what I am."[৩৮]

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যেখানে 'আমি' হল বিস্তৃত সেখানেই সত্তার প্রকৃত অর্থ নিহিত। নৈতিক মূল্যায়নের পরাকাষ্ঠা বিচারে সার্ত্রেও 'অহং'-এর সঙ্গে সমগ্র মানবতার এই যোগকে মনে করেন একান্তই যুক্তিসঙ্গত।[৩৯] অবশ্য এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার প্রাথমিক সাদৃশ্য সত্ত্বেও এই দুই মতবাদে দুই বিভিন্ন জগৎ সৃষ্টি হল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও

else, something which propels itself towards a future and is aware that it is doing so."— ঐ, পৃ: ২৮।

৩৫ সত্তাবাদ ও ফেনমেনোলজি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে John Wild লিখেছেন: "Since all our conscious acts and attitudes are stretched out into a field which is ready for any object that may be given. We exist in a world that is in a certain sense 'subjectivity' and relative to man and his meanings. . . . Everything that we sense or feel or understand has its place within this far-reaching horizon of the Lebenswelt."—*Existence and the World of Freedom*, (U. S. A. 1963) p. 32.

৩৬ "With our love and hatred, pleasure and pain, fear and wonder, continually working upon it this world becomes a part of our personality."—R. N. Tagore, *Personality*, Indian edition, (Macmillan & Co. Ltd., 1959) p. 14.

৩৭ J. Wild সত্তাবাদীদের—বিশেষ করে সার্ত্রে, ও মের্লো পঁতি—সম্বন্ধে লিখেছেন: "I must enter into his world of meaning, and not merely observe him as an object in my own. This grasping of a range of phenomena as they are lived through and understood by the different people involved is the first step in any disciplined investigation of human experience."—*Existence and the World of Freedom*, p. 35.

৩৮ *Personality*, p. 22.

৩৯ "I am thus responsible for myself and for all men, and I am creating a certain image of man as I would have him to be. In fashioning myself I fashion man." — J. P. Sartre, *Existentialism and Humanism*, p. 30.

ঐতিহ্যের বিভিন্নতায়। সার্ত্রে-প্রমুখদের নিকট এই স্বাশ্রয়ে বিশ্বলোকের গুরুদায়িত্ব নিয়ে এল উৎকণ্ঠা (anxiety, anguish, fear)। আশংকা, সন্দিগ্ধ মৃত্যু-চৈতন্য (তুলনীয় A. Camus), আর রবীন্দ্রনাথ 'আমির' মাঝে দেখালেন আনন্দ, চৈতন্য, লীলা, সামঞ্জস্য, অসীম অমৃত-সাধনা। সত্তার বিবর্তন এই মানবমনের সার্থক উদ্বৃত্তের অমৃত-সাধনাও বলা যেতে পারে। এটিই সত্তা, এটিই সত্য।

কিন্তু সত্য ত আমাদের অভ্যস্ত ভাবনায় নৈর্ব্যক্তিক—দেশ ও কাল নিরপেক্ষ—বিশেষ করে পরা-সত্য। অথচ সত্তা আপেক্ষিক, দেশ-কাল আবদ্ধ। রবীন্দ্রদর্শনের মৌলিক কৃতিত্ব এই দুই ধারণার অনবদ্য সমন্বয়। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথও নির্বিশেষ সত্তা বলে এ্যারিস্টটলের মত দ্রব্যত্ব বা substance মানলেন না—তাকে রূপান্তরিত করলেন নিবিড় এক অভিনব আত্মোপলব্ধিতে যার প্রকাশ "আমি আছি", যে আমির থাকা দেকার্তের মত 'Cogito ergo sum' এর দ্রব্য-গুণ প্রকাশ নয়—নিবিড় তাদাত্ম্য-চেতনা। এই রূপান্তর, এখানে মনে রাখা কর্তব্য, পূর্ব-উল্লিখিত দার্শনিক পদ্ধতির মধ্যেই বিরাজ-মান; অর্থাৎ দার্শনিক সাক্ষাৎকার যেখানে তন্ময়তার পথে সেখানে এ জাতীয় রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। পর্যবেক্ষণের পথে যে বিচ্ছিন্ন খণ্ড বস্তু-নিচয়ের সত্তা তা সত্য ত নয়ই, প্রকৃত সত্তাও নয়। বিজ্ঞান তাই সত্যের পথ রোধ করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *Personality* গ্রন্থে লিখেছেন—"The world of science is not a world of reality, it is an abstract world of force" (p. 4). এ জগৎকে প্রয়োজনবিধায় বুদ্ধি প্রয়োগে ব্যবহার করা যায় কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করা যায় না। এ বড় দূরের লোক। আর অভিজ্ঞতাই যদি সত্যের চূড়ান্ত প্রামাণ্য হয় বা উৎস ও আশ্রয় হয় (অবশ্য মনে রাখতে হবে যে সত্যজ অভিজ্ঞতা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ থেকে ভিন্ন। এটুকুই রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক কারিগরি। সব দার্শনিকই কিছু শব্দার্থ এভাবে পরিবর্তন করে নেন; (হোয়াইটহেড এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।) তবে তা ব্যক্তি-সত্তা থেকে অভিন্ন। আমরাই যে মাত্র সত্যের উপর নির্ভর করি তাই নয়, সত্যও আমাদের উপর নির্ভর করে, কেন না সত্য প্রকাশধর্মী। সত্য 'স্ব'-এ প্রকাশ, এই অর্থেই মাত্র স্ব-প্রকাশ। অর্থাৎ সত্যোপলব্ধির বড় পথ আত্মোপলব্ধি। উপনিষদের অতি প্রধান উপদেশ "আত্মানং বিদ্ধি"-র রবীন্দ্রনাথ দিলেন এক আশ্চর্য দার্শনিক ব্যাখ্যা। অভিনব আরও, কেন না এই উপলব্ধি মাত্র উদ্ভাস (উদ্ভাস ত বটেই তদুপরি আরও কিছু মিলে সত্য হয়— হয় সত্তার পরিগ্রহ ও প্রামাণ্য) নয়, সৃষ্টিও বটে। আর চৈতন্য যেখানে সৃজনশীল সেখানে সে সামঞ্জস্য-স্রষ্টা ও স্বয়ং সামঞ্জস্যের আধার। এই সমগ্রের সৌষম্য ও সামঞ্জস্যই আমার চৈতন্যের আধেয়ও বটে। সত্য যে আমার চৈতন্যে অভিন্ন হল তা এক অভূতপূর্ব পদ্ধতিতে; বৈদান্তিক বিশুদ্ধ অদ্বৈতময়তায় নয়—প্রকাশের, সঞ্চারের সার্থকতায় হল এক। এ ঐক্য প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতার সামিল—যে অন্তরঙ্গ সঞ্চার আমার উদগ্রীব সত্তাকে করল শিল্পী, প্রকাশক, আত্ম-সচেতন। এমন কি শরীরও যেন এই স্পন্দনে আনন্দ ঘোষণা করল ঃ

"যে আনন্দে গড়া আমার দেহ
তার অন্ত নাই গো নাই।"

এই সক্রিয় 'হওয়া'-তেই আমার সত্তা; আর এটাই সত্য। সমগ্র বিশ্বের ঐক্যে ঘোষিত হল " Here you are" (*Personality*, p. 4) অর্থাৎ "Here I am "— "অয়ম্ অহম্ ভোঃ"। আর এই প্রসঙ্গে পরিষ্কার হবে কেন রবীন্দ্রনাথ সত্য ও তথ্যের প্রভেদ করলেন। তাই (সত্য যা আছে—আর তাই আছে, যা আমি আমাতে উপলব্ধি করি।) যখন (অস্তিত্ব আমাকে এই উপলব্ধির পথে ব্যাহত করে, আমাকে খণ্ডিত, অন্ধ করে তখন তা অসৎ, তা অসত্য।) আমার থাকাটার যে নিয়ত অনুভব তারই প্রকোষ্ঠে বিধৃত সত্যের স্বরূপ। আর তাই যা আছে তা কখনও নৈর্ব্যক্তিক সত্তা নয়। অতএব রবীন্দ্রনাথ তাঁর দর্শনের সংহতির প্রয়াসেও সফল হলেন যখন সত্য ও সত্তা একাত্মীভূত করলেন "আমি আছি"-র সার্থকতায়। সত্য তখনই সত্য যখন সে আছে; আর তার থাকাটাই ত প্রকাশ। কিন্তু প্রকাশ ও সার্থক তার ভাব-দেহ (content) নিয়ে—আর ব্যক্তি ব্যতিরেকে এ ভাব-দেহ নিরর্থক। মানব-ব্যাখ্যা ছাড়া 'প্রকাশ' হবে না। বিবর্তন-ময় জগতে চলেছে এই প্রকাশের লীলা—আর তাতেই তার সার্থকতা—সে সত্য—সে আছে। সৃজনশীল চৈতন্যে যে সত্তা প্রতিনিয়ত পরিকল্পিত সে ত স্থাণুবৎ নয়—সে ক্রিয়াশীল। ফলে রবীন্দ্রদর্শনে 'থাকা' ও 'হওয়া' আপাতবিরোধী ত নয়ই বরং পরস্পরের পরি-পূরক। এই দুইয়ের পূর্ণতাই সত্য। যাই হোক উপরে সংক্ষেপে সত্য ও সত্তার অভেদ কল্পনা ব্যাখ্যাত হল। এবার "আমি আছি"-র বিশদ বিশ্লেষণে আসা যাক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"আমি আছি"

"আমি আছি" এ ত মাত্র নিমেষের আবেগময় অঙ্গীকার নয়, এ যে সত্তার একমাত্র সত্য-রূপ। অতএব সত্তাকে বুঝতে হলে এই 'মূল সত্যটি' বিচার করতে হবে। অনন্তর এই মূল প্রতিজ্ঞার প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে লীন যে তাদাত্ম্য তাকেও প্রকাশ করতে হবে। ফলত, এই 'আমি'-টির বিশদ বিশ্লেষণ, রবীন্দ্রনাথের সত্তাদর্শন এবং এক অর্থে সমগ্র রবীন্দ্রদর্শন অনুধাবন করতে একান্তই আবশ্যক।

'আমি কে?' এ প্রশ্ন যে দার্শনিক তা মানতেই হবে; কিন্তু ততোধিক দার্শনিক প্রশ্ন হল 'আমি কি?' 'কে'-প্রশ্নে কিছুটা ধরে নেওয়া হচ্ছে—অর্থাৎ আমি যে একটি সচেতন ব্যক্তি এর বৈয়াকরণ স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু 'কি'-প্রশ্ন সর্ব-ব্যাপক সত্তা-জিজ্ঞাসা। প্রায়শই দর্শনে বা যে কোনও চিন্তাধারায়, 'কি'-প্রশ্ন কোনও পদের সংজ্ঞাকামী প্রশ্ন (definition / essence); কোনও কোনও ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ব্যাপকতম পদের ক্ষেত্রে, প্রয়োগ-নির্দেশ-সূচক প্রশ্ন। অর্থাৎ এ পদটি কোথায় ব্যবহার করব—কি এর অর্থ? কিন্তু যদি ধরে নিই অর্থ-জিজ্ঞাসা শুধু পদ-ব্যাখ্যা, বিষয় বা সত্তা-ব্যাখ্যা নয় তাহলে রবীন্দ্রনাথের দর্শন দুর্বোধ্য বলে মনে হবে। অর্থের প্রশ্নে যদি সর্বসাধারণ দৃষ্টি নিযুক্ত করি তাহলে "অর্থের" প্রশ্ন রূপান্তরিত হয় "সার্থকতা"-প্রশ্নে। অর্থাৎ এই বিশেষ ক্ষেত্রে হবে "আমি"-র সার্থকতা কি? এ প্রশ্ন ত আমরা প্রতিনিয়তই করছি, আর একমাত্র দার্শনিকের নিকটই গ্রহণযোগ্য উত্তর প্রত্যাশা করছি। (যথাঃ 'জীবনের সার্থকতা কি' ইত্যাদি।) অবশ্যই ঐ প্রশ্ন 'জীবনের উদ্দেশ্য কি'— এ অর্থেও করা হয়। কিন্তু আমরা সার্থকতা-প্রশ্নকে স্বরূপ-উদ্ঘাটনের প্রশ্ন হিসাবে বিচার করব। অর্থাৎ "আমি কি' অন্তে পুনরায় 'আমি কে' এই প্রশ্নেই রূপান্তরিত হবে। 'আমি' মানে কি? যে ব্যক্তি স্থান কাল নিরূপিত অহংকারের আশ্রয়, তদতিরিক্ত কিছু? এর উত্তর দিতে রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করলেন তাঁর দার্শনিকের ও শিল্পীর সম্মিলিত প্রতিভা। "নানা আমি"র রঙ্গে এই বিচিত্র সত্তার প্রবাহ। এরা সব এক না বিচ্ছিন্ন? কোন "আমি" আছে, আর কোন "আমি-টা" নেই? যে নেই সে ত আর প্রকৃত "আমি" নয়, তাহলে "আমি" কে? এই জন্য উপরে বলে নিলাম যে "আমি কি" এ প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত "আমি কে" এরই সমব্যাপক। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের ভাষায়—"কিন্তু এই 'আমি'কে লইয়া প্রথমেই প্রকাণ্ড একটা খট্‌কা লাগিবার কথা"।[৪০] এই "খট্‌কা"ই দার্শনিক সমস্যা,

৪০ উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ (কলিকাতা: ১৩৬৮) পৃঃ ১৫৯।

যা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র দর্শন-চিন্তার মূল অনুপ্রেরণা। আমির যে আপাত বিরোধ তার দার্শনিক সমাধান তাই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র দর্শনের রূপ নির্ধারণ করল — সত্তাদর্শনের ত বটেই। যে 'আমি' সমগ্র সত্তাকূটের নির্ধারক তা ত শুধুমাত্র ব্যক্তি-সত্তার ঘনীভূত রূপ নয়, সর্ববিশ্বের সত্তা-নিয়ামক। অতএব আমাদের অন্বেষণ এই 'আমি'-র মধ্যে বিশ্ব অন্বেষণ। পত্রপুটের ৭ সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"যে গভীর অনুভূতিতে নিবিড় হল চিত্ত
সমস্ত সৃষ্টির অন্তরে তাকে দিয়েছি বিস্তীর্ণ করে।
ঐ চাঁদ ঐ তারা ঐ তমঃপুঞ্জ গাছগুলি
এক হল, বিরাট হল, সম্পূর্ণ হল
আমার চেতনায়।
বিশ্ব আমাকে পেয়েছে,
আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে,
অলস কবির এই সার্থকতা।"

"আমি"-র সান্ত অনুভব ও অনুভবের "আমি" যেখানে সমার্থক সেক্ষেত্রে এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও বিরোধের সূত্রপাত। এই যে তৃণ, বৃক্ষ, তারকা আমার অনুভবে প্রতীয়মান তাদের মধ্যস্থতাতেই 'আমি'-র সত্তানুভব; অথচ প্রত্যক্ষত, "আমি"-ত্বের আশ্রয়েই এই বিরাট ইতর সমূহের সত্তানুভূতি। "বিশ্ব আমাকে পেয়েছে, আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে", "অলস কবির" এই সংবেদন তখনই সার্থক হবে যখন দার্শনিক প্রজ্ঞায় এই আপাত-বিরোধ নির্বাসিত হবে। বহির্বিশ্বের নানা বস্তুপুঞ্জ, তারা না থাকলে আমার "থাকা" হয় না, অথচ এই ইতর-সামগ্রীর স্বতন্ত্র সত্তাকোটি নিয়ে আমি "আমি" হতে পারি না। অর্থাৎ "আমি"-ভিন্ন অপরের অনুভব-মাধ্যমে আমিত্বের সত্তা-স্বীকৃতি; "অপর-সত্তা" মানলে কিন্তু "আমি" সঙ্কুচিত হয় — "আমির" মধ্যে বিশ্ব অন্তর্ভুক্ত হয় না। এই আপাত দ্বন্দ্বই রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক অভিযাত্রায় প্রথম ও প্রধান সোপান। এই বস্তুপুঞ্জকে যদি চৈতন্যময় ভেবে "তুমি"-তেও রূপান্তরিত করি তাতেও প্রকৃত দ্বন্দ্বের অবসান হয় না — থেকেই যায় সেই "তুমি আছ, আমি আছি"-র দ্বৈত সংশয়। মূল সমাধান হবে তখনই যখন এই "তুমি" "আমি"-রই অন্তর্লীন এবং স্বাঙ্গীকৃত হবে সত্তাচৈতন্যের মাধ্যমে। প্রসঙ্গত বলা উচিত, (উপরি-উক্ত কারণেই) যাঁরা সহজ ব্যাখ্যা করে এই "তুমি"-কে, রবীন্দ্রদর্শনে আমি-অতিরিক্ত কিছু ভাবেন (সে ঈশ্বরই হউন, জীবন দেবতাই হউন, কি প্রেমাস্পদই হউন) তাঁরা রবীন্দ্রদর্শনের প্রকৃত রূপটি হারিয়ে ফেলেন। এই দ্বন্দ্ব ভারতীয় দর্শনে বারবার দেখান হয়েছে "ব্যবহারিক ও পারমার্থিক আমি"-র স্তর বিন্যাসে— উপনিষদের বহু সংখ্যক শ্লোকে। (তুঃ তৈত্তিরীয়, ১।১০, ৩।১০।৬), রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা ছাড়াও প্রবন্ধে এই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আমির ভেদ প্রকাশ করেছেন "deepening of consciousness" পদ ব্যবহারে।[৪১] আমি-র এই আপাত দ্বন্দ্বের অবসানেই মিলবে প্রকৃত

৪১ *Religion of Man* (London : George Allen & Unwin, 1949).

সত্তার স্বরূপ ও সত্য-দৃষ্টি। ব্যক্তিকেন্দ্রে এই বিরোধের অভিজ্ঞতার নিরসন করতে গিয়ে যে মূল দার্শনিক ভাবধারা রবীন্দ্রনাথ উদ্ভাবন করলেন তাকেই তিনি বললেন "সামঞ্জস্য" (harmony)। এটি দৃষ্টান্ত ও রূপক দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলবে, কিন্তু অপর কোনও ভাবধারার দ্বারা ব্যাখ্যাত হবে না রবীন্দ্রদর্শনের কাঠামোর মধ্যে। কেন না আগেও বলেছি, প্রত্যেক দর্শন, এমন কি, বিজ্ঞানেও যেটিকে প্রাথমিক করে (primitive), তার মাধ্যমে অপরাপর ব্যাখ্যাত হতে পারে, কিন্তু সে নিজে ব্যাখ্যাত হয় না, ন্যায়সঙ্গত ভাবে হতে পারে না। করতে গেলে 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ হবে। রবীন্দ্রদর্শনে সামঞ্জস্য এমনই একটি ভাবধারা। এটি তাঁর প্রাক্-স্বীকৃতি (presupposition)। এটির সাফল্য বিচার করা উচিত রবীন্দ্রনাথের সমগ্র চিন্তাধারায় এই ভাবধারা কি পরিমাণে অন্যান্য ভাবধারাকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছে তার দ্বারা। এই সামঞ্জস্য পরে আমরা বিশদ করছি, তার পূর্বে "আমি" পদটির বিচার করা যাক। 'আমি'-র যে দ্বন্দ্বের উল্লেখ করলাম রবীন্দ্রনাথ তার সম্বন্ধে তাঁর *Man* পুস্তিকাতে লিখেছেন:

"The 'I am' in me realizes its own extension, its own infinity whenever it truly realizes something else...The fact that we exist has its truth in the fact that everything else does exist, and the 'I am' in me crosses its finitude whenever it deeply realizes itself in the 'Thou art'"

কিন্তু এই তথাকথিত আমির সীমাকে অতিক্রম করেও যে "আমিতে" সত্য প্রতিষ্ঠা করি সে কি কারণে বা কিসের সহায়তায়? এই দুই আমির ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, প্রবন্ধে এত ভূয়সী উল্লিখিত যে বিশেষ উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। এই দুই আমিকে *Personality* পুস্তকে তিনি বলছেন (এবং অবশ্যই আরও নানা জায়গায়) 'ব্যক্তিগত মানুষ' ও 'পরম পুরুষ' (দ্রঃ Macmillan, Indian edition, 1959, p. 13)। যে আমি এই 'পরম পুরুষ' সে আমিই চিত্রার 'জীবন দেবতা', *Religion of Man* এর "Man in God or God in Man" ইত্যাদি। প্রথমেই যে 'আমি' ও 'বিশ্বের' বিরোধ, 'আমি' ও 'তুমির' বিরোধ (স্মরণ রাখতে হবে, এ বিরোধ দার্শনিক ভাষায় 'আপাত বিরোধ') তা কোথায় বা কোন 'আমি'তে? অবশ্যই সেই 'পরম আমি'। সে আমিকে জানতে গিয়ে তোমাকেও জানা হবে:

"আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না।
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে
তোমায় চেনা"। [গীতবিতান]

কিন্তু এতক্ষণ যে আমরা বলছিলাম দুটি 'আমি' আছে, তাহলে অপর 'আমিটি'র কি হবে? এখানেই রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করলেন সত্তা-বিধি (criterion of existence)—

সামঞ্জস্য চেতনা। এই বিচারে অপর আমিটি নেই, অর্থাৎ অসৎ—অসত্য। কিন্তু এই অস্বীকারে রবীন্দ্রনাথের অনীহা। একটিকে বাদ দিয়ে যে সত্য তা অসম্পূর্ণ — "এক"। এ একে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা থাকে না। আর একটি সমাধান হল এই দুই মিলে যে ঐক্যবদ্ধ এক — যেখানে থাকতে হলে সামঞ্জস্যময়তা একমাত্র উপায়, সেই বিশ্বমানবের ভাবধারা আনা। এটা সম্ভব, যদি এক আমিকে লক্ষ লক্ষ "আমি"-র সঙ্গে একাশ্রয়ে অনুভব করি। এই মূল চিন্তাধারাটির নামই "সামঞ্জস্য"। "সঞ্চয়" পুস্তকে তিনি লিখেছেন —"মানুষের উপর একটা মস্ত মীমাংসাভার পড়িয়াছে। তাহার একটা বড়োর দিক আছে, একটা ছোটোর দিক আছে। দুইয়ের মধ্যে একটা ছেদ আছে, অথচ যোগও আছে। এই ছেদটাকেও রাখিতে হইবে অথচ যোগটাকেও বাড়াইতে হইবে। ছোট থাকিয়াও তাহাকে বড় হইয়া উঠিতে হইবে। এই মীমাংসা করিতে গিয়া মানুষ নানা রকম চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতেছে — কখনো সে ছোটোটাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়, কখনো বড়োটাকে স্বপ্ন বলিয়া আমল দিতে চায় না। এই দুইয়ের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টাই তাহার সকল চেষ্টার মূল। এই সামঞ্জস্য যদি না করিতে পারা যায় তবে ছোটোরও কোনো অর্থ থাকে না, বড়োটিও নিরর্থক হইয়া পড়ে।"[৪২] আর এভাবে মিলিয়ে দেখতে পারলে, বিরোধ থাকে না, এবং বলা যায় "আমি আছি এইটাই হচ্ছে সৃষ্টির ভাষা"।[৪৩] এই সামঞ্জস্যময় মানবসত্তাকেই তাই রবীন্দ্রনাথ "পূর্ণসত্য", "শান্ত", "এক", "আনন্দ" ও বিশেষ করে "বিশ্বমানব" বলেছেন। "মানুষের ধর্ম"-গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন সুন্দর করে— "আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব।

সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাঁকেই বলেছে 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা'। সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা করে তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছে ঃ

স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

সেই মানব, সেই দেবতা, য একঃ যিনি এক, তাঁর কথাই আমার এই বক্তৃতাগুলিতে আলোচনা করেছি"। ঐতিহ্যপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ একে যদিও অদ্বৈত বলেছেন, তবুও এ শঙ্কর-রামানুজের "এক" নয়। এ "এক" সৃজনশীল, সক্রিয় ও ঐক্যবদ্ধ, সমাশ্রয়ী এই অর্থে—"এক"। খুব স্বাভাবিক ভাবেই মনে হতে পারে যে এই "বিশ্বমানব" পাশ্চাত্য দার্শনিক Bradleyর "absolute"। কিন্তু দর্শনের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা তৎক্ষণাৎ পার্থক্যটি ধরতে পারবেন। রবীন্দ্রনাথের ঐক্যবদ্ধতা যে সামঞ্জস্যময় চৈতন্যে

৪২ 'ধর্মের অর্থ', ১ম স্তবক।
৪৩. 'সঞ্চয়', 'আমার জগৎ'।

বিধৃত, তা নিষ্ক্রিয় নয় — তার থাকাই তার সৃজন। অর্থাৎ সত্তা ও সৃজনশীলতা একার্থক। এই সৃজনশীল পূর্ণতাই সামঞ্জস্য। অর্থাৎ "আমি আছি" যেখানে সামঞ্জস্যময় চৈতন্য-স্বরূপ সেখানে নিখিল বিশ্বের আত্মীয়তার লীলাক্ষেত্র। এই এক "আমি আছি"-র মধ্যে তখন বহু আমি-থাকার প্রতিশ্রুতি ও অনুভব। "আমি বলছি আমি তুমি নয়, তুমি বলছ তুমি আমি নয়, এমন বিরুদ্ধ আমাকে-তোমাকে এক করে রয়েছেন সেই অদ্বৈতম্"[৪৪]। সামঞ্জস্যের বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক। প্রথমেই বলে রাখি (এবং পূর্বেও বলেছি) এই ভাবধারাটি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র দার্শনিক চিন্তাধারায় সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক এবং একান্ত সংহতিপ্রদ। এই জন্যই এটি রবীন্দ্রনাথের দর্শনে মূল ভাবধারা বলে গণ্য হওয়া উচিত। অবশিষ্ট চিন্তাবিন্যাস এটিরই টানে ন্যায়ানুগ ভাববিস্তার। সামঞ্জস্যের কেন্দ্রে অন্যান্য ভাবধারার সঙ্গতি ও উৎকর্ষ পরে ক্রমান্বয়ে প্রদর্শিত হবে। তার পূর্বে এই অভিনব পদ্ধতি-টির কিঞ্চিৎ দার্শনিক বিচার করা যাক।

কোনও দ্রব্য বা বস্তুর গুণকে সাধারণত দার্শনিকরা দুভাগে ভাগ করেন — (১) সার ও (২) অসার (essential and accidental)। সার গুণের দ্বারা বস্তুর স্বরূপ নির্ণীত হয় — আর অসার গুণ বস্তুতে পরিবর্তনশীল। যথা, মানুষের সার-গুণ হল তার বুদ্ধি-বৃত্তি ও প্রাণিধর্ম। আর অসার-গুণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বাকি সব, যেমন চলা, বলা, কাঁদা, হাসা, রান্না করা ইত্যাদি। এই সার-গুণ আবার ব্যক্তিগত ও জাতিগত হতে পারে। (যদিও জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তি অবশ্যই জাতি-মণ্ডিত হওয়ার জন্য জাতিগত সার-গুণের অধিকারী হবে।) এই ব্যক্তিগত সার-গুণকে সার-গুণ বলা যাবে কি যাবে না এ স্বতন্ত্র দার্শনিক বিচার। সদৃশ-গুণসম্পন্ন একই জাতির অন্তর্ভুক্ত দুই ব্যক্তির পার্থক্য প্রকাশ করতে হলে ব্যক্তিগত সার-গুণ মানতে হয়, আমাদের দেশের কিছু দার্শ-নিক অবশ্য এই বিভেদক গুণ না মেনে 'বিশেষ' নামে এক স্বতন্ত্র পদার্থ মেনেছেন। যাই হোক সার-গুণ দ্বারাই হোক, আর বিশেষের দ্বারাই হোক, স্বাতন্ত্র্য পরিগৃহীত হয়। অর্থাৎ বস্তুর সারবত্তা বা তার স্বরূপ গুণ-নির্ধারিত। এ সকল ধর্মের আশ্রয় অবশ্যই সত্তাবান দ্রব্য। দ্রব্য-স্বরূপ নিরূপিত হয় তার গুণাবলী (সারই হোক আর অসারই হোক) বা অপর কোনও স্বতন্ত্র পদার্থ বা ধর্মের দ্বারা। আর এই জন্যই কি এদেশে, কি পরদেশে। বিশেষ করে পাশ্চাত্যে, দ্রব্য-সত্তা ও দ্রব্য-স্বরূপ পৃথক স্বীকার করা হয় (substance and attribute)। অনেক দার্শনিক একথাও বলেন যে আবির্ভাব কালে দ্রব্য এক মুহূর্ত অন্তত গুণ-বিরহিত থাকে। ধ্বংসকালেও সেরূপ। মোটকথা, অনেক দার্শনিকের মতেই সত্তা ও স্বরূপ ভিন্ন। দ্রব্যসত্তা গুণ-নিরপেক্ষ হলেও তার স্বরূপ সত্তা অতিরিক্ত অন্যান্য ধর্ম-নির্ভর। অর্থাৎ সত্তা রূপ-বিহিতও হতে পারে, আবার রূপ-বিরহিতও হতে পারে। অবশ্য অনেক দার্শনিক একথা মানবেন না এই কারণে যে রূপ-রহিত সত্তা থাকতে বা জ্ঞাত হতে পারে না; বস্তুত, তাঁরা বলবেন, সত্তার পরিগ্রহ তার স্বরূপে — রূপ-বিশিষ্ট হয়ে। রূপাবগাহী সত্তাই সবিকল্প প্রত্যক্ষের বিষয়। এ তর্কের চূড়ান্ত মীমাংসা সম্ভব স্বীয় অভিজ্ঞতা পর্যা-

৪৪ 'ওঁ', শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্ররচনাবলী—১২শ খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) পৃঃ ২৫৮।

লোচনায়। বহু সুধীজন একথা বলেছেন, বলছেন (যেমন সত্তাবাদী দার্শনিকবৃন্দ, existentialists) এবং বলবেন যে গুণ-বিরহিত সত্তা প্রকাশ হয়। সে জ্ঞানের নাম "প্রত্যক্ষ"ই দিই "সাক্ষাৎকার"ই দিই আর "বোধি"ই দিই, তাতে মূল প্রতীতির (যথা: "সত্তা কোনও গুণ বা ধর্ম নয়") ব্যত্যয় হয় না। একথা রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করবেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর দার্শনিক সমস্যার প্রারম্ভ হল "আমি আছি"-র দ্বন্দ্ব ও বিরুদ্ধতামূলক প্রয়োগ থেকে, সেই হেতু তিনি আরও অগ্রসর হলেন। সত্তা তাঁর কাছে এতই প্রকাশমান প্রতিভাত হল যে তিনি সত্তা ও স্বরূপের (existence and nature) ভেদ অস্বীকার করলেন। তাঁর কাছে "সত্তা মাত্রই স্বরূপ" এই প্রত্যয় দৃঢ় হল। অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যাবগাহী যে রূপ তা সত্যরূপ নয় — "তুমি", "আমি"-র বিচ্ছেদবোধ সত্তাহানিকর, কেন না স্বরূপ-হানিকর। প্রকৃতপক্ষে সত্তা ও স্বরূপের এই অভেদ-কল্পনাই সামঞ্জস্যের জনক। "যা আছে" তাই সত্য, অতএব সত্তা-চৈতন্য ও সত্য-চৈতন্য অভিন্ন। কিন্তু সত্তা-মাত্রে পরস্পরের সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক—রূপ বৈশিষ্ট্য স্বরূপ নয় — সত্তাই দ্রব্য-স্বরূপ। যেখানে আমরা পরস্পর বিশিষ্ট ও ভিন্ন সেখানে স্বতই আমরা বিচ্ছিন্ন — "অহং"-এর অস্থায়ী রূপাভাস। যেখানে আমরা সত্তাবান সেটিই আমাদের স্বরূপ, সেখানে আমরা পরস্পর সংবদ্ধ, সামঞ্জস্যময়। ফলত, পূর্বন্যায় অনুসারে সামঞ্জস্য কোনও জাতি বা ধর্ম নয়। অর্থাৎ সত্তার প্রামাণ্য তার থাকায়, থাকা অতিরিক্ত কোনও গুণে বা ধর্মে নয়। "আমি আছি"-র একটিই প্রমাণ, আর তা হল আমি আছি ("আমি আছি" = বাক্য। "আমি আছি" = অভিজ্ঞতা)।[৪৫] আমরা ভিন্ন গুণাশ্রয়ী ও স্বতন্ত্র, এ বোধেই প্রকৃত বিরোধের সূত্রপাত। একথা এবং সত্তা ও স্বরূপের অভিন্নতা মানলে স্বতই সিদ্ধান্ত হবে আমরা সবাই সত্তাবান ও সত্তাধর্মে সংবদ্ধ। এটিই সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যময়তা বা ঐক্যে-সংহত সত্তাকূট মাত্র ব্যক্তিজগতেই সীমাবদ্ধ নয় — পরন্তু ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির, তোমার সহিত আমার, ব্যক্তির সহিত বিশ্বের সম্বন্ধ তাই সামঞ্জস্য। এটিরই সামান্যীকরণ করলে বলা যাবে — "যা কিছু আছে তাই বা তারা সামঞ্জস্যময়।" অর্থাৎ এই সামান্য বাক্যে আমরা পাচ্ছি সত্য বা/এবং সত্তা নির্ধারণের উপায় (criterion) ও স্বরূপ (nature)। এ ভাবে রবীন্দ্রনাথ পেলেন ঐক্যবদ্ধতা (সামঞ্জস্য), যা অনুসৃত হয় সত্য ও সত্তার অভেদের প্রাক্‌স্বীকৃতি থেকে। ফলত "আমি আছি"-র যে মূল সমস্যা—বিরোধের সমস্যা — তা সত্তার রাবীন্দ্রিক সংজ্ঞায় হল সমাহিত। এখানে বলা আবশ্যক যে যদিও রবীন্দ্রনাথের মতে, "সত্য ও সত্তাস্বরূপ অভিন্ন", এই সত্তা কিন্তু সদৃশ বৈদান্তিক নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ নয় — অর্থাৎ বিমূর্ত বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "একটি গুণলেশহীন অবচ্ছিন্ন (abstract)" সত্তা নয়,[৪৬] মূর্তিহীন নীরূপ সত্তা নয়। সত্যকে মূর্তিহীন বা নীরূপ রবীন্দ্রনাথ বলতেই পারেন না, দার্শনিক সততা মানতে হলে। এ কারণেই তিনি "সামঞ্জস্য" ভাবধারা মানলেন যাতে সত্যে রূপহীন রিক্ততা না আসে। সত্তা যদি হয়

৪৫ A. F. Tarski, 'Semantic Definition of Truth' in *Semantics and the Philosophy of Language*, edited by L. Linsky.

৪৬ 'সামঞ্জস্য' শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র রচনাবলী—১২শ খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) পৃঃ ৩৬৮।

সামঞ্জস্যময়তা (এ পরিচ্ছেদে 'সামঞ্জস্য' ও 'সামঞ্জস্যময়তা' একই অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, কেননা রবীন্দ্রদর্শনে এদের মূলগত পার্থক্য নেই) তাহলে নানা ও বহু সত্তা মানতেই হবে। যেখানে সত্য 'এক' সেখানে সামঞ্জস্যের প্রশ্ন ওঠে না। অবশ্যই আমি ধরে নিচ্ছি "ঐক্যময়তা" ও "একত্ব" ভিন্নার্থক। অনেকের অন্তরে ঐক্যের যে রূপ তাই সামঞ্জস্যের রূপ, তাই সে নীরূপ নয়। এই অর্থে সত্তা অবশ্যই রূপময়। এটা বলায় তৎক্ষণাৎ মনে হতে পারে যে এ উপনয় পূর্ব-সিদ্ধান্তকে বাধিত করছে। কেননা আমরা পূর্বাহ্ণে "সার ও অসার ধর্ম" আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি যে সত্তা স্বাতিরিক্ত কোনও রূপ-নির্ভর নয়। সত্তা নিজেই নিজের স্বরূপ। কিন্তু এ বিরোধ নিতান্তই আপাত, কেননা, "স্বরূপ" ও "নীরূপ" নিঃসন্দেহে ভিন্নার্থক। শেষোক্ত ক্ষেত্রে সত্তায় রূপ অস্বীকৃত হচ্ছে। অথচ প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে রূপ আদৌ অস্বীকৃত হচ্ছে না, মাত্র এটুকুই বলা হচ্ছে যে সত্তা-বর্ণনা প্রসঙ্গে তার রূপ বর্ণনায় অতিরিক্ত কোনও পদের সাহায্য নিষিদ্ধ। আর "সত্তা-স্বরূপ" ভাবনা অসম্ভব মনে হয় না যদি [illegible] পূর্বেই স্থির করে না ফেলি যে সত্তা (existence) গুণ ব্যতিরেকে থাকতে পারে না [illegible] কিন্তু এ ত মাত্র ভিন্ন প্রতিজ্ঞা, ভিন্ন সংস্কার, বা ভিন্ন বিশ্বাসের কথা। [illegible] যা সত্তাতিরিক্ত কোনও ধর্মমাধ্যমে সত্তার পরিগ্রহ হবে, যদি না আমরা প্রত্য[illegible]কেই (লৌকিক) একমাত্র প্রমাণ বলে মানি? যেহেতু রবীন্দ্রনাথ তা মানেন না, সেই হেতু তাঁর উপর এ অভিযোগ প্রযোজ্য নয়। অতএব, রবীন্দ্রনাথ যা বললেন এবং যা বলায় তাঁর কোনও ন্যায়সম্মত বাধা নেই, তার সারমর্ম হল: সামঞ্জস্যময়তা নীরূপ নয়, রূপময়, কেননা 'সত্তা-স্বরূপ' অভেদাত্মক। "থাকাটাই" যেখানে সামঞ্জস্য-নির্ধারিত, সেখানে 'থাকাটাই' রূপময়তা। ফলে বৈদান্তিক নির্গুণ, রূপহীন অদ্বৈত থেকে রবীন্দ্রনাথের সামঞ্জস্যময় সত্তা বা রূপময় ঐক্যকে পৃথক বিবেচনা করাই বৈধ। সামঞ্জস্যের রূপটি ধরা পড়ে "সাহিত্যের পথে" গ্রন্থের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটিতে:

"গোলাপের আকারে আয়তনে, তার সুষমায়, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরস্পর সামঞ্জস্যে বিশেষভাবে নির্দেশ করে দিচ্ছে তার সমগ্রের মধ্যে পরিব্যাপ্ত এককে, সেইজন্য গোলাপ আমাদের কাছে কেবল একটি তথ্য মাত্র নয়, সে সুন্দর"।

"সঞ্চয়" গ্রন্থে "ধর্মের অর্থ" প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ এই সামঞ্জস্যই ব্যাখ্যা করছেন যখন তিনি বলছেন,—"আমার মধ্যে একদিকে চলা, এবং আর একদিকে পৌঁছানো, একদিকে বহু, আর একদিকে এক, একসঙ্গেই রহিয়াছে, নহিলে অস্তিত্বের মতো বিভীষিকা আর কিছুই থাকিত না। একদিকে আমার বিচিত্র শক্তি বাহিরের বিচিত্রের দিকে চলিয়াছে আর একদিকে আমার আনন্দ ভিতরের একের দিকে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে"।[৪৭] যা সত্য যা আছে তা ঐক্যবদ্ধ হয়েই আছে। অর্থাৎ বৈচিত্র্য ঐক্যে গ্রথিত—পরস্পর পরস্পরে সম্বদ্ধ; এই সম্বদ্ধ ঐক্যই সত্তা-স্বরূপ-সামঞ্জস্যময়তা। অথচ এই ঐক্যে একাকিত্ব নেই—নেই নৈঃসঙ্গ্যের আত্ম-সংহারী বেদনা। এ এক পরম আত্মীয়তার রাজ্য।

৪৭ রবীন্দ্র রচনাবলী—১২শ খণ্ড, (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) পৃঃ ৫৩৫।

"আকাশ-ভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।"

স্মরণ রাখতে হবে এ ঐক্য, এ সামঞ্জস্য নিশ্চল জড়পিণ্ডের সমন্বয় নয় — তা স্পন্দন-ময়। এ ঐক্য প্রাণময় চেতনার, মানব সত্তায় বিধৃত ঐক্য। আগেই বলেছি — সামঞ্জস্য মাত্র মানুষের সঙ্গে মানুষের নয়, মানুষের সঙ্গে বিশ্বেরও বটে। অর্থাৎ কি বিশ্ব, কি চৈতন্য, মানব সত্তায় আশ্রিত। বিশ্বও 'মানবীয় বিশ্ব'। এ কথা বারবার রবীন্দ্রনাথ জর্মান বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে আলোচনায় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা করেছেন। (*Religion of Man*—Appendix II) তিনি (রবীন্দ্রনাথ) বলছেন: "This world is a human world...truth, which is one with the universal Being, must essentially be human. . . ."।[৪৮] যদিও সামঞ্জস্য বা সত্যের আধার সেই বিশ্বমানব। যেখানে আমরা ক্ষুদ্র, আমরা বিচ্ছিন্ন সেখানে আমরা স্বার্থ প্রণোদিত, পরস্পর বিরোধী। আমাদের দৈনন্দিন জৈব তাড়নায় আমরা প্রয়োজনের যে প্রাকার গড়ে তুলি তা এমনই দুর্ভেদ্য যে আদান-প্রদানের পথ রুদ্ধ। লোভ ও লালসা, প্রবৃত্তি-চরিতার্থতা-নিপুণ যে 'অহং-সত্তা' তা অবশ্যই সামঞ্জস্যের পটভূমি নয়। অতএব সত্যের আশ্রয় যে মানব-সত্তা তা প্রয়োজনের রাজ্যের ঊর্ধ্বে লীলাময় চৈতন্যের ঐক্য। আমি যেখানে দেহ-কেন্দ্রিক সেখানে আমিও অসত্য। তাই মানবদেহের সত্যতা তার আনন্দময়তার, বিশ্বমানবের প্রকাশ-পৌরুষে। সামঞ্জস্যের রাজ্যে প্রয়োজনের স্থান নেই। কথাটি পরিস্ফুট নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে:

"When I say that I am a man, it is implied by that word that there is such a thing as a general idea of Man which persistently manifests itself in every particular human being, who is different from all other individuals. If we lazily label such a belief as "Pananthropy" and direct our thought from its mysteriousness by such a title it does not help us much. Let me assert my faith by saying that this world, consisting of what we call animate and inanimate things, has found its culmination in man, its best expression. Man as a creation, represents the creator, and this is why of all creatures it has been possible for him to comprehend this world in his knowledge and in his feeling and in his imagination, to realize in his individual spirit a union with a spirit that is everywhere."[৪৯]

৪৮ *Religion of Man*, (London: George Allen & Unwin, 1949) p. 223.
৪৯ ঐ, পৃ: ১০৩।

এই সুবৃহৎ সামঞ্জস্যের আধারও সেই অসীম বিশ্বমানব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় — "বস্তুত, সমস্ত পৃথিবীরই অভিব্যক্তি আপন সত্যকে খুঁজছে সেইখানে, এই বিশ্ব পৃথিবীর চরম সত্য সেই মহামানবে"।[৫০] প্রসঙ্গত, একথাও রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে পৃথিবীর সত্তারাজ্যে মানব-সত্তাই অর্থময়তার জনক। ফলে তথা-কথিত জড়-সত্তা চৈতন্যের স্পন্দনেচ্ছায় সার্থক, প্রগতিশীল। পরিবর্তন মাত্র পরিবর্তন নয়, উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত বিবর্তন। সামঞ্জস্য-ময়তা বৈসাদৃশ্য-বিরোধী, অতএব রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক সংস্থায় সকলেই সদৃশ, জড় মাত্র জড় নয়, সে প্রাণময়। "জড়ের বাহ্যিক সত্তার মধ্যে দেখা দিল একটি আন্তরিক সত্য। প্রাণ আন্তরিক"।[৫১] ফলে, "চৈতন্য ও বিশ্ব ; বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলছে"[৫২] এই সকল ধারার সম্মিলন যে অভিজ্ঞতায় উদ্ভাসিত হল সেই "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতার মূল অনুভব বর্ণনায় এই ঐক্য চেতনার বিশদ বর্ণন রবীন্দ্রনাথ বহু জায়গায় লিখেছেন — "মনে হল, মানুষ আজন্ম একটা আবরণ নিয়ে থাকে। সেটাতেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হলে সাংসারিক প্রয়োজনের অনেক অসুবিধা। কিন্তু সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খসে পড়ল। মনে হল সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলুম। মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখলুম"।[৫৩] নিরাবরণ, নির্মুক্ত, প্রয়োজন-উত্তীর্ণ এই যে আধ্যাত্মিক সত্তা তাকেই রবীন্দ্রনাথ অথর্ব বেদের ভাষায় বলেছেন মানুষের "উদ্বৃত্ত' (*Religion of Man*)। মানব চৈতন্যের এই উদ্বৃত্ত লীলাধর্মী, সৃজনশীল। এ পুস্তকের "শ্রেয়োদর্শন" খণ্ডে এর বিস্তৃত আলোচনা করা হবে তাই এখানে এ বিষয় কিছু বলা হবে না। মাত্র এটুকু বলে রাখি যে 'উদ্বৃত্তই' রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যদর্শনকে সমঞ্জস ও অভিনব রূপ দিয়েছে। শিল্পও বা শিল্পই যে সত্যান্বেষী তার সর্বোত্তম প্রমাণ সম্ভব হল মানব চৈতন্যে এই উদ্বৃত্ত স্বীকার করে।

৫০ 'মানুষের ধর্ম', রবীন্দ্র রচনাবলী—১২শ খণ্ড (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) পৃঃ ৬০২।
৫১ ঐ, পৃঃ ৬০২।
৫২ ঐ, পৃঃ ৬০৬।
৫৩ ঐ, পৃঃ ৬০৭।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিশ্ব

সত্তার প্রকার ও প্রকরণ যে সামঞ্জস্যময়তা এ আমরা দেখলাম। এই সত্তাধর্মিতার অনুরূপ ব্যাখ্যা বিশ্ব সম্বন্ধে কি ভাবে এবং কতদূর প্রযোজ্য এবার তাই বিচার করব এই অনুচ্ছেদে। সত্য বা সামঞ্জস্যময়তা অসীম, অনন্ত কিন্তু অনির্বাচ্য নয়। তা স্বতই প্রকাশধর্মী। যা অনির্বাচ্য বা অপ্রকাশিত তা সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য কোনটিরই আশ্রয় হয় না। সামঞ্জস্য প্রকাশের, সত্তার সামঞ্জস্য। সত্তা তাই প্রকাশধর্মী, সত্যও তাই প্রকাশ। "প্রকাশ কোনখানে? এই যে চারিদিকে যাহা দেখিতেছি তাহাই যে প্রকাশ। এই-যে সম্মুখে, এই-যে পার্শ্বে, এই-যে অধোতে, এই-যে উর্ধ্বে, — এই যে কিছুই গুপ্ত নাই। এই-যে সমস্তই সুস্পষ্ট। এই-যে আমার ইন্দ্রিয়মনকে অহোরাত্রি অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

স একধিস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ
স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ।

এই তো প্রকাশ, এ ছাড়া আর প্রকাশ কোথায়?"[৫৪] প্রকাশমান এই বিশ্বসত্তা রবীন্দ্রদর্শনে কি প্রকার? এটা প্রথমেই চোখে পড়বে যে সত্য বিশ্বরূপটি কোনও জ্ঞানাতীত নিহিত গুহায় বিরাজমান নয় — কোনও দুর্জ্ঞেয় বস্তুতত্ত্ব (substance) বা ঐশীময়তা, দুর্লভ কোনও অপ্রকাশ্যতা বিশ্বে নাস্তিতার সামিল। ফলে রবীন্দ্রদর্শন কোনও অর্থেই অজ্ঞাবাদের দর্শন (agnosticism) নয়। যা আছে তা প্রকাশমান হয়েই আছে। সত্য প্রকাশিত, ব্যাপ্ত, ঐক্যবদ্ধ। অর্থাৎ সত্তা যা সত্য-স্বরূপ বা সত্য যা সত্তা-স্বরূপ, — যা সামঞ্জস্যময়, তা কোনও অজ্ঞেয় বস্তু বা বিষয় নয়। এ জ্ঞান হয়ত ইন্দ্রিয়লভ্য নয়, কিন্তু লভ্য, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। অতএব বিশ্বসত্য বিচারের প্রাক্কালে এটা জানা কর্তব্য যে রবীন্দ্রদর্শনে বিশ্বরূপ বা বিশ্বসত্য, সে যাই হোক না কেন, দুর্জ্ঞেয় কোন রহস্য নয়। রহস্যময়তা অবশ্যই সত্তায় কেন্দ্রীভূত, কিন্তু সে রহস্য অন্য প্রকার। এবার সুরু করা যাক বিশ্ববিচার।

দর্শন আরিস্টটলের মতে 'বিস্ময়জাত'। আর সে বিস্ময় গভীর চিন্তারও আগের কথা। বিরাট বিশ্ব, তার প্রকৃতি-প্রাচুর্য ও বিশালতা মাত্র কবিকেই বিমোহিত করে নি, দার্শনিককেও করেছে উত্তেজিত ও প্রগল্ভ। তাই এবার আসা যাক বিশ্ব-বিচার প্রসঙ্গে। বিশ্ববর্ণনায় যুগ যুগ ধরে — কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে—দর্শন ও বিজ্ঞান মুখর হয়েছে, বিশ্বসত্য অন্বেষণে সমগ্র উৎসাহ ও মনোযোগ প্রয়োগ করেছে। বিজ্ঞান তার বর্ণনার

৫৪ 'আনন্দরূপ', 'ধর্ম', রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৯৩।

সুবিধার্থে প্রথমেই বিশ্বকে বিচ্ছিন্ন করেছে মানব-চৈতন্য থেকে। দর্শন কিন্তু পীড়িত এক নিবিড় অন্তরঙ্গতার সার্থকতায়। বিশ্ব ও চৈতন্য দুই বিভিন্ন ধারা। অথচ এক অপরকে ছাড়া থাকে না—দুইয়ের মধ্যে এক নিবিড় অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক। এই সম্পর্ক নিরূপণের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে কোনও দার্শনিক কি ভাবে তাঁর দর্শনচিন্তায় বিশ্ব-বর্ণনা করবেন। দার্শনিক ভাষায় বলা যায়, সত্তার একটি মূল সমস্যা জড় ও চৈতন্যের সম্পর্কের সমস্যা। রবীন্দ্রদর্শনে এই সম্পর্ক "সামঞ্জস্যের" মাধ্যমে কত সহজ সমাধান পেয়েছে সেটা দেখার প্রচেষ্টা করা যাক। জড় ও চৈতন্যের দ্বৈত বহুবার বহু দার্শনিকের বিশ্বের দার্শনিক ব্যাখ্যা করেছে বিপর্যস্ত ও অসংবদ্ধ। এ দুটি ধারা অস্বীকার করা যায় না, আবার স্বীকার করলে এমন এক বিরোধময় সত্তা-সামান্য ভাবতে হয়, যা যে-কোনও তথাকথিত দার্শনিক কাঠামোকে করে তোলে অস্থির ও অসংযত।

জড় ও চৈতন্যের সম্বন্ধ প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) পৃথক, (২) অভিন্ন। (১) এর আবার দুটি ভাগ—(ক) বিরোধী অতএব সম্পর্কহীন, (খ) বিভিন্ন কিন্তু কোনও অপর সত্তার (যা মহত্তম ও এক) আশ্রয়ে সম্মিলিত। (২) এরও আবার নানাতর বিভাগ: (প) অভিন্ন কেননা সত্তা মাত্রই জড়জ। এরই নাম জড়বাদ (materialism) (ফ) অভিন্ন কেননা সকলই চৈতন্য, জড় নেই, বস্তুত তা চৈতন্যেরই বিকার। সব কিছুকে চৈতন্য মেনেও আবার নানা মত সৃষ্ট হয়। (ব) নিখিল চৈতন্য সংখ্যায় বহু—এমন কথা বলবেন বিজ্ঞানবাদীরা, বলবেন ক্রোচের মত নব্য ভাববাদীরা। (ভ) চৈতন্য বস্তুত বৈচিত্র্য-হীন অদ্বৈত, এ কথা বলতেন শঙ্করাচার্য। (ম) চৈতন্য এক, কিন্তু তা বৈচিত্র্যময় ঐক্যের অর্থে। রবীন্দ্রনাথ এই শেষ মতটির প্রবক্তা। এবারে দেখা যাক, অন্যান্য মতগুলির কোনও একটি মানায় রবীন্দ্রনাথের অসুবিধা কি?

(১-ক) জড় ও চৈতন্য পৃথক, অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের বিরোধী সত্তায় আশ্রিত। জড় সম্বন্ধে যে পদ প্রয়োগ সম্ভব, চৈতন্য সম্বন্ধে তা সম্ভব নয়। যেমন জড় বিস্তারধর্মী, চৈতন্যের বিস্তার নেই। এখানে "বিস্তার" অর্থ আকাশাবচ্ছিন্নতা। অর্থাৎ জড় মাত্রই থাকে কোনও নির্ধারিত দেশে—এখানে বা ওখানে। কিন্তু চৈতন্যে এ উপাধি অপ্রযোজ্য। এবম্বিধ কারণে কিছু দার্শনিক এই দুই ধারায় সত্তাবিরোধ মানতে বাধ্য হয়েছেন। বিশেষ করে পাশ্চাত্ত্য জগতে দেকার্তে, লাইবনিৎস্ ও তৎপরবর্তী অনেকে। যেহেতু এরা বিরোধী অতএব সম্পর্কহীন, সামঞ্জস্যহীন। ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে বা পূর্বসিদ্ধ কোনও নিয়ম তন্ত্রে[৫৫] এই দুইয়ের আপাত সংযোগ বুদ্ধি ও প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। চড় মারলে রাগ হওয়া, বা ভয়ে সাদা হওয়া—এ জাতীয় দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় জড় ও চৈতন্যের যে সংযোগ প্রতীয়মান তা উপরি-উক্ত দুটি কারণে হয়। জড় ও চৈতন্য মূলত পরস্পর প্রকৃত স্বরূপে সংযুক্ত হয় না। অনতিক্রম্য এই বিরোধ সুধিজন স্বীকার করলেন দার্শনিক বুদ্ধির রাজ্যে। বলা মাত্রই স্পষ্ট হয়, এ জাতীয় সমাধান বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা-গ্রাহ্য নয়। নিয়মিত ঈশ্বরের

৫৫ 'Pre-established harmony'.

মধ্যস্থতা প্রতি লোকের প্রতি আচরণে, বা অগৃহীত কোন প্রাথমিক নিয়মতান্ত্রিকতা — এর কোনটিই দার্শনিক চিন্তাকে পরিতৃপ্ত করে না। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের নিকট সামঞ্জস্যই সত্তাধর্ম; ফলে যেখানে সত্তা-বিরোধ শুরুতেই মানতে হয়, সে দার্শনিকতা রবীন্দ্রদর্শনে অপরিগ্রাহ্য। (১—খ) জড় ও চৈতন্য পৃথক, কিন্তু একই ব্রহ্মের অংশস্থিত হয়ে বা এক পরম সত্তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে এ দুই ধারা সমন্বিত। প্রাচ্যে রামানুজ, পাশ্চাত্যে Spinoza প্রায় একথাই বলবেন। কিন্তু একথা বলতে হলে ভিন্নতার প্রাথমিক স্বীকৃতি থেকে যায়। এ বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণের পথ তৃতীয় দফার কোন সত্তা-প্রকার মেনে। পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথের মতে সামঞ্জস্যই সত্তা-প্রকার। ফলে কি প্রাথমিক স্তরে, কি মধ্যবর্তী স্তরে কোথাও ভিন্নতা স্বীকৃত নয় — ভিন্নতা মানলে সত্তা মানা যায় না, কেননা সামঞ্জস্যই যে সত্তারূপ। এতদ্ব্যতীত রবীন্দ্রদর্শনের মূল ও প্রথম কথাই হল সব সত্তাই "আমি আছি"-র প্রকাশ। এই "আমি আছি" ভিন্ন কোনও জড় সত্তারূপ স্বতন্ত্রভাবে রবীন্দ্রনাথ মানেন নি। ফলে এ সমাধানও রবীন্দ্রনাথ নিতে পারলেন না।

(২-প) জড় ও চৈতন্য অভিন্ন কেন না একটিই আছে, অপরটি নেই, বা একই অর্থে একটি অপরটিতে রূপান্তরিত করা যায়। অর্থাৎ চিন্তা জগতে একটি মানলেই তদ্দ্বারা সবকিছু ব্যাখ্যা করা যায়। কেউ এই রূপান্তরে দিয়েছেন জড়-প্রাধান্য — আর তাঁরাই হলেন বিশ্ব-ব্যাখ্যায় জড়বাদী। চার্বাক, মার্ক্স, ফরাসী দার্শনিক দিদেরো, আর্ণস্ট্, হেকেল, কিছু পুরাতন গ্রীক সাইরেনিয়াক ইত্যাদি। এঁদের বক্তব্য খুব স্পষ্ট; সত্তা-জগতের সম্পূর্ণ বিবরণ জড় বা / এবং জড়-রূপান্তরের বিকাশ ও বিবর্তনকথন। বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রদর্শন এ সমাধান গ্রহণ করতে পারে না। কেননা সামঞ্জস্য মাত্র প্রাণহীন সমন্বয় বা সামগ্রীকরণ নয় — রবীন্দ্রদর্শনে অন্তে সকল সত্তাই চৈতন্য-নির্ধারিত ও চৈতন্যে বিধৃত।

(২-ফ) জড় ও চৈতন্য অভিন্ন, কেননা সবই চৈতন্যময় বা চৈতন্যরূপ। এ কথার সদৃশ কথা রবীন্দ্রদর্শনের বক্তব্য। কিন্তু এই একীকরণের আবার নানা প্রশাখা-চিন্তাধারা বর্তমান।

(২-ব) বিজ্ঞানবাদীরা কিংবা ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচের ন্যায় নব্য-ভাববাদীরা (neo-idealists) বলেন নিখিল-ব্যাপী এই যে চৈতন্যের সর্বময়তা সেই চৈতন্য স্বয়ম্ভর, বিভিন্ন ও বহু। যদিও নিখিল-চৈতন্যময়তা রবীন্দ্রদর্শনের মূল বক্তব্য, তথাপি এমন চৈতন্য-বৈশিষ্ট্য মানলে সামঞ্জস্য থাকে না, থাকে না লীলাময় মুক্তির অন্তরঙ্গতা—বিশ্বব্যাপী ভাব-সঞ্চারী সৌন্দর্য-স্পন্দন।

(২-ভ) চৈতন্য বস্তুত বৈচিত্র্যহীন অদ্বৈত। বিশ্ব চিৎ-স্বরূপ, কিন্তু "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। রবীন্দ্রনাথ এই অদ্বিতীয়কে, শান্তকে গ্রহণ করলেন; কেবল এই অদ্বৈতের অন্তর-সংগঠন কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। শঙ্করাচার্য প্রমুখ অদ্বৈত বেদান্তবাদীরা সেই চিদানন্দের উপলব্ধি করলেন নির্বিশেষ একত্বে—নিখিল বিশ্বের অবলোপ। স্বাতন্ত্র্য বা বৈচিত্র্য এ দর্শনে মাত্র মায়া-উপহিত প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক অনুভব। পারমার্থিক স্তরে এক নির্গুণ "এক"—যে একে বৈচিত্র্য নেই; মাত্র তাই নয়, বৈচিত্র্য ছিল না বা হবে না। সেই নির্বিরোধ একের আশ্রয়ে

"সামঞ্জস্য"-বোধ নিরর্থক ও অসঙ্গত ভাবারোপ। কিন্তু পূর্বেই বলেছি "সামঞ্জস্য" রবীন্দ্র-দর্শনের প্রধানতম ও সর্বপ্রথম সোপান। অতএব "সামঞ্জস্য"-বিশ্বাসী দার্শনিক এই নিরুপাধিক একে পূর্ণতা পেলেন না। এ "এক" প্রায় শূন্যময়—যেখানে "চিত্তশুদ্ধি" ও *"চিত্তশূন্যতা" প্রায় একার্থক। ঔপনিষদিক যে ঐতিহ্যের দোহাই শঙ্করাচার্য-প্রমুখ* দার্শনিকরা দিলেন, সে ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথও মানলেন; কেবল সে ধারার অভিনব ও ভিন্নতর ব্যাখ্যা দিলেন দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে তাই:

(২-ম) চৈতন্য এক, কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তবাদীর অর্থে নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে সত্য যে প্রকাশ। প্রবাহ ও পরিবর্তন—কি ঐতিহাসিক কি আধ্যাত্মিক—মায়ামাত্র নয়, তা সত্য, নিয়ত ঘটমান। নানার মধ্যে, অনেকের অন্তরে, বৈচিত্র্যের কেন্দ্রে যে ঐক্যবদ্ধতা, যে একতা, যে সামঞ্জস্য তাই "একের" অর্থ। এ "এক" তাই অনেককে বর্জন করে নয়, তাকে অন্তর্ভুক্ত করে। বিশ্বজগৎকে যদি অদ্বৈত বলি, তার অর্থ আদৌ নয় যে সেখানে সত্য বৈচিত্র্যহীন; প্রকৃত অর্থ, বৈচিত্র্য মাত্র ভিন্নতা নয়, বিরোধ নয়, তা অন্তে ঐক্যবদ্ধ সামঞ্জস্য-স্বরূপ। সব সত্তাই এরূপ। বিশ্বসত্তাও তাই এই ঐক্যময় সামঞ্জস্য-বিধৃত সত্তা। রূপের মাঝেই তাই অরূপের ইশারা, সীমার মাঝেই অসীমের সুর। অনেকে বলতে পারেন এ ভাবধারা ত হুবহু পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক হেগেল বা তাঁরই ইংরাজ ভাবশিষ্য ব্রাড্‌লের কথা। এটি ভ্রমাত্মক অনুমান। একটি প্রধান পার্থক্য হল রবীন্দ্রদর্শনে এই "সামঞ্জস্য" ব্যক্তি-নিরপেক্ষ চিৎ-রূপ ব্রহ্মে (absolute) আশ্রিত নয়—এ সামঞ্জস্য "আমি আছি"-রই প্রকাশ। বিশ্বও তাই "আমি আছি"-র এক স্বাঙ্গীকৃত সত্তা।

উপরের বর্ণনা থেকে আশা করি রবীন্দ্রদর্শনে বিশ্বসত্তার মূল ধারণাটি ব্যক্ত ও নিরূপিত হল। অবশ্যই উল্লেখ মাত্র ব্যতিরেকে ঐতিহাসিকভাবে মতগুলির কোনও বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হল না; কিন্তু স্থানাভাবে ও সঙ্গতির জন্য ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা দমিত হল। বিশ্বে সামঞ্জস্য বা সম্বদ্ধতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ "আমার শরীর"। এই শরীর যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন ততক্ষণ সে আমার অভিযাত্রা ব্যাহত করে। কিন্তু তাকে যখন এই বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত করে দেখি—নিজেকে দেশ-কালে করে দিই বিস্তৃত, তখন শরীর অযথা পীড়িত করে না। সাধনা বা তপস্যার নামে শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন তাই রবীন্দ্রনাথের নিকট অত্যন্ত অযৌক্তিক। আমার থাকায় যে বিশ্ব-মানব সত্তা তার শরীরও সমগ্র শরীর। সেই বিশ্বকে বিচ্ছিন্ন করে আমার স্বতন্ত্র আমি বা "অহং"-এর চতুষ্পার্শ্বে সীমিত করে "আমার শরীর" বলা স্পষ্টতই সত্যের অপলাপ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ *Religion of Man* এ বলেছেন: "our physical body has its comprehensive reality in the physical world, which may be truly called our universal body, without which our individual would miss its function." (p. 147)

"যে আনন্দে গড়া আমার দেহ তার অন্ত নাই গো অন্ত নাই।" প্রকৃতপক্ষে আমার দেহের সীমানা ত নিতান্তই কৃত্রিম—আমারই অর্থক্রিয়াকারী সিদ্ধান্ত—তাও সর্বদা মানা হয় না।

কোথায় আমার দেহ শেষ? আঙুলের ডগায়, নখের শেষে? কিন্তু যদি বাঘ-নখ পরি তবে সেটাও কি হবে দেহাংশ? আমার ব্যথা কি দূরের ঐ বাগানে থাকতে পারে না? অন্তত পারার কোন ন্যায়সঙ্গত বাধা নেই। বস্তুত "আমার দেহ" এই পদের দেশাবচ্ছেদ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমার শরীর যে প্রান্তে এসে বিশ্ব-আকাশে মিলে যাচ্ছে, সেখানে কোথায় টানব সীমারেখা? এমন ত অনেক সময়েই হয় যে আমার ব্যথা আমি যেখানে অনুভব করছি সে স্থানটি তথাকথিত দেহাতিরিক্ত আকাশ? যেমন, পা যখন কাটা হয় তখন যে অংশটুকু শরীর থেকে কেটে ফেলা হয়েছে পূর্ব-সংস্কারবশত সেখানেও বেদনা বোধ করি—এ ত পরীক্ষালব্ধ সত্য। অর্থাৎ সংস্কার দ্বারা তথাকথিত শরীরান্ত যেখানে নির্ধারিত সেখানে সংস্কার পরিবর্তিত হলে দেহ-সীমার অনুভবও পরিবর্তিত হতে পারে। ফলে একমাত্র বেদনা-বোধ দিয়েই দেহ-সীমা নির্ণীত হতে পারে না। আমার দেহের কোন স্থান যদি রোগে নিঃসাড় হয় তাহলে কি সেটুকু আমার দেহ নয়? এমনই নানা দার্শনিক গোলযোগ ওঠে "আমার দেহ" এই পদের যথাযথ সংজ্ঞা দিতে গেলে। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ বা হোয়াইটহেড্ প্রমুখ দার্শনিক (Whitehead's 'Perception by causal efficacy') দেহের এই কৃত্রিম সীমা টানায় যখন আপত্তি করেন তখন তাঁদের বক্তব্য যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের মূল ভাবধারাটি, অর্থাৎ সামঞ্জস্য, এবার আরও একটু স্পষ্ট ও অর্থময় করা বৈধ। কবিত্বের অছিলায় রবীন্দ্রনাথ যে দার্শনিক সত্য উদ্ঘাটন করলেন, তারই কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করলে বোঝার সহায়তা হতে পারে:

> আমি কবি তর্ক নাহি জানি—
> এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে—
> লক্ষ কোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
> বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড সুষমা;
> ছন্দ নাহি ভাঙ্গে তার, সুর নাহি বাধে,
> বিকৃতি না ঘটায় স্খলন;
> এই তো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়া
> জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ।[৫৬]

সমগ্র বিশ্বের সত্তা মাত্র ভিন্ন ভিন্ন বিষয় (object) বা ঘটনার (event) "সমষ্টিই" নয়, তা সর্বব্যাপী সামঞ্জস্য-স্বরূপ—"প্রকাণ্ড সুষমা", থেমে নেই, তা প্রবহমান, ছন্দোময়। তদুপরি বিষয়-কূট বা সত্তা-সংঘ প্রাণহীন নয়—তা প্রাণময়, চৈতন্যচিহ্নিত; আর তাই সে সৌষম্যের আশ্রয় "জ্যোতির্ময় গোলাপ"। কবিতাটির এ ব্যাখ্যায় যদি কারও আপত্তি থাকে, তাহলে স্মরণীয় যে রবীন্দ্রদর্শনে সংহতি ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এই উদ্ধৃতিতে, কাব্য-বিচার কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র হতে পারে। কিন্তু দার্শনিকের বিশ্বাস যে কাব্য বা সাহিত্য

৫৬ 'রোগ শয্যায়', ২১ সংখ্যা কবিতা।

দর্শন-নিরপেক্ষ (অবশ্য এ মত স্বভই রবীন্দ্রমত-বিরোধী)। রবীন্দ্রদর্শনে বা সমজাতীয় দর্শনে বিশ্বসত্তার যে রূপটি পরিবেশিত হয় তা ন্যায়ত দৈনন্দিন সাধারণ অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বিরোধী বলেই প্রতিভাত হয়। অবশ্যই এ কথা সত্য যে রবীন্দ্রদর্শন বিজ্ঞান বা ইন্দ্রিয়জ অপরিকল্পিত প্রত্যক্ষকে প্রমাপ্রদ বলে বা সত্যসাধক বলে স্বীকার করে না। বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কি ধারণা তা আমরা এ পরিচ্ছেদেই বিচার করব এবং সেই প্রসঙ্গে প্রকৃত প্রস্তাবে সার্থক প্রমাজনক "প্রমাণ" কি তারও বিচার করব। এখন কিঞ্চিৎ "বিশ্ব" (world) ও "বিষয়" (fact / object) সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

বিশ্ব বা ইংরাজিতে যাকে "ওয়ার্ল্ড" বলে তা যেন বিষয় বা বস্তুস্তূপ (aggregate of things or object) মাত্র নয়। বিভিন্ন বিষয়ের সম্বন্ধবদ্ধ (এই সম্বন্ধকারী বিষয় বা বস্তু একও হতে পারে, বা ক্রমানুয়ে ততোধিক বহুও হতে পারে) সমগ্রতাকেই যেন বলা হয় বিশ্ব। এই সম্বন্ধকে এ কারণে আধুনিক ন্যায়শাস্ত্রে monadic, dyadic, triadic, n-adic (বিষয়ের সংখ্যার দ্বারা নির্ধারিত) প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু সম্বন্ধ যে কটিরই হোক, বা যে কটিই হোক, সম্বন্ধ বর্জন করে বিশ্ব বা world কথাটির অর্থ পরিস্ফুট বা গ্রাহ্য হয় না। বিষয়মাত্র যদি সত্য হয় তাহলে তার উল্লেখেই বাক্য সত্য হবে। জানদ, সার্থক বাক্যকে যদি ভাগ করা যায় (১) সত্য ও (২) অসত্য এই দুই ভাগে, আর সত্য বাক্য যদি মাত্র বিচ্ছিন্ন বিষয়গুলিকেই সূচিত করে তাহলে সেগুলির উল্লেখ মাত্রই সার্থক বাক্য সৃষ্টি করবে। কিন্তু কার্যত, তা করে না। আ'রও সহজ করে বলা যাক—যদি কাউকে বলা হয় বিশ্বজগৎকে সত্য সামগ্রী হিসাবে বর্ণনা কর বা বিবরণ দাও তাহলে ন্যূনতম সত্য-চিন্তার বাহক কি হবে বিচ্ছিন্ন বিষয়সূচক পদগুলি না সম্বন্ধ বিষয়-কোটি সূচক বাক্যগুলি? দৃষ্টান্তস্বরূপ: "ঘট", "পট", "আকাশ", "সর্প", "রজ্জু" এগুলিই সার্থক ও সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশক, না "এটি সর্প", "এটি শুভ্র", "ঘটটি বিসদৃশ" "বৃক্ষোপরি বানরটি ডাকিতেছে" ইত্যাদি পূর্ণ বাক্যগুলি? বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে সার্থক বাক্য-সংজ্ঞা প্রথম প্রকারে ("বাক্যং স্যাৎ যোগ্যতাকাঙ্ক্ষা সত্তিযুক্ত . . ." ইত্যাদি) ব্যাহত হয়। অর্থাৎ আসত্ত পদই বিশ্বসত্তা প্রকাশের ন্যূনতম বাহন। ফলে কেবল বিষয়-জ্ঞান বা বস্তু-পরিচয় হলেই বিশ্ব-পরিচয় হয় না। ফলত, সার্থক ও সত্যাসত্য বাক্য সৃষ্টি করতে হলে "কেবল বিষয়ে"র অভিজ্ঞতা অচল—"সম্বন্ধ বিষয়-জ্ঞানই" প্রকৃত পক্ষে বিশ্ব-জ্ঞানের একমাত্র প্রকাশক। এই কারণেই প্রখ্যাত ইঙ্গ-আমেরিকান আধুনিক দর্শনের পরমহংস জার্মান দার্শনিক ভিট্‌গেনস্টাইনের মতে—"1. The world is all that is the case". 1.1. The world is the totality of facts, not of things"।[৫৭] বস্তুজগতে এই সম্বন্ধই সার্থক অভিজ্ঞতার জনক, রবীন্দ্রনাথও একথাই বললেন। অবশ্য তিনি তাঁর দর্শনানুযায়ী সাজিয়ে অতিরিক্ত আরও

৫৭ L. Wittgenstein, *Tractatus Logico-Philosophicus*, translated by Pears and Mcguinness, (London : Routledge & Kegan Paul, 1961).

অনেক কথা পরিবেষণ করলেন সত্তা-বিষয়ে যা এ-জাতীয় দার্শনিক মতের ঘোর বিরোধী। রবীন্দ্রনাথ যা বলতে চাইলেন তার দার্শনিক মর্মার্থ এ ভাবে সাজান যায়: সম্বন্ধ যখন মানতেই হয়, তখন সর্বব্যাপী 'সম্বন্ধ-তা' স্বীকার করাই বাঞ্ছনীয়। আর এই 'সম্বন্ধ-তা'ই যদি সার্থক ও সত্য বাক্যের সূচক হয় তবে তাকেই সত্য বা সত্তা বলা বৈধ। অর্থাৎ সম্বন্ধতাই সত্তাস্বরূপ। এই সম্বন্ধ-সামান্যে রবীন্দ্রনাথ পেলেন সামঞ্জস্য। ফলে তাঁর দার্শনিক ভাষ্যে সামঞ্জস্যই হল সত্তা-স্বরূপ ও সত্য-নির্ধারক (criterion and nature of existence or truth)। সঙ্গতি রক্ষা করে বাক্য-সত্যেরও স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের মতে সার্থক সংহতি বা/এবং সামঞ্জস্য (coherence)। সত্য-জ্ঞানে সূচিত ও প্রকাশিত যে বিশ্ব তা সম্বন্ধ বিষয়-সমন্বয়, ঐক্যবদ্ধ সত্তা-সামগ্রী, একথা বলাই যথেষ্ট নয়; তাকে মানব-চৈতন্য-সাপেক্ষও ভাবতে হবে। অবশ্য আর এক দিক দিয়ে, মানব-চৈতন্যও প্রকাশিত বিশ্ব-সত্তা বীক্ষায়। ফলে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। অর্থাৎ সত্তামাত্রই স্বমুখীন চৈতন্য বা মানব চৈতন্য (subjective) নির্ভর। এ কথার যেন সদৃশ প্রতিধ্বনি দেখি জার্মান ফেনমেনোলজিস্ট হুসার্লের বক্তব্যে। চৈতন্য সর্বদাই "intentional", জগৎও সেইহেতু জীবন-নিরপেক্ষ নয়; সত্তা জগৎ বস্তুত "lebenswelt" বা "life-world"।[৫৮] মোট কথা, বিশ্ব-সত্তা নিরূপণে "প্রমাতৃ-চৈতন্য" ও "প্রমেয়-চৈতন্য" এই দুইয়ের অন্তরঙ্গতা ও ঐক্যে রবীন্দ্রনাথ সামঞ্জস্য-ময় এক অভিনব সত্তা-স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করলেন—বিশ্ব-সত্তার প্রকার নির্ধারণ এ দর্শনে তাই অতি সহজেই অনুমেয়। জড় ও চৈতন্যের সংহারী দ্বন্দ্বও হল অনায়াসে নির্বাসিত। আমার সঙ্গে প্রকৃতির অন্তরঙ্গতা রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাই এত মর্মস্পর্শী, এত গভীর। "বিশ্ব আমাকে পেয়েছে, আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে", রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি তাঁর স্বীকৃত "অলস কবির সার্থকতা" মাত্র নয়, দার্শনিক সততায় ভাস্বর। অর্থাৎ, বিশ্ব-সত্তা যেখানে সত্য সেখানে তা মাত্র সম্বন্ধ বিষয়-কূটই (ইংরাজী 'fact' অর্থে) নয়, সামঞ্জস্য-স্বরূপ চৈতন্য-বিস্তার। এই অর্থেই আমাদের পূর্ব প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ সত্তা ও সত্যের অভিন্নতা, প্রকাশিত হল। এই নিবিড় অন্তরঙ্গতা ও সংযোগের বিশিষ্ট রূপ দেখি সত্তাবাদী ফরাসী দার্শনিক সার্ত্রে-র লেখায়।[৫৯] আমার দায়িত্বে যদি আমি সকলের সঙ্গে

৫৮ "Brentano first and later Husserl, also recognized this defect in British empiricism, and focussed their attention especially on the relational, or what they called *intentional*, structure of Human awareness that is always related to, or stretched out toward, its object. It was this conception which later led Husserl and Heidegger to their discovery of the human life-world or *Lebenswelt*, as Husserl called it"—J. Wild, *Existence and the World of Freedom*, (U. S. A., 1963) p. 31.

৫৯ "When we say that man chooses himself, we do mean that every one of us must choose himself, but by that we also mean that in choosing for himself he chooses for all men. For in effect, of all the actions as man may take in order to create himself as he wills to be, there is not one which is not creative, at the same

বিজড়িত হই, তারই পরিপূরক আমার মুক্তিতেও আমি সর্বজনের নিকট ও অন্তরঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ একথা জানালেন তাঁর গানে—"আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে"।

সব সত্ত্বেও তবু প্রশ্ন থেকে যায় বিষয় যখন বিচ্ছিন্ন, বিশ্ব যখন ভিন্ন সামগ্রীতে রূপান্তরিত, তখন এই বিচ্ছিন্ন বিষয়গুলি কি অসত্য, অলীক, মিথ্যা বা মায়া? এর উত্তর দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তফাৎ করলেন তথ্য ও সত্যের। এমন কি সম্বদ্ধ বিষয় সমুদয় যখন চৈতন্যরূপে ভাবিত নয় তখন (ইংরাজি ভাষায় fact) তাও তথ্য সামগ্রী। স্বাঙ্গীকৃত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সকল বিষয় বা ঘটনাই তথ্যমাত্র। সত্যের ছোঁওয়া তারা পাবে তখনই যখন চৈতন্যে নিখিল হবে ঐক্যবদ্ধ; ঐক্যবদ্ধতা অসীমও হতে পারে—কেননা চৈতন্যরূপ আমি সীমাবদ্ধ নয়—সেও অসীম ও অনন্ত। বস্তুত যে আমি "ছোট" সে এই সামঞ্জস্য বোধেই হয়ে ওঠে অসীম, স্পর্শ পায় সেই অপরূপ সত্য, শিব, শান্তের। যাই হোক, তথ্য ও সত্যের এই প্রভেদ রবীন্দ্রদর্শনে প্রভূত মূল্যবান। বিজ্ঞান ও দর্শনের যে প্রভেদ তাও এই তথ্য-সত্য পার্থক্যকে কেন্দ্র করে। সাহিত্যে এই ধারণা কাজে লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই নন্দনতত্ত্বের প্রচুর সমস্যার সমাধানে সক্ষম হলেন।

প্রাথমিক ভাবে রবীন্দ্রদর্শনে তথ্য-বিচারের একটি সাধারণ ও সরল পদ্ধতি হল এই: আমাদের দৈনন্দিন বা নৈমিত্তিক জীবন ধারণের প্রয়োজনের রাজত্বের সামগ্রী হল "তথ্য" আর বিশ্বমানবের লীলাক্ষেত্রে উদ্‌বৃত্ত-জন্য যে আয়োজন তাই হল "সত্য"। প্রকৃত সামঞ্জস্যও এই উদ্‌বৃত্তেই সিদ্ধ। কিন্তু এ-জাতীয় প্রভেদ দার্শনিক দৃষ্টিতে মনে হবে খুবই অস্পষ্ট ও অপরিণত। তাই এ প্রভেদটি আরও পরিষ্কার করা বোধ হয় ভাল।

পূর্বে দার্শনিক পদ্ধতি বিচারকালে আমরা দেখেছি যে তন্ময়তার পথে যে-দার্শনিক অন্বেষণ সেখানে কোনও জ্ঞানই সম্পূর্ণভাবে নৈর্ব্যক্তিক নয়। যেখানে কোনও জানা একান্ত ও পূর্ণভাবে স্বনির্ভর, এবং তার আধেয় ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিচ্ছিন্ন বিষয়সামগ্রী তা প্রকৃত সত্যের অবচ্ছিন্ন রূপ মাত্র—সত্য সেখানে আমাদেরই অজ্ঞতায় আবৃত। এই বিচ্ছেদও অর্থবান, যখন সে এক সমগ্র ঐক্যে গ্রথিত—সে পূর্ণ যখন অংশ গ্রহণ করে এক সামঞ্জস্যময় সত্তাপ্রকারে, আর তখনই তথ্য হয়ে ওঠে সত্য। "যেখানে দেখি আমাদের পাওয়া বা জানার অস্পষ্টতা সেখানে জানি, মিলিয়ে জানতে না পারাই তার কারণ"।[৬০] আরও বিশদ করে বলতে হলে—"আমাদের মন যে জ্ঞানরাজ্যে বিচরণ করে সেটা দুই-মুখো পদার্থ, তার একটা দিক হচ্ছে তথ্য, আর একটা দিক হচ্ছে সত্য। ...তথ্য যাকে অবলম্বন করে থাকে সেই হচ্ছে সত্য।

আমার ব্যক্তিরূপটি হচ্ছে আমাতে বদ্ধ আমি। এই যে তথ্যটি, এ অন্ধকারবাসী; এ আপনাকে আপনি প্রকাশ করতে পারে না। যখনই এর পরিচয় কেউ জিজ্ঞাসা করবে

---

time, of an image of man such as he believes he ought to be . . . . In fashioning myself I fashion man."—J. P. Sartre, *Existentialism and Humanism*, Translated by P. Mairet (London, 1948) pp. 29, 30.

৬০ "তথ্য ও সত্য", "সাহিত্যের পথে" (বিশ্বভারতী: ১৩৫৬) পৃঃ ৪৯।

তখনই একটা বড় সত্যের দ্বারা এর পরিচয় দিতে হবে, যে সত্যকে সে আশ্রয় করে আছে। ...তথ্য খণ্ডিত স্বতন্ত্র—সত্যের মধ্যে সে আপন বৃহৎ ঐক্যকে প্রকাশ করে।"[৬১] অর্থাৎ তথ্য অলীক অর্থে অসত্য নয়, সে অসত্য নিজস্বতায় সত্তাহীন, অনাশ্রয় বলে। সত্যের আশ্রয়ে সামঞ্জস্যবদ্ধ তথ্যাংশগুলি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। একটি অতি প্রচলিত দার্শনিক পরিভাষায় বলা যায়, তথ্য হল 'objective' আর সত্য হল 'subjective'। মূল কথা, বিশ্ব যখন আমার চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন তখন সে শুধুই তথ্য, অতএব অপ্রকাশ, অস্ফুট, বস্তুত এক অর্থে "বিশ্বই" নয়। কিন্তু আমার চৈতন্যে যখন সে অঙ্গীকৃত, সে তখন আমার ভাবের দোসর, লীলাত্মীয়, তখনই সে প্রকাশ, সে সত্য, সে সৃষ্টি। আরও নিরেট করে বলতে গেলে বলতে হয়, যখন একটি সঙ্গীত শুনি তখন মাত্র শব্দগুলি তথ্য—কিন্তু সুরে ঐক্যবদ্ধ শব্দসমন্বয় হল সত্য। বিজ্ঞান এই তথ্য-রাজ্যের জালে আবদ্ধ থাকে—তাই সে ততটা মিথ্যা নয়, যতটা অর্থহীন। বস্তুত বিশ্বজগতের বিষয়গুলি যতক্ষণ না আমার চৈতন্যে অধিষ্ঠিত হল, ততক্ষণ সে অর্থহীন, সে তথ্য। তথ্য তখনই অর্থবান হয় যখন চৈতন্য-আলোকে সে ঐক্যবদ্ধ ও উদ্ভাসিত—এই উদ্ভাসেই তার মূল্য, তার অর্থ, তার প্রকৃত সত্তা। জগতে একটি টেবিল নিজেই নিজের লক্ষ্য হতে পারে না — সে প্রাণহীন জড় পদার্থ। কোনভাবেই সেখানে সার্থকতার প্রশ্ন ওঠে না। এই বিরাট পরিবর্তনশীল "হওয়া"র জগতে সে যেন থেমে গেছে। কিন্তু যখন সে আমার ব্যবহারের সামগ্রী তখন সে মাত্র টেবিল নয়, এক বৃহত্তর ঐক্যপাশে স্বীকৃত—সে হল মূল্যবান, আমার ভাবপ্রকাশের সহায়ক। বিশ্বজগতের বিবর্তনের রাজ্যে সার্থকতার প্রশ্ন ওঠে তখনই যখন বিষয়গুলি মানব-চৈতন্যে পরিগৃহীত। যে বিষয় সম্বন্ধে উদ্দেশ্যের বা লক্ষ্যের প্রশ্ন অচল, সে কখনই সত্য নয়। এই উদ্দেশ্যময়তামণ্ডিত তথ্যই সত্য। *Religion of Mun* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"We must know that the evolution process of the world has made its progress towards revelation of its *truth*—that is to say some inner value which is not in the extension in space and duration in time."[৬২]

উপরি-উক্ত উদ্ধৃতি তথ্যের উপর আলোকপাত করল নিঃসন্দেহে, কিন্তু সেই সঙ্গে জানাল যে দেশ ও কাল যা সত্তাকে সীমাবদ্ধ ও স্বতন্ত্র করে তাও পড়ে তথ্যের কোঠায়। আরও বিশদভাবে ঐ পুস্তকেই সুন্দর একটি রূপকের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তথ্য-সত্য ভেদ করেছেন এই বলে :

"In the region of Nature, by unlocking the secret doors of the workshop department, one may come to that dark hall where

৬১ ঐ, পৃঃ ৫৪।
৬২ *Religion of Man*, p. 29.

dwells the mechanics and help to attain usefulness, but through it one can never attain finality. Here is the storehouse of innumerable facts and, however necessary they may be, they have not the treasure of fulfilment in them. But the hall of union is there, where dwells the lover in the heart of existence. When a man reaches it he at once realizes that he has come to truth, to immortality, and he is glad with a gladness which is an end, and yet which has no end."[৬৩]

আবার আর এক জায়গায় বলেছেন, এই তথ্যই সামঞ্জস্যে বাঁধা পড়লে হয়ে ওঠে সত্য। "We believe any fact to be true because of a harmony, a rhythm in reason . . ."[৬৪] উপরে যতটুকু বলা হয়েছে তা থেকে আশা করি তথ্য ও সত্যের প্রকৃত সম্পর্কটুকু পরিষ্কার হয়েছে। আরও সংক্ষিপ্ত করে এবার তথ্যের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি দেখান যাক। (১) তথ্য হল অবচ্ছিন্ন বিমূর্ত (abstract)। (২) তথ্য তাই, যা নিজস্বতায় অনাশ্রয়, যা কেবল বিষয়মুখী (objective)—স্বমুখীন নয় বা ব্যক্তিচৈতন্যে বিধৃত নয়। অর্থাৎ সত্য যা তা চৈতন্যনিরপেক্ষ নয়, উপরন্তু চৈতন্যে বিধৃত বলেই সার্থক। "আমি আছি"র সঙ্গে যা সম্পর্কিত নয়, তাই তথ্য। এর একটি সুন্দর উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ বহু জায়গায় দিয়েছেন—সে হ'ল তাঁর ভৃত্য মোমিন মিঞা। যতদিন সে বিচ্ছিন্ন একজন ততদিন সে তথ্যমাত্র, যখন সে শোক-মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যে "কন্যার পিতা" রূপে প্রতিভাত হল তখনই সে হল সত্য। (৩) তথ্য অসম্বদ্ধ, সামঞ্জস্যহীন, এবং এ অর্থে অসৎ ও মূল্যহীন (value-neutral) বা উদাসীন। (৪) তথ্য মানব-চৈতন্যের উদ্‌বৃত্তরাজ্যের বাসিন্দা নয়, সে নিতান্তই প্রয়োজন-নিয়ন্ত্রিত। উক্ত এই চারিটি বৈশিষ্ট্যই প্রকৃত সত্যের স্বরূপকে আবৃত করে—আর তাই তথ্য-সত্যের বিরোধ। প্রকৃতপক্ষে অসম্পূর্ণতার সঙ্গে সম্পূর্ণতার বিরোধ। এবং এটাও বোঝা গেল যে তথ্য হল আপেক্ষিক—চূড়ান্ত অবস্থা নয়। আজ যা তথ্য, কাল তাই পূর্ণতায় আশ্রিত হয়ে সত্য হয়ে ওঠে। অর্থাৎ প্রকৃতিতে "সত্য" ও "তথ্য" বলে দুরকমের তালিকা হয় না। দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্যে এই প্রভেদ। বিশ্বে যেমন দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যে পাই তথ্য ও সত্য, ঠিক তেমনই জ্ঞানরাজ্যে পাই বিজ্ঞান ও দর্শন বা ধর্ম। বিজ্ঞান তার অসম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করে কেবল তথ্যই সঞ্চয় করে। এখানে বলে রাখা কর্তব্য যে রবীন্দ্রদর্শনে সংহতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন যে স্বীকৃত মূল ভাবধারা, যাকে 'সামঞ্জস্য' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তার দ্বারাই আবার এই তথ্য-সত্যের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া যায়। যা সমঞ্জস তাই সত্য, যা বিষম, অসমঞ্জস তাই তথ্য। এখানে একটি সংশয় ওঠা স্বাভাবিক যে, কাল্পনিক বিষয়গুলিও তো সামঞ্জস্য-বিহিত হতে পারে, তাহলে কি তারাও সত্য। অবশ্যই তাই। সত্য রবীন্দ্রনাথের কাছে সামঞ্জস্যময়তা—কাল্পনিক

৬৩ ঐ, পৃঃ ১০৬—৭।
৬৪ ঐ, পৃঃ ১৪২।

বিশ্ব যদি সামঞ্জস্যময় হয় তাহলে তাও সত্য। "কবি তব মনোভূমি রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেন . . . , সেই সত্য যা রচিবে তুমি"। ফলে ন্যায়-পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ সুপ্রতিষ্ঠিত—চিন্তাসংহতি তাঁকে "সত্য মাত্রই ঘটনা" এই তীব্র সংস্কারের হাত থেকে স্বচ্ছন্দে মুক্তি দিয়েছে। যাই হোক, বিজ্ঞানের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। সাধারণ জ্ঞানে বিজ্ঞানকেই বিশ্ব-সত্য অন্বেষণের ধারক ও বাহক মনে করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এ ধারণা ভ্রমাত্মক মানলেন। বিজ্ঞান যা চর্চা করে তা সত্য নয়, তথ্যমাত্র। একটু বিশদ করা যাক। বিজ্ঞান হল তাই, ধাতুগত অর্থে, যা বিশেষ জ্ঞান দেয় যে কোন বিষয় বা রাজ্য বা জগৎ সম্পর্কে। এখন এই "বিশেষ"টি কি? এটি প্রকৃতপক্ষে নিম্নরূপঃ (১) প্রমেয়কে প্রমাতা-নিরপেক্ষরূপে গ্রহণ করা (২) যুক্তি-তর্কসাপেক্ষ বুদ্ধিগ্রাহ্য একটি তত্ত্ব বা system নির্মাণ করা। (৩) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা সংজ্ঞা-নির্ধারিত পরিমাণকে (quantity) সর্বপ্রাধান্য দেওয়া। একটু বিচার করলেই দেখা যাবে এ-কটি গুণই বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী পরিচালিত করল মাত্র তথ্যের দিকে। সার্থক মূল্যময় সত্তাকে রূপান্তরিত করা হল অনর্থক উদাসীন জড়ত্বে।

বিজ্ঞানের নিজস্ব একটি পদ্ধতি আছে, সেটি ভাল হোক মন্দ হোক তার সেটিই পদ্ধতি; এই পদ্ধতি, বহু পরীক্ষিত এবং কার্যকরী। এই "ক্রিয়াকারিত্ব" কিন্তু কোনও চরম অর্থ-সূচক (absolute) পদ নয়। এ পদটি আপেক্ষিক অর্থেই প্রযোজ্য। আমি যে তত্ত্ব নির্মাণ করছি তার লক্ষ্যের অপেক্ষায় স্থির হয় সেই তত্ত্বে "ক্রিয়া-কারী" পদ্ধতি কি? বস্তুত, অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি কি করতে চাই তার উপরই নির্ভর করে কোন পদ্ধতিটি এই প্রসঙ্গে ক্রিয়াকারিত্বের জনক হবে। এই পদ্ধতি মানতে হলে উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি তাতে মানতেই হবে। অর্থাৎ প্রমেয়কে প্রমাতা-নিরপেক্ষ করে—ব্যক্তিগত আবেগ বা আগ্রহ-অনাগ্রহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবতে হবে। এই জন্যই পূর্বে আমরা বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে বলেছি "পর্যবেক্ষণের পথ"। জ্ঞেয় বস্তু বা বিষয়কে জ্ঞাতার ভাবাবেগ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে—বিচার বিশ্লেষণের ধরনই এই। "ফুলটি সুন্দর" কি "অসুন্দর", "আমার ভাল লাগে", কি "মন্দ লাগে"—এ জাতীয় অনুভব ফুলের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে একেবারেই অবান্তর বলে ধরে নিতে হবে। তা করতে হলে অভিজ্ঞতার সর্বাঙ্গীন গ্রহণ বিজ্ঞানে অবাঞ্ছিত, মাত্র সেইটুকুই প্রয়োজন যেটুকু ব্যক্তিনিরপেক্ষ। অবশ্য আগেই দেখেছি এ দ্বন্দ্ব সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব তত নয় যত পূর্ণতার-অপূর্ণতার দ্বন্দ্ব। ফলে যে-কোনও পূর্ণ সত্যকে নিম্নরূপে অপূর্ণভাবে দেখা বা বর্ণনা করা যায়। একটি সিদ্ধ ব্যক্তি-সাপেক্ষ বাক্য ধরা যাক—"আমি আজ পড়ার সময় আমার হাতটি তুললাম"। এটি একটি কর্ম-প্রকাশক বাক্য। কর্তা ভিন্ন এর সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। কিন্তু এটিকেও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে কর্তা-মুক্ত করে বর্ণনা করতে পারি, যথাঃ "ক—সময়ে, খ—দেশে একটি হাত উঠল"। কিন্তু নিঃসন্দেহে "হাত উঠল" ও "হাত তুললাম" ভিন্নার্থক ও ভিন্ন প্রতীতির জনক। অবশ্য "হাত তুললেও হাত উঠবে", কিন্তু এর উল্টোটি সত্য নয়—অর্থাৎ "হাত উঠলেই হাত তুললাম" এ-কথা সত্য নাও হতে পারে। এই দুটি বিবরণের মধ্যে

এক অর্থে "কর্তা-হীন বর্ণনাটি" সত্য হলেও প্রকৃত ঘটনাটির সম্পূর্ণ বিবরণ নয়। অথচ অন্য বর্ণনাটি কর্মকে কর্তার সহিত সংযুক্ত করে সার্থক ও সম্পূর্ণ বর্ণনা দিল। এ কথা অবশ্যই গ্রাহ্য যে প্রয়োজনের তাগিদে বা আমার সুবিধার্থে ঘটনাটির নৈর্ব্যক্তিক বর্ণনা আমি দিতে পারি—কিন্তু সে সিদ্ধান্তে ঘটনাটির অসম্পূর্ণ বর্ণনা হবে এ কথাও অনস্বীকার্য। বিজ্ঞান এই অসম্পূর্ণতা কাটিয়ে উঠতে পারে না। এই অর্থেই পূর্বোক্ত প্রথম বৈশিষ্ট্যটি বিজ্ঞান-আলোচনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর বিচ্ছিন্ন করে বলেই বিজ্ঞান তথ্যান্বেষী। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মূলত অভিজ্ঞতা-নির্ভর। অথচ অভিজ্ঞতা-সূচক বাক্য "অভিজ্ঞ"-হীন নয়, তাই দেখা দেয় এক প্রচণ্ড দার্শনিক সমস্যা। "আমি কিছু দেখেছিলাম" বা "দেখেছি"—এটাই যদি হয় চূড়ান্ত প্রামাণ্য তাহলে বিজ্ঞান ত প্রমাতা-নিরপেক্ষ হল না। এই সমস্যার সমাধানকল্পে কিছু একরোখা বিজ্ঞান-দার্শনিক, যেমন জার্মানীর অটো নয়রাথ বললেন যে এই প্রাথমিক অভিজ্ঞতা-বাক্যগুলির (basic statements) প্রকাশে "আমি" "তুমি" ইত্যাদি সর্বনাম অচল ও অসঙ্গত। ব্যক্তিকেও বিষয়ে রূপান্তরিত করে বলতে হবে "(ক-সময়ে অটো নয়রাথ দেখলেন। ক-১ মিঃ গতে বললেন—"এখানে এখন গ)"। এই জটিলতা ক্রমশ বেড়েই চলল—প্রাথমিক বাক্য আর সরল রইল না। সমভাবী অপর এক জার্মান দার্শনিক ও নৈয়ায়িক রুডল্ফ কার্নাপ একই প্রচেষ্টা দেখালেন বিস্তারিত ন্যায়-জাল প্রয়োগ করে। কতটা এঁরা সফল হলেন এটা ইতিহাস বিচার করবে —এবং এ তত্ত্বের কূট ন্যায়-বিচারের গভীরে যাওয়া আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিকও হবে না। দার্শনিক হিসাবে এটুকু ধরা যায় যে সরল অভিজ্ঞতার প্রকাশ "আমি লাল দেখছি", তাকে তার প্রকৃত ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে কত জটিলতাই না সৃষ্টি করতে হচ্ছে—ফলে কিঞ্চিৎ কৃত্রিমতা-দুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী নিতে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যও এই কারণে যথার্থ যে যা স্বভাবত অকৃত্রিম তাকে তার পূর্ণতা, তার ঐক্যবদ্ধতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিজ্ঞান সত্যের এক কুশ-পুত্তলিকা নির্মাণ করেছে। অর্থাৎ বিজ্ঞান স্বীয় সুবিধার জন্য কিছু অংশ বর্জন করছে সত্য-সামগ্রীর। ফলে তার সমগ্র রূপটির হচ্ছে মহতী বিনাশ। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক S. Körner এই দৃষ্টির নাম দিয়েছেন—"neglecting the negligible" অবশ্য "negligible" কোনটি, সেটির সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান স্ব স্ব প্রসঙ্গ অনুসারে। রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য তাই বিজ্ঞানের এই অসম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে—সত্যের এই বিকৃতির বিরুদ্ধে। তাঁর মতে জনৈক ডাক্তার বৈজ্ঞানিক হিসাবে তাঁর সন্তানের চিকিৎসা-কালে হয়ত কিঞ্চিৎ নৈর্ব্যক্তিক হবার চেষ্টা করতে পারেন বা করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু নিয়মিত এই বিচ্ছেদকেই নীতি হিসাবে গ্রহণ করার অর্থ সত্যের অপলাপ করা:

> "The scientific knowledge of his son is information about a fact, and not the realization of a truth. In his intimate feeling for his son he touches an ultimate truth—the truth of relationship, the truth of harmony in the universe, the fundamental principle of

creation. It is not merely the number of protons and *electrons* which represents the truth of an element ; it is the mystery of this relationship which cannot be analysed."[৬৫]

এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, সত্য সম্বন্ধে তথাকথিত বৈজ্ঞানিকবৃন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দুই জগতের ব্যবধান। রবীন্দ্রনাথের মতে সত্য কখনই আবেগ-নিরপেক্ষ বিবরণ নয়, তা রহস্যময় সত্তালোকের আনন্দ-দ্বার উন্মাটন। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ সামঞ্জস্যকে তার প্রাথমিক ভাবধারা করলেন সেহেতু বিজ্ঞানের এই "কৃত্রিমতা"-র দিকটিকে তিনি সত্যের বিকার বলতেও বাধ্য। আমাদের দায়িত্ব এক্ষেত্রে এটাই দেখান যে রবীন্দ্র-দর্শনে একবার ঐ প্রাথমিক ভাবধারা "সামঞ্জস্যকে" সত্তার স্বরূপ মানলে বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর উক্ত ভাবধারা তাঁর চিন্তার সংহতিই প্রদর্শন করে—ন্যায়-সঙ্গতি রক্ষা করে। এই সামঞ্জস্য বা "harmony" কে একাধারে সৌন্দর্যের স্বরূপ বলে তিনি বিজ্ঞানের এই বিচ্ছেদের দিকটিকে "অসুন্দর"ও বললেন:

"I still remember the shock of repulsion I received as a child when some medical students brought to me a piece of a human windpipe and tried to excite my admiration for its structure."[৬৬]

এই মূল্যবোধের পার্থক্য দেখেই রবীন্দ্রনাথ মনে করলেন, বিজ্ঞান আমাকে স্বস্তি বা আরাম দিতে পারে, কিন্তু আনন্দ দিতে পারে না—শান্তি দিতে পারে না—

"In order to live efficiently man must know facts and their laws. In order to be happy he must establish harmonious relationship with all things with which he has dealings. Our creation is the modification of relationship."[৬৭]

হয়ত মানুষকে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখারই অবশ্যম্ভাবী কুফল ধ্বংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নির্মানে বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োগ। কার্ল ইয়েস্‌পার্স এবং অন্যান্য মানবপন্থী দার্শনিকবৃন্দ এই অতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগের ঘোরতর বিরোধিতা করেছেন ও করছেন। প্রাণের বিরাট বৈচিত্র্য, সম্পদশালিতা, তেজস্ক্রিয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল একটি বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা, যথা: "প্রাণ মাত্র সূর্য-কিরণে উজ্জ্বল কয়েকটি অঙ্গার অণু বা পরমাণু" ("Life is nothing else but a sunbeam glitering on an atom of carbon"), দ্বারা প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করা যায় না। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের এই একদর্শিতা উল্লেখ করে পাশ্চাত্য ও আমেরিকান দার্শনিক ওয়াইল্ড

৬৫ ঐ, পৃঃ ১০০।
৬৬ ঐ, পৃঃ ১০০।
৬৭ ঐ, পৃঃ ১৩৩।

যা লিখেছেন তা পাদটীকায় উদ্ধৃত হল। [৬৮] উদ্ধৃতিটি দেওয়ার উদ্দেশ্য এটাই দেখান যে ব্যক্তিমানসে প্রতিভাত জগৎ ও বিজ্ঞানের জগৎ এদুটি অনেকেই স্বতন্ত্র ও প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির তুলনায় সম্পূর্ণতর বলে মনে করেন। এখানে বিজ্ঞানপন্থীরা এ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে বিজ্ঞানের প্রমেয়কে যদি ব্যক্তি-নিরপেক্ষ না করা যায় তাহলে বিচার হবে কি করে, বিশ্লেষণের উপায় কি হবে? এর উত্তর দিতে গিয়ে আমরা পাই উপরি-উক্ত বিজ্ঞানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সর্বসাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্য বিচার-পদ্ধতি গ্রহণ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষে প্রামাণ্য আরোপ। যা দেখা যায়, যা ছোঁওয়া যায়, যা শোনা যায়, (স্মর্তব্য: "যা দেখি", "যা শুনি", "যা ছুঁই" তা নয়—এগুলি ব্যক্তি নির্ভর প্রকাশ।) সেই অভিজ্ঞতা-সামগ্রীকে যুক্তি-তর্ক দিয়ে সাজিয়ে তত্ত্ব পরিকল্পনা (system building) করাই বিজ্ঞানের দায়। নচেৎ সফল ভবিষ্যদ্বাণী (যা কোনও বিশেষ একজনের অভিজ্ঞতা লভ্য নয়, সর্বসাধারণের অভিজ্ঞতা লভ্য) বিজ্ঞান করবে কি করে? প্রকৃত জ্ঞান ব্যক্তি-নির্ভর হতে পারে না। ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি (Reason) দিয়ে যা যাচাই করা যায় না তার সম্বন্ধে "সত্য-মিথ্যা" নির্ধারণ করি কি উপায়ে? আর 'সত্য-মিথ্যা' নির্ধারিত না হ'লে, 'সত্য-মিথ্যা' বাছাই না হলে, বিজ্ঞান তার জ্ঞানদ বৃত্তিই হারাবে। সত্য কিছু তোমার, আমার পৃথক পৃথক মানা যায় না (মানলে, বিরোধকালে কোনটি গ্রহণ করব, এর সমাধান হয় না)। সত্য সর্বজনীন; কিংবা সর্ব-জন-নিরপেক্ষ। যা সত্য তা কেউ না জানলেও সত্য। সত্যের এই সংজ্ঞা বিজ্ঞান মানে বলেই রবীন্দ্রনাথের মতে, বিজ্ঞান সত্যকে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ করতে গিয়ে তথ্যে রূপান্তরিত করে ফেলে। এই মত-বিরোধের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাই রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের কথোপকথনে। রবীন্দ্রনাথের মতে:

> "There cannot be anything that cannot be subsumed by the human personality, and this proves that the truth of the universe is human truth".

আর আইনস্টাইনের উত্তর হল:

> "I cannot prove scientifically that truth must be conceived as a truth that is valid independent of humanity; but I believe it firmly."[৬৯]

[৬৮] "These inner factors of lived experience may be ignored as subjective by the detached attitude which is normal for science, but they are nevertheless important to living men and play an essential role in the world horizon, which as Husserl said, is relative to man and subjective. This is certainly true in spite of the vast range of this world horizon". J. Wild, *Existence and the World of Freedom*, p. 54.

[৬৯] *Religion of Man*, Appendix II, p. 222.

বস্তুত দৃষ্টিভঙ্গীর এই পার্থক্য এতই মৌলিক যে এর কোনটি সত্য এ স্বনির্ভর সিদ্ধান্তের বিষয়, প্রমাণসাপেক্ষ বিচারের বিষয় নয়। যাই হোক, বিজ্ঞানের এই মৌলিক ধারণা তাকে যে পদ্ধতির পথে নিয়ে গেল তা সত্যের সামঞ্জস্যময়তা থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করল। এ কথা বোঝার সুবিধার জন্য তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিচার করা যাক। এই পদ্ধতি সম্বন্ধেও বিজ্ঞান-দর্শনে দুটি মত আছে। একটি "প্রাচীন মত" ও অপরটি "নব্য মত"। অবশ্য এই দুই দলই প্রত্যক্ষ ও বুদ্ধিজাত বিচারকে একমাত্র প্রমাণ বলে মানেন। প্রমাণাংশে এঁদের মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য মৌলিক বিরোধ নেই, পার্থক্য মাত্র "বিধিবাক্য" (law-statements) ও "প্রত্যক্ষ-বাক্য"গুলির সজ্জাক্রমে। প্রাচীন মতানুসারে বিজ্ঞানের কাজ হল খণ্ড খণ্ড আংশিক অভিজ্ঞতাগুলি সঞ্চয় করে তার সহায়তায় একটি (কার্য-কারণ বিধি হলেই উৎকৃষ্ট) সামান্য বাক্য বা বিধিবাক্যে (generalization or law) উপস্থিত হওয়া। এই সামান্যীকরণ পদ্ধতিকেই বলা হয় "আরোহ-পদ্ধতি" (inductive method)। এই বিধিবাক্য সত্য বলে প্রমাণিত করা বা সিদ্ধ করার সরল পদ্ধতি হল "নবতর অভিজ্ঞতায় ক্রমাগত যাচাই করা"। এই পদ্ধতি অনুসারে প্রথম সোপান প্রত্যক্ষ-বাক্যগুলি। এই মতের প্রবক্তা অনেকেই, বিশেষ করে প্রখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল। নব্য মতানুসারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম সোপান প্রকল্প (hypothesis) নির্মাণ। কোনও ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথমেই একটি প্রকল্প করা হয়। সেই প্রকল্পানুসারে নবতর অভিজ্ঞতা অনুমান করা হয় সাধারণ ন্যায়ানুসারে (deductive); অতঃপর লব্ধ অভিজ্ঞতায় যাচাই করা হয় অনুমিত অভিজ্ঞতা (verification); এই পদ্ধতিটির নাম 'হাইপোথেটিকো-ডিডাক্‌টিভ্ মেথড্' (hypothetico-deductive method)। সিদ্ধ হলে এই প্রকল্পই হয় "বিধিবাক্য" (law)। এই মতের বিখ্যাততম প্রবক্তা হলেন কার্ল পপার (Karl Popper))। এই দুই মতের বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রার সুরুতে তফাৎ থাকলেও মূল ভিত্তি বিষয়ে উভয়েই একমত। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল ভিত্তি বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা নিচয়ের বর্ণনা নয়—"বিধিবাক্য" (law) স্থাপন। কিন্তু এ জাতীয় "বিধিবাক্য" যদি ব্যক্তি-নিরপেক্ষ না হয় তাহলে অভিজ্ঞতা বাক্য তা থেকে অনুমান করা যাবে না। যেমন বলা হল "লবণ জলে দ্রবীভূত হয়"। এটি একটি বিধিবাক্য। এ থেকে সাধারণ ন্যায়ানুগ অনুমান সিদ্ধ হবে যদি বলি: "ক" যদি লবণ হয় তাহলে 'ক' জলে দ্রবীভূত হবে।" এই অনুমিত প্রত্যক্ষবাক্যটি ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু যদি বলি (যেখানে "ক" এক টুকরা লবণ, "খ" ব্যক্তি, "গ" আর এক ব্যক্তি) " 'খ'-এর 'ক' 'গ'-এর বাড়ীর জলে দ্রবীভূত হবে"। তাহলে, এ বাক্যটি যদি সত্যও হয় তথাপি বিধিবাক্য থেকে ন্যায়ানুসারে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ঐ 'ব্যক্তি-সূচক উপাধিগুলি' বাক্যের অর্থ যে ভাবে পরিবর্তিত করছে তাতে বিধিবাক্যে যেটুকু ভাষিত বা অভিপ্রেত তা অতিক্রম করছে। ফলে ন্যায়াভাস হবে। এ ক্ষেত্রে এটিকে গৌরব-দোষ দুষ্টও বলা যাবে। মোট কথা, "ব্যক্তি-সূচক" উপাধি থেকে বিমুক্ত

হয়েই বিধিবাক্য সামান্য বাক্য— সেই বাক্য থেকে এই দ্বিতীয় প্রকার অভিনব বাক্য অনুমিত হয় না। মোটকথা, "লবণ" আমার বা তোমার, "জল" তার বা অন্য কারও, এ বিশ্লেষণ মাত্র অপ্রয়োজনীয়ই নয় ভ্রমাত্মকও বটে। কিন্তু সমস্যা হল এই বিচ্ছেদ কৃত্রিম হওয়ার ফলে 'দৈনন্দিন অভিজ্ঞতালব্ধ বিশেষ বাক্য' আর 'বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ বাক্য'—এ দুইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ কাটল না। ফলে দার্শনিকরা প্রশ্ন তুললেন, বিধি-নিঃসৃত যে প্রত্যক্ষ বাক্য ও ব্যক্তির অভিজ্ঞতায় বা প্রত্যক্ষে লব্ধ যে বাক্য এ দুই পৃথক, হয়ত সদৃশ, কিন্তু অভিন্ন কখনই নয়। প্রাথমিক যে বিচ্ছেদ কাটিয়ে বিজ্ঞান তার পদ্ধতি নির্মাণ করল সেই 'বিচ্ছেদই' আবার তার সত্য নির্ধারণের বা যাচাই করার (verification) উপায়টিকে সংশয়াচ্ছন্ন করে তুলল। দ্বিতীয়ত, এই বিধিবাক্যগুলি এতই বিমূর্ত (abstract) ও পরোক্ষ যে এই জাতীয় বাক্যের সঙ্গে মূর্ত (concrete) প্রত্যক্ষ-বাক্যগুলির ন্যায়সঙ্গত যোগ,—কি অর্থের দিক থেকে, কি সত্য-নির্ণয়ের দিক থেকে—রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। বিজ্ঞান-দর্শনের এই সমস্যা আজও তুমুল বিতণ্ডার বিষয়। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-কল্প বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। যাইহোক, এটি একটি বৃহৎ সমস্যা, ফলে বিস্তৃততর আলোচনা এখানে সম্ভব নয় এবং নিষ্প্রয়োজনও বটে। আমাদের প্রয়োজন এটুকুই দেখান যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সত্যকে বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে বিজ্ঞান স্বীয় ক্ষেত্রে নবতর বিরোধ সৃষ্টি করল। ফলে প্রতিশ্রুত নিশ্চয়াত্মক একতম বিশ্বসত্য লাভের সম্ভাবনা হল কিঞ্চিৎ দূরায়ত। রবীন্দ্রনাথ বলবেন এটাই স্বাভাবিক, কেননা পূর্ণ যে সত্য তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিজ্ঞান তথ্য সঞ্চয়ে লিপ্ত; আর তাই এই বিরোধ। যা সামঞ্জস্যময় (অর্থাৎ সত্তা বা সত্য) তাকে সামঞ্জস্যহীন করে মানতে গেলে সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। তথ্যের জড় বেড়ে ওঠে, বুদ্ধি দিয়েও কোনও সমাধান হয় না। এছাড়া আরও একটি দার্শনিক সমস্যা আসে এই বিচ্ছেদের ফলে। আমার প্রত্যক্ষ আর তোমার প্রত্যক্ষ (যদিও একই বিষয়ের) তো ভিন্নাশ্রয়ী। কি করে জানা যাবে তারা অভিন্ন, অন্তত সদৃশ। এ সমস্যা আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে 'privacy of experience' নামে খ্যাত। ফলে বিধিবাক্যে যে সম্ভব প্রত্যক্ষগুলির ঐক্য গৃহীত হল তা প্রামাণ্য নয়— কিছুটা ফাঁকি। রবীন্দ্রদর্শনে এ সমস্যার উত্তরণ খুবই সহজ। সত্য যে সামঞ্জস্য-ময়, ফলে তার অভিজ্ঞতাও সামঞ্জস্যময়—তোমার আমার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ধরা না গেলেও উপলব্ধি করা যায় আমাদের সামঞ্জস্য বিশ্বমানবের পটভূমিতে। তৃতীয়ত, বুদ্ধি বা ন্যায়ানুগ বিচার (reason) দুই বিরোধী বাক্যের সামঞ্জস্য করতে নারাজ। বুদ্ধিজগতে হয় একটি সত্য, নয় অপরটি সত্য। এ দুইয়ের সংমিশ্রণ সম্ভব নয় (law of excluded middle)। এই সত্য-মিথ্যার দ্বৈতন্যায়ে সত্য উদ্ভাসিত হয় না, এটা রবীন্দ্রদর্শনের সিদ্ধান্ত। কিন্তু যেখানে সামঞ্জস্যই সত্য সেখানে এদের মিলিয়ে নিলে তবেই প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করা যাবে। বলা বাহুল্য এই সমন্বয় বুদ্ধিতে

হয় না, এর জন্য প্রয়োজন প্রজ্ঞা বা বোধি (intuition)। সত্য তাই রবীন্দ্রনাথের মতে বুদ্ধি-অলভ্য, বোধিতে ভাস্বর। বিজ্ঞান-আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মত নিম্ন উদ্ধৃতিতে পরিষ্কার হবে—"আমি বলি, ওই তো হল সৃষ্টিতত্ত্ব। সৃষ্টি তো কলের সৃষ্টি নয়, সে যে মনের সৃষ্টি। মনকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা, আর রামকে বাদ দিয়ে রামায়ণ গান একই কথা"। কিন্তু বিভিন্ন মনও তাহলে ভিন্ন সৃষ্টি করবে তার উপায়? রবীন্দ্রনাথের মতে এ অনাসৃষ্টি হয় না তার কারণ হচ্ছে, আমার এক টুকরো মন যদি বস্তুত কেবল আমারই হত তাহলে মনের সঙ্গে মনের কোনো যোগই থাকত না।.... সকল মনের ভিতর দিয়েই একটা ঐক্য-তত্ত্ব আছে"।[৭০] বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সাধারণ অভিজ্ঞতা যেখানে বিরোধ উপস্থিত করে (যেমন জড়ের চাঞ্চল্য, রামধনুর রঙ, পৃথিবীর ঘোরা ইত্যাদি) সেখানে এই দুই মিলিয়ে প্রকৃত সত্য—একটিকে বর্জন করে নয়। বর্জন করে বলেই বিজ্ঞান তথ্যাচারী, আর সমন্বয় সাধনে দর্শন সত্যদ্রষ্টা। "আমরা যখন সমস্ত তারাকে পরস্পর সম্বন্ধযোগে মিলিয়ে দেখছি তখন দেখছি তারা অবিচলিত স্থির।... জ্যোতির্বিদ্যা যখন এই সম্বন্ধসূত্রকে বিচ্ছিন্ন করে কোনো তারাকে দেখে তখন দেখতে পায় সে চলছে...। তখন মুশকিল এই, বিশ্বাস করি কাকে?..." আমার কথাটা এই যে কোনটাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আমাদের যে দুইই চাই। তথ্য না হলেও আমাদের কাজকর্ম বন্ধ, সত্য না হলেও আমাদের পরিত্রাণ নেই। নিকট এবং দূর এই দুই নিয়েই আমাদের যত কিছু কারবার।... দূর এবং নিকট এরা দুইজনে দুই বিভিন্ন তথ্যের মালিক কিন্তু এরা দুজনেই কি এক "সত্যের অধীন" নয়?

সেইজন্য উপনিষৎ বলেছেন:

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদন্তিকে"।

উপরের সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়ায় রবীন্দ্রনাথের ভাষায়[৭১] রবীন্দ্রদর্শনে বিজ্ঞান ও দর্শনের বা তথ্য ও সত্যের সম্পর্ক স্পষ্ট হল। যে মূল দার্শনিক প্রতীতি (অর্থাৎ "সামঞ্জস্য") রবীন্দ্রদর্শনকে পূর্ণ তাত্ত্বিক আকৃতি দিল সেই প্রতীতির যে ন্যায়সঙ্গত মনোভাব বিজ্ঞানের প্রতি হওয়া উচিত, রবীন্দ্রনাথও সেই সঙ্গতিই প্রকাশ করলেন উপরি-উক্ত উদ্ধৃতিতে। বিজ্ঞান কি অর্থে এবং কি ভাবে তথ্যান্বেষী এটি দেখানই এ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য এবং আশা করি এ আলোচনায় সেটুকু যথাযথ স্পষ্ট হয়েছে।

বিজ্ঞানের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবিসম্বাদী মত বোধহয় হবে যে সকল অভিজ্ঞতার সংখ্যাগত পরিমাপ সম্ভব নয়। তা করতে হ'লে কৃত্রিম বিচ্ছেদ আনতেই হবে এবং সত্য, সিদ্ধান্ত তার থেকে বহুদূরে অবস্থান করতে বাধ্য। আজকের সমাজ-বিজ্ঞানীরা প্রতিদিন এ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। বেশীর ভাগ অনুভবই তুলনামূলক, আপেক্ষিক, ব্যক্তি-সাপেক্ষ। তাকে সংখ্যা চিহ্নিত করে চরম প্রকাশ দেওয়া অবৈধ। সংখ্যা

৭০ "আমার জগৎ", "সঞ্চয়", রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৫৬৩।
৭১ ঐ রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৫৬০—৬১।

দিয়ে সমতা রক্ষা হলেও সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। এই খণ্ডিত দৃষ্টি থেকে যে তথ্য লাভ হয় তাকে বৃহত্তর ঐক্যে গ্রথিত না করে সত্য দর্শন হয় না। বিজ্ঞান নিজেও আজ *এই ঐক্যের প্রয়োজন উপলব্ধি করছে। যদিও সে ঐক্য এখনও ব্যক্তি-নিরপেক্ষ* বিষয়ের ঐক্য। বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান ক্রমশ আপন জটিলতায় জড়িয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এই বিভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের প্রচেষ্টা তাই বিজ্ঞান-দর্শনে মাঝে মাঝে জেগে উঠছে। পূর্ব-উল্লিখিত দার্শনিক নয়রাথ ও তাঁর দলবল এই আন্দোলনের নাম দিয়েছিলেন 'বিজ্ঞানের একীকরণ' বা 'unification of sciences'। এই একীকরণের ঝোঁকটি, রবীন্দ্রনাথ বললেন, আরও ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী করলেই সত্যোপলব্ধি সম্ভব হবে। অল্পকথায় এ অনুচ্ছেদের বক্তব্য প্রকাশ করতে হলে বলতে হয়: রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানকে 'উড়িয়ে' দিচ্ছেন না, বা অস্বীকার করছেন না, কেবল এইটুকুই বলতে চাইছেন যে বিজ্ঞান একদেশদর্শী বিভেদকারী তাই অসম্পূর্ণ, কেননা সত্য ঐক্যবদ্ধ, সামঞ্জস্যময়। বিজ্ঞানকে 'আমি আছি'র মৌল অস্তি-ত্বতার সামঞ্জস্যে স্বীকার করা যায় না, বিজ্ঞানের জানার পদ্ধতিতেই গলদ। এই পদ্ধতি দ্বারা তথ্যই শুধু আয়ত্ত, সত্য হয় দূরায়িত। এখন প্রশ্ন থাকে—বুদ্ধি ও প্রত্যক্ষ যদি প্রকৃত জ্ঞানে প্রমাণ না হয় তাহলে এই পরম সত্তা-স্বরূপ সামঞ্জস্য প্রতিভাত হবে কোন পথে?

এ প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্ররচনায় সর্বত্রই বহুভাষিত। তাঁর কাছে 'জানা'য় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পার্থক্য লুপ্ত—এ এক ধরনের 'হওয়া'। এবং এই জ্ঞানেই মূল্যাদর্শের প্রকৃত পরিগ্রহ সম্ভব। বিজ্ঞান মূল্য ও আদর্শের জগৎ থেকে সত্তাকে বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে সত্য-দৃষ্টি হারাল—তথ্যবোঝায় হল ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু উপলব্ধি আর 'তন্ময়তার' পথে সামঞ্জস্য স্বতঃই প্রকাশিত—'আমি-ছাড়া বিশ্বে' নয় 'আমি-আছি'-র বিশ্বে।

বিশ্বসত্তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে প্রথমেই যদি সামঞ্জস্যকে সত্তা-স্বরূপ মানা হয় তাহলে অবশিষ্টটুকু সঙ্গতির তাগিদেই সন্নিবদ্ধ। বিশ্বসত্তাকে 'আমি আছি'-র প্রাঙ্গণে আনতে রবীন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক নজির দেখাবার চেষ্টাও করলেন। রবীন্দ্রদর্শনে এটাই বোধ হয় সবচেয়ে দুর্বলতম দিক। এ বিশ্ব নিঃসন্দেহে মানব বিশ্ব। কিন্তু এই মানব-স্তরে পেঁৗছবার উদ্দেশ্যে বিশ্ব এক অর্থময় বিবর্তনের পথে এগিয়ে গেল। বিবর্তন কোন কার্যকারণ তাগিদে হয়নি। হয়েছে উদ্দেশ্যলাভের সত্যোপলব্ধির স্বতঃস্ফূর্ত তাগাদায়। অর্থাৎ বিবর্তন বস্তুত অগ্রগতি বা প্রগতি—কেন না তার অর্থময়তা তার উদ্দেশ্য, মানব চৈতন্যের বিকাশ। *Religion of Man* গ্রন্থে প্রথম পরিচ্ছেদেই এই বিবর্তনের এক উদ্দেশ্যতান্ত্রিক ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। এখানেও সেই সামঞ্জস্যময়তা সার্থকতা প্রকাশ করছে বিবর্তনশীল বিশ্বের। আদর্শ তো লক্ষ্যহীন বিবর্তন নয়—তথ্য সেই অন্তিম সত্য-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় প্রাকৃতিক জড়তা অস্বীকার করেও লক্ষ্যের প্রতি ধাবমান।

"It (evolution) was made conscious not of the volume but

of the value of existence, which it even tried to enhance and maintain in many-branched paths of creation, overcoming the obstructive inertia of nature by object obeying Nature's law .... The process of evolution, which after ages has reached man, must be realized in its unity with him, though in him it assumes a new volume and proceeds to a different path. It is a continuous process that finds its meaning in Man."[৭২]

উপরি-উক্ত কটি পংক্তি থেকে বিশ্ব-বিবর্তন সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যাবে। বিবর্তন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিশেষ অভিনব কিছু নয়। মূল কথা হল যে বিবর্তন অর্থময়ভাবে ভাবতে গেলে সামঞ্জস্য বা ঐক্যাভিপ্রায়কেই লক্ষ্য হিসাবে সামনে রাখা দরকার। তা করলে তবেই ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম তার প্রকৃত সত্য উন্মাটন করবে। এই বিবর্তন-বিবেক অবশ্য রবীন্দ্রদর্শনে খুব মূল্যবান কোনও স্থান অধিকার করে নেই। ফলে উপরি-উক্ত এই কটি কথা জানাই দার্শনিক প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করবে। বিশেষত যে দর্শনে সত্য অসীম, অমৃতময় সে চিন্তাধারায় তথাকথিত ঐতি-হাসিক ও প্রাকৃতিক-বিবর্তন-বর্ণন বক্তব্যকে অধিকতর সুবোধ্য করে না।

অধিকতর মূল্যবান প্রশ্ন হল, যদি মানি বিজ্ঞান প্রকৃত সত্য জানায় না, তাহলে কি পদ্ধতিতে এই যে মূল দার্শনিক প্রত্যয় যাকে রবীন্দ্রনাথ 'সামঞ্জস্য' বলছেন তা আয়ত্ত বা অধিগত হবে? প্রত্যক্ষ ও বুদ্ধি এ দুটিই তো বিজ্ঞান তার পদ্ধতিতে ব্যবহার করে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেখানে সত্য অনায়ত্ত। এই সত্য-চেতনা তাহলে অবশ্যই প্রত্যক্ষ বা/এবং বুদ্ধি দ্বারা আয়ত্ত হবে না। তাহলে কোন্ পদ্ধতিতে আমরা সত্যকে উপলব্ধি করব? এর উত্তর দিতে গেলে রবীন্দ্রদর্শনের প্রমাণ-তত্ত্ব (epistemology) আলোচনা করতে হবে।

৭২ *Religion of Man*, pp. 14, 15.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বুদ্ধি ও বোধ

ভারতীয় দর্শনের এক বিরাট বৈশিষ্ট্য হল যে এ ঐতিহ্যে কোনও সত্যই অভিজ্ঞতা বা অনুভবকে বাদ দিয়ে গ্রাহ্য হয় নি। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে কিন্তু এমন নয়; সেখানে প্রমাণ-প্রাধান্যে দুই বিরোধী ধারা যুগপৎ প্রশ্রয় পেয়েছে। এই কারণে দুই বিভিন্ন পদ্ধতির নামকরণ হয়েছে যথাক্রমে: (১) অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism) ও (২) বুদ্ধিবাদ (rationalism)। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রামাণ্য-নির্ধারণের এমন কোনও সমস্যা ছিল না; সমস্যাটুকু সীমাবদ্ধ ছিল অভিজ্ঞতাবাদেরই প্রকারভেদে।

সাধারণত, যে কোনও জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: (১) অপরোক্ষ (২) পরোক্ষ। সমভাবে এই জ্ঞানলাভের পদ্ধতি বা প্রমাণকেও দুই ভাগে ভাগ করা যায়, অর্থাৎ—অপরোক্ষ ও পরোক্ষ। পরোক্ষজ্ঞানকেই বুদ্ধি-জন্য জ্ঞানের উৎকর্ষ বলে মানা হয়। ভারতবর্ষে এই পরোক্ষ জ্ঞান নানাভাবে বিভক্ত—অনুমান, উপমান, অর্থাপত্তি ইত্যাদি। এদের মধ্যে অনুমানকেই ধরা যেতে পারে, পরোক্ষ জ্ঞানের প্রতিভূ। অপরোক্ষ জ্ঞানও আবার দুই ভাগে বিভক্ত—(১) ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ ও (২) উপলব্ধি বা অনুভব, বা সাক্ষাৎকার। রবীন্দ্রনাথ শেষোক্ত জ্ঞানকে "বোধি" বা "বোধ"ও বলেছেন। এই কটি ভাগের মধ্যে রবীন্দ্রদর্শনে প্রমাণস্বরূপ এমনই যে তাতে 'বোধি' বা 'অনুভব' ব্যতীত আর কোনটিকেই প্রমাণ হিসাবে মানা সম্ভব নয়। ভারতীয় ঐতিহ্যের যোগ্যতম ভাব-শিষ্য রবীন্দ্রনাথ পরা-সত্যকে কখনই অন্তে বুদ্ধি-গ্রাহ্য মনে করেন নি। অবশ্য সত্য সম্বন্ধে যে সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন তাতে ন্যায়ত, সত্য-জ্ঞানে বুদ্ধি অপ্রযোজ্য। যাই হোক রবীন্দ্রদর্শনের প্রমাণ-বৈশিষ্ট্য আলোচনার পূর্বে কিছুটা সাধারণভাবে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানের আলোচনা বাঞ্ছনীয়। পরোক্ষ জ্ঞানের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল অনুমান। কিন্তু অনুমান যে প্রকারেই হোক তা অন্তে একটি বিশিষ্ট অপরোক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান ছাড়া থাকতে পারে, কিন্তু বিপরীতটি সত্য নয়। পাশ্চাত্ত্যে অনেক দার্শনিক অবশ্য বুদ্ধিকে চূড়ান্ত প্রমাণ বলে মেনেছেন; কিন্তু সেটি মানতে গিয়ে বুদ্ধি-রাজ্যেই একটি অপরোক্ষ বৃত্তি মানতে বাধ্য হয়েছেন (intellectual intuition)। এই অসামঞ্জস্যের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় যদি আমরা প্রথমেই স্বীকার করি যে অভিজ্ঞতা-লভ্য (যদি মনে করা হয় যে সত্য-নিরূপণের চূড়ান্ত উপায় তাকে স্বীয় চৈতন্যে লাভ করা) সত্য অপরোক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল ত বটেই, এমন কি সত্তা-রূপ যে কোনও প্রকার সত্যই, অন্তে অপরোক্ষ-জ্ঞান নির্ভর। এ কথায় অনেকে দার্শনিক আপত্তি তুলতে পারেন, আর সেই কারণেই আমরা প্রাথমিক ভাবে বুদ্ধি ও বোধের সম্পর্কে কিছু সাধারণ আলোচনা করে নিতে চাই।

একটি সরল ও বহু-উল্লিখিত অনুমান বিচার করা যাক: "দূরের পর্বতটি বহ্নিমান" (যেখানে বহ্নি অদৃষ্ট, ধূম দৃষ্ট)। এটি একটি সিদ্ধ অনুমান হতে গেলে চাই (১) বহ্নি ও ধূমের ব্যাপ্তিজ্ঞান, (২) পর্বতে ধূম-দর্শন। এছাড়া আরও যা নৈয়ায়িক জটিলতা তাতে প্রবেশ করব না, কেননা সে সব কিছু আমাদের প্রয়োজনীয় নয়। দূরের পর্বতটিতে "ধূম" প্রত্যক্ষ হল, অনুমান করলাম ওটি "বহ্নিমান"। এই অনুমানের জন্য ধূম ও বহ্নির নিয়ত সংযোগ পূর্বে প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক। দ্বিতীয়ত, পর্বতে "ধূম" বা "লিঙ্গ" প্রত্যক্ষ না হলে কোনও সার্থক অনুমান করা যেত না। অতএব পরোক্ষ জ্ঞানের প্রতিভূ যে অনুমান তা বেশ কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট ও সামান্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান-নির্ভর। এক্ষেত্রে আপত্তি উঠতে পারে যে যদিও আরোহী অনুমানে (induction) এ তত্ত্ব অনস্বীকার্য, অবরোহানুমানে (deduction) এ কথা স্বীকার্য নয়। পাশ্চাত্য দর্শনে মূলত, অবরোহানুমানকেই বুদ্ধি-গ্রাহ্য অনুমানের অন্যতম রূপ বলে মানা হয়েছে এবং এখনও হয়। অবরোহানুমানের উদাহরণ হল:

সকল মানুষ মরণশীল।
রাম মানুষ।
____
রাম মরণশীল।

উপরের দৃষ্টান্তটিতে স্বতঃই মনে হয় যে প্রথম দুটি বাক্য (একটি সামান্য, একটি বিশেষ), যাদের বলা হয় premise, নিঃসন্দেহে অপরোক্ষ জ্ঞান-নির্ভর। অর্থাৎ "মানুষ মরণশীল" ও "রাম মানুষ" এর কোনটিই ত বুদ্ধিলভ্য নয় বা স্বতঃসিদ্ধ নয়, অতএব অপরোক্ষ জ্ঞান-নির্ভর। অবশ্য একথা সত্য যে প্রথম দুটি সিদ্ধ হলে "নিগমন" বা "সিদ্ধান্ত-বাক্যটি" অবশ্য সিদ্ধ। অর্থাৎ সিদ্ধান্তটির সাধন করার জন্য কোনও নবতর অনুভব অনাবশ্যক। যদি উপরের দৃষ্টান্তটিকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করে নিম্নোক্ত রূপ দিই; যেমন:

যদি মানুষ মরণশীল হয়,
(আর) যদি রাম মানুষ হয়,
____
(তাহলে) রাম মরণশীল।

তাহলে অবশ্য সমগ্র অনুমানটিকেই অপরোক্ষ জ্ঞান-মুক্ত বলার কোন আপত্তি থাকে না। কিন্তু এ অনুমান দ্বারা কোনও সত্তা-সূচক সত্য প্রতিপন্ন হল না। অর্থাৎ এই রূপে এ অনুমানটি কি রাম, কি মানুষ এদের অস্তিত্ব নিষ্পন্ন করল না। একটি সত্তা-নিরপেক্ষ সম্বন্ধ-সত্য এর দ্বারা গৃহীত হল এবং সে গ্রহণ অবশ্যই কেবল বুদ্ধি-গ্রাহ্য। ফলে যে দর্শনে সত্য সত্তা-স্বরূপ, সে দর্শনে এ জাতীয় ন্যায়-রূপ একেবারেই অচল। এই কারণে রবীন্দ্রদর্শনে এ জাতীয় প্রমাণ স্বতই হবে অগ্রাহ্য, হয়ত অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু একথা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না যে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে বহু ন্যায়বিদ এই পরিবর্তিত অনুমানটিকেও সম্পূর্ণভাবে পরোক্ষ-জ্ঞান-নিরপেক্ষ বলতে

রাজী নন। তাঁদের মতে সমগ্র অনুমানটির অন্তর্গত যে ন্যায়-রূপের পর্যায় বা ক্রম, সেটি অনুভব (intuition) সাপেক্ষ। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা-বাক্য থেকে নিগমন-বাক্যে যে বাধ্যতামূলক অনুসৃতি ('entailment') তা পুনরায় বুদ্ধি-সিদ্ধ হতে পারে না, হলে চক্রক দোষ (vicious circle) অনিবার্য হয়ে পড়ে। অর্থাৎ যে কোনও অবরোহানুমানে তার সমগ্র রূপটি বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে, এক জাতীয় অপরোক্ষ অনুভূতিতে। বস্তুত, বুদ্ধি মূলত বিশ্লেষণ-পন্থী। যখনই জ্ঞানে সমন্বয় হয়, তখন বুদ্ধি ব্যতীত অনুভবের আবশ্যকতা মানতেই হয়। ফলে যে দর্শনে সত্য সমন্বয়ধর্মী বা সামঞ্জস্য-ময়তা, সে দর্শনে "বুদ্ধি" যে প্রমাণ হতে পারে না একথা বলাই বাহুল্য। এই একই কারণে যে সব দার্শনিকের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব সমধর্মী তাঁরা সকলেই হলেন বুদ্ধি-বিরোধী (anti-intellectual)। যেমন, বের্গসঁ, সত্তাবাদী দার্শনিকরা ইত্যাদি আরও অনেকে। দ্বিতীয়ত, বুদ্ধি যেহেতু বিশ্লেষণ-পন্থী, বুদ্ধি যেহেতু বিচার-মূলক, সেইহেতু বিষয়ে অবগাহন করান তার পক্ষে সম্ভব নয়। বিষয়কে জ্ঞাতা থেকে বিচ্ছিন্ন না করে সে জানতে পারে না। বিশ্লেষণ করতে হলে বিচ্ছিন্ন ত করতেই হবে। বুদ্ধি তাই তথ্যজ্ঞাপক —বিজ্ঞানের বাহন। বুদ্ধি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য দ্বিধাহীন ভাষায় ব্যক্ত:

> "It never occurred to him that perhaps Reason is an acrobat in the circus of mind, that its profession is to turn everything upside down."[৭৩]

রবীন্দ্রদর্শনে তাহলে প্রমাণ একমাত্র অপরোক্ষ জ্ঞান। অপরোক্ষ জ্ঞান পূর্বেই বলা হয়েছে দু প্রকার: (১) প্রত্যক্ষ ও (২) অনুভব বা বোধি। এখন প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞা-নির্দিষ্ট সত্য কি প্রত্যক্ষের বিষয়? ভারতীয় দর্শনে প্রত্যক্ষ দুই প্রকার: (ক) লৌকিক, ও (খ) অলৌকিক। এর কোনটিই কি রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রমাণ বলে স্বীকৃত হতে পারে? অবশ্যই নয়। কেন নয় তার বিচার করা যাক।

ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষে বা লৌকিক প্রত্যক্ষে বিষয়, জগৎ সীমাবদ্ধ। এ সীমা দেশ ও কালের ত বটেই, জ্ঞাতার ইন্দ্রিয় শক্তি সমূহেরও সীমা। চোখ দিয়ে কিছু দেখা, কান দিয়ে কিছু শোনা, এত নিঃসন্দেহে দেশ ও কাল বিচ্ছিন্ন; তদুপরি ইন্দ্রিয়গুলির শক্তিও সীমাবদ্ধ। দেশ ও কালকে যতই না বিস্তৃত করি নানা যন্ত্র ব্যবহার করে, পরিধি তবুও সীমিত। ফলে যে সত্য অসীম, যে সত্য দেশ-কাল অতিক্রান্ত তাকে যে এ জাতীয় লৌকিক প্রত্যক্ষে পাওয়া যাবে না এ স্বতঃসিদ্ধ। দ্বিতীয়ত, চিত্ত যতই কেন না প্রমাতাকে বিষয়-বৃত্তি-গ্রাহী করুক, বিষয় বা অর্থ ও ইন্দ্রিয় স্বতন্ত্রই থাকে। "ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ" যেখানে প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা, বিষয়-বিষয়ীর অভেদ গ্রহণ, সে প্রমাণে অসম্ভব। সন্নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয় ও অর্থ অবশ্যই ইন্দ্রিয় ও অর্থের অভেদ নয়। এই "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ" যেখানে অলৌকিক সেই প্রত্যক্ষের নাম "অলৌকিক প্রত্যক্ষ"। সে ক্ষেত্রে বিষয়-বিষয়ীর ভেদ

[৭৩] *Man*, Andhra University Series, No. 16, (Waltair, 1937) p. 11.

সম্বন্ধে যে আপত্তি লৌকিক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য অলৌকিক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও সে আপত্তিগুলি প্রযোজ্য। অলৌকিক প্রত্যক্ষ নব্যন্যায়ে তিন প্রকারের মানা হয় ("সামান্য লক্ষণ", "জ্ঞান-লক্ষণ" ও "যোগজ")। তার মধ্যে একমাত্র "যোগজ" প্রত্যক্ষই কিছুটা তবু বোধির সদৃশ—কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নয়। একথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রদর্শনে মূল সত্য বাক্যটি হল "আমি আছি"। আর এই চেতনা কদাপি প্রত্যক্ষ লব্ধ হতে পারে না। এখানে বিষয়-বিষয়ী ভেদারোপ অসঙ্গত। এ জাতীয় চেতনার স্বরূপ একমাত্র "অনুভব", "বোধি", "উদ্ভাস", "আত্মোপলব্ধি" এ জাতীয় প্রমাণেই ব্যাখ্যাত হতে পারে। উপরে যা বলা হল তা থেকে আশা করি প্রতিপন্ন হয়েছে যে রবীন্দ্রদর্শনে সত্য যেহেতু "সামঞ্জস্য" সেই হেতু "বোধি"-ই একমাত্র প্রমাণ-হিসাবে গ্রাহ্য। রবীন্দ্রদর্শনে এই "বোধির" স্বরূপ ও সংগঠন বিচারই হবে অতঃপর আমাদের আলোচনার বিষয়। এই বিষয়ের বিশদ বর্ণনা করতে হলে "আমি আছি" এই সত্যটির জ্ঞান-রূপ আলোচনা অপরিহার্য।

সাধারণভাবে ভাবতে গেলেও "পুস্তকটি আছে" ও "আমি আছি" এ দুটি ভিন্নাত্মক প্রমাণ-লব্ধ বাক্য। প্রথম বাক্যটি প্রত্যক্ষেই লব্ধ। কিন্তু "আমি আছি" এটি প্রত্যক্ষ লব্ধ নয়। প্রত্যক্ষে যে ইন্দ্রিয় সংযোগ প্রয়োজন, দ্বিতীয় বাক্যটির জন্য তা অপ্রয়োজনীয়। অন্তরেন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ মনের) ব্যবহার হয়ত হলেও হতে পারে, সার্থক বাক্য-সংগঠন বা প্রয়োজনীয় মনঃসংযোগের জন্য। কিন্তু চিন্তা করে "আমি আছি" এ সত্যটি লাভ করতে হয় না। এ যেন নিয়ত সত্য বা আমার চেতনায় উদ্ভাসিত। আমি যা করি, এমন কি কিছু যদি নাও করি, তাতেই সদা প্রকাশমান এই স্বীয় সত্তা-জ্ঞান। যদি ভেবে পেতে হত বা প্রত্যক্ষের বিষয় হত তাহলে এমন নিয়ত প্রতিভাত হত না। যদি কোন ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করি—"তুমি কি আছ"? তাহলে বিশিষ্ট ব্যক্তি উত্তরে বলেন না,—"একটু ভেবে দেখি"। উপরন্তু দার্শনিকের এই অহেতুক উন্মাদ-সদৃশ ব্যবহারের জন্য বিরক্তই হবেন। কেননা এটা জিজ্ঞাসার বিষয়ই নয়। "অবশ্যই আছি"—এটাই হল উত্তর। এই আবশ্যিকতা আসে চৈতন্যে এই সত্যটির নিয়ত প্রকাশমানতা থেকে। বস্তুত "আমি আছি" এটি প্রমাতা-স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন কোনও বিশেষ জ্ঞানের বিষয় নয়, পরন্তু সর্বজ্ঞানের আদি-চৈতন্য স্বরূপ। অর্থাৎ "আমি আছি" এই বাক্যটি "আমি" ও "আছি" এই দুই উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের সম্পর্ক-নির্ধারিত কোনও তথ্যপ্রদ বাক্য নয়, এটি চৈতন্যে সদা স্বীকৃত একটি সমগ্র সত্য। এই জন্যই রবীন্দ্র-দর্শন যথাযথ ভাবেই এই প্রজ্ঞাকে অপরোক্ষ অনুভব বা উপলব্ধির প্রকাশ বলে স্বীকার করল। বস্তুত চৈতন্য সত্তাই এই "আমি আছি" প্রজ্ঞা-স্বরূপ। অর্থাৎ "জানা" এক্ষেত্রে "হওয়া"। আমার থাকাতেই "আমি আছি"-র জ্ঞান। এ জ্ঞান পেতে পৃথক প্রচেষ্টা অর্থহীন। আমার চৈতন্য-স্বরূপ হওয়াটাই এই প্রজ্ঞার প্রকাশ। "We *know* a thing because it belongs to a class ; we *see* a thing because it belongs to itself"[৭৪] এই আত্মজ্ঞানের অপরোক্ষত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

৭৪ *Religion of Man*, p. 138.

"The reality of my own self is immediate and indubitable to me."[৭৫] প্রকৃত সত্য তাই, যা মানব সত্তা-স্বরূপ ("আমি আছি")। একথা *Personality* বইয়েও লিখেছেন— "For the reality of the world belongs to the personality of man and not to reasoning which,useful and great though it be, is not the man himself."[৭৬] মোট কথা, "আমি আছি" যেখানে সত্য-দৃষ্টির প্রথম সোপান সেখানে ভেদ-সৃষ্টিকারী প্রমাণ স্বীকার করা সম্ভব নয়, অর্থাৎ "অনুভব" বা অপরোক্ষ "বোধ"-কেই (রবীন্দ্রনাথ নানা শব্দ ব্যবহার করেছেন; আমরা সুবিধার্থে "অনুভব" শব্দটিই প্রয়োগ করব) প্রাধান্য দিতে হয়। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক দেকার্তের মতেও একমাত্র নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হল "আত্ম-জ্ঞান"। কিন্তু বুদ্ধিবাদী ঐতিহ্যের বাহক হিসাবে এই আত্মজ্ঞানের যে প্রকাশকে তিনি একমাত্র ও সর্ব-প্রাথমিক জ্ঞান করলেন, তা প্রকৃত পক্ষে কিঞ্চিৎ অসার্থক ও অসত্য। তিনি আত্মাকেও দ্রব্য-গুণের সম্পর্কে পেতে চাইলেন। আর এই জন্যই পরবর্তী যুগে তাঁকে বহু সমা-লোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। দেকার্তের আত্ম-জ্ঞানের চূড়ান্ত প্রকাশ মাত্র "আমি আছি" এই প্রকার অনুভব-জন্য একটি সমগ্র প্রজ্ঞা নয়, তা হল সুরুতেই বিভেদাত্মক যথা, "আমি ভাবছি, অতএব আমি আছি" (Cogito ergo sum,—I think, therefore I am)। এ-জাতীয় বাক্য অনুমান না অনুভব (intuition), এ নিয়ে বিস্তর বিতর্ক ত চললই, এছাড়া আধুনিক কালে প্রখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক এয়ার (A. J. Ayer) তাঁর বই *Problems of Knowledge*-এ দেকার্তের বাক্যকে অসার্থক বললেন। এয়ারের মতে এই বাক্যটিতে সার্থক বাক্যের প্রধান ধর্মগুলিই নেই, অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা বা যোগ্যতাহীন এটি একটি পুনরুক্তি। তাঁর মতে "আমি আছি" এটিই যথেষ্ট, বাকি অংশটুকু নিষ্প্রয়োজন। "আমি চিমটি কাটছি, অতএব আমি আছি"—এটাও যতটা যোগ্য, মূল বক্তব্যও ঠিক ততখানি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের "আমি আছি" সম্বন্ধে আমরা আগেই দেখেছি এ সমালোচনাগুলি খাটে না। রবীন্দ্রনাথের এ "আমি" ত দেশ-কাল-অবচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র "অহং" নয়, এ আমি বিশ্বমানব—মানব চরাচরের সামঞ্জস্যময় সত্তা। ফলত, অনুভবে প্রকাশমান সত্য "আমি আছি"-র আমি ত কখনই একটি অহং নয়, সে স্ব-ক্ষেত্রে বিশ্বলোকের সকল সত্তার সামঞ্জস্য-বিধান। যাই হোক, অনুভবরূপ এই যে প্রমাণ, এর অপরাপর বৈশিষ্ট্য আলোচনার প্রয়োজন। "আমি আছি" এ মাত্র একটি নৈর্ব্যক্তিক সত্য জ্ঞাপনই করে না, আমার ব্যক্তিত্বকে আবেগবিহ্বল করে। "টেবিল আছে" বলায় যে ঔদাসীন্য প্রদর্শন সম্ভব, "আমি আছি" বলায় তা সম্ভব নয়। এ প্রজ্ঞা আবেগ-বিরহিত নয়, আবেগময় সত্তা-স্বীকার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন লেখায়, বিশেষ করে সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ক লেখায়, এই আবেগের অস্তিত্ব অনুভবে

৭৫ ঐ পৃ: ১৩০।
৭৬ *Personality*, p. 52.

পুনঃপুনঃ স্বীকার করেছেন। উদ্ধৃতি হয়ত নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু বাহুল্য-বোধ নিয়েও রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক গ্রন্থ, *Religion of Man* থেকে একটি উদ্ধৃতি দিতে বাধ্য হচ্ছি বক্তব্যকে দৃঢ়তর করার জন্য: "Reality, in all its manifestations, reveals itself in the emotional and imaginative background of our mind. We know it, not *because we can think* of it, but because we directly feel it."[৭৭] এ কথাটির দ্বারাও রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞা-স্বরূপ ও দেকার্তের নিশ্চয়াত্মক আত্ম-জ্ঞানের সুস্পষ্ট প্রভেদ গৃহীত হয়। অনুভবে এই আবেগময়তা রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় ঐতিহ্যের নিরাসক্ত আবেগহীন আত্মোপলব্ধি থেকেও পৃথক করে দিচ্ছে। কেননা রবীন্দ্রদর্শনে "আমি আছি"-র উপলব্ধি বিশ্ব বিসর্জন দিয়ে নয়, বিশ্বকে অঙ্গীকৃত করে।

> "The consciousness of the real within me seeks for its own corroboration the touch of the Real outside me .... when our surroundings are monotonous and insignificant, having no emotional reaction upon our mind, we become vague to ourselves."[৭৮]

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে অপরোক্ষ অনুভবকে প্রমাণ মর্যাদা দিলেন তা আবেগ-পরিপৃক্ত। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—কোন প্রকার আবেগ? আবেগ আমাদের ব্যক্তি জীবনে বহুপ্রকার—দুঃখ, ক্রোধ, ভয়, আসক্তি, ঈর্ষা, প্রেম, সুখ, হিংসা ইত্যাদি। এর উত্তর সহজেই মিলবে যখন ভাবব যে, সত্য যে আমি সে স্বতন্ত্র নয়, সে বিশ্বমানব অর্থাৎ সকল বস্তু-ব্যক্তির সামঞ্জস্যময়তা। সত্তাও এটিই। এই ঐক্যবদ্ধ ভাব যে আবেগ আনে তাকেই প্রাধান্য দেব অনুভবে। বলাই বাহুল্য একমাত্র "প্রেমই" এ জাতীয় আবেগ। প্রেমে "আমি-তুমি"র ভেদ হয় লুপ্ত; তোমার মধ্যে আমাকে পাওয়া বা আমার মধ্যে তোমাকে মিলিয়ে দেখা এ প্রেমেই সম্ভব: (১) "তাই বলিতেছি, সত্য প্রেমরূপে আমাদের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেই সত্যের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়—"[৭৯], (২) "Our true comprehension of the spiritual world is through love"[৮০] এই প্রেমেই দেয় প্রকৃষ্ট সহানুভূতি (বোধ হয় ততোধিক সার্থক পদ "সমানুভূতি" বা empathy)। রবীন্দ্রনাথ প্রেম ও সহানুভূতি বিভিন্ন স্থানে এক অর্থেই ব্যবহার করেছেন; আমরাও এই ব্যবহার মেনে নেব। প্রকৃত প্রস্তাবে, প্রেম ভিন্ন সহানুভূতি হয় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

> "The world of our knowledge is enlarged for us through the extension of our information; the world of our personality grows

৭৭ *Religion of Man*, p. 130.
৭৮ ঐ, পৃঃ ১৩১।
৭৯ "ধর্ম", "উৎসব", রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃঃ ৬।
৮০ *Man*, Andhra Lecture, p. 29.

in its area with a large and deeper experience (অনুভব) of our *personal self in our own* universe through sympathy and imagination".[৮১]

এই প্রেমের প্রত্যক্ষ ফলই আনন্দ। এই প্রেম, এই আনন্দের জন্যই জ্ঞান মাত্র জ্ঞান থাকে না, প্রজ্ঞা ও প্রাপ্তির পরিপূর্ণতায় এক অভিনব সত্যে রূপান্তরিত হয়। আগেও বলেছি রবীন্দ্রদর্শনে যে একতম প্রমাণ অনুভব, তার দ্বারা "জানা" বা "পাওয়া" ও "হওয়া" একার্থক হয়ে উঠে। "এই পরিতৃপ্ত হওয়ার দ্বারা যাঁকে জানি তাঁকে বলি: রসো বৈ সঃ।

এই হওয়ার দ্বারা পাওয়ার কথা উপনিষদে বারবার শোনা যায়, তার থেকে এই বুঝি, মানুষের যা চরম পাবার বিষয় তার সঙ্গে মানুষ একাত্মক, মানুষ তারই মধ্যে সত্য"[৮২] এই যে পাওয়ার দ্বারা হওয়া বা হওয়ার দ্বারা পাওয়া, তা প্রেম বা আনন্দাবেগেই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ "মানুষের ধর্ম" গ্রন্থে লিখছেন—"অপূর্ণতাকে ক্ষয় করার দ্বারা পূর্ণের সঙ্গে মিলন বিশুদ্ধ আনন্দময় হবে, এই অভিপ্রায় আছে বিশ্বমানবের মধ্যে। তাঁর—তি প্রেমকে জাগরিত করে তাঁরই প্রেমকে সার্থক করব, যুগে যুগে এই প্রতীক্ষার আহ্বান আসছে আমাদের কাছে।[৮৩] (আরও তুলনীয়, ঐ, পৃঃ, ৬১১)। অনুভবে আনন্দের খুব স্পষ্ট বর্ণনা পাই "শান্তিনিকেতন" গ্রন্থে "আত্মার দৃষ্টি" প্রবন্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে।

আমাদের মূল বক্তব্য ছিল রবীন্দ্রদর্শনে সঙ্গতি-রক্ষাকল্পেই অনুভবকে প্রমাণ মানতে হয়, এবং পুনরায় সঙ্গতিকল্পে সেই অনুভবে প্রেমরূপ আবেগ প্রয়োজন, সামঞ্জস্যকে পেতে হলে বা জানতে হলে। কিন্তু সর্বাঙ্গীণ অনুভবে শুধু (১) প্রমা-প্রমাতা একীকরণ, (২) আবেগ ও প্রেমরূপ আবেগ, এই দুইটি বৈশিষ্ট্য থাকলেই চলবে না; তাতে আরও থাকা চাই, (৩) কল্পনা (imagination) বা সৃজনশীলতা। আমাদের বিচার করতে হবে সামঞ্জস্য সত্তারূপ হলে যদি অনুভবের আবশ্যক হয় ত সে অনুভবে সৃজনশীলতা বা কল্পনার আবশ্যকতা কি?

পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে কল্পনা (imagination) দুই প্রকার মানা হয়—(১) স্মৃতিবহ কল্পনা (memory or reproductive imagination) ও (২) সৃজনশীল কল্পনা (productive imagination)। রবীন্দ্রনাথ যখন অনুভবে কল্পনা মানছেন তখন তিনি এই দ্বিতীয় প্রকার কল্পনার কথাই বলছেন। সাধারণত আমরা কল্পনা বলতে বুঝি মিথ্যা বা অলীক বিষয় রূপকল্পের মানস প্রত্যক্ষ করা। যা নেই তাকে মানসপটে আনাই যেন কল্পনা। যেমন মেঘদূত কাব্যে যক্ষ যখন মেঘকে বার্তাবহ করে পাঠাবার কালে সে মেঘে চৈতন্য আরোপ করলেন, তখন তা হল তাঁর বিরহতপ্ত চিত্তের কল্পনা—তা অবশ্যই সত্য নয়। এমন কি কালিদাস নিজেই এ সম্বন্ধে সচেতন, তাই পাঠকবর্গের

৮১ *Religion of Man*, p. 131.
৮২ "মানুষের ধর্ম", রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৫৮৭।
৮৩ ঐ, পৃঃ ৫৯৩।

মার্জনা চাইছেন এই অজুহাতে যে বেচারা যক্ষ কামার্ত তাই সে বিহ্বল, সে চেতন-অচেতনের পার্থক্য নিরূপণে অসমর্থ। "কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু"। ফলে রবীন্দ্রনাথ যখন পরম সত্য-জ্ঞান বা প্রজ্ঞার জন্য কল্পনার প্রাধান্য মানলেন তখন কিছুটা সংশয়াত্মক বিস্ময় জাগা একান্তই স্বাভাবিক। প্রথমেই তাই আমাদের কর্তব্য কল্পনার এই প্রচলিত অর্থ-সংস্কার থেকে মনকে মুক্ত করা। বস্তুত, এ যুক্তি আনতে হলে কল্পনা সম্বন্ধে যে প্রচলিত বিশ্লেষণ আছে তা বদলাতে হবে। সাধারণভাবে কল্পনাকে প্রত্যক্ষের পর্য্যায়েই রাখা হয়—কেবল সেটি একটি মানস প্রত্যক্ষ (mental seeing)—তার বিষয়ও প্রাকৃতিক জগতের বিষয়েরই প্রতিরূপ বা প্রতিবিম্ব (image)। কল্পনার এই প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষে অভিনবত্ব কেবল বিষয়গুলির সংযোগ-সমন্বয়ে। বিষয়রূপ নির্ধারিত একরূপ মানস প্রত্যক্ষকেই যদি কল্পনা বলে মানি তাহলে অবশ্য অনুভবে, যা প্রজ্ঞার প্রমাণ, তাতে কল্পনা মানার অর্থই সত্য-বিরোধী বৃত্তি প্রয়োগ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে কল্পনা মেনেছেন তা সৃজনশীলতা, কিন্তু "কাল্পনিক" অর্থে অসত্যের জনক নয়। কল্পনাকে এক স্বতন্ত্র প্রমাণ মানতে হবে, এবং অবশ্যই সেটা রবীন্দ্রদর্শনে এতাবৎ ব্যাখ্যাত "অনুভব"। এই অনুভব, কল্পনা ব্যতিরেকে একেবারেই পঙ্গু। অনুভবের জ্ঞানের দিকটি স্বীকৃত। আগেই দেখেছি অনুভবে রবীন্দ্রনাথ প্রমাতা-প্রমেয় পার্থক্য অস্বীকার করেছেন —এই দুই ভিন্ন ধারায় ঐক্য সাধনই এ অনুভবের প্রকৃত স্বরূপ। প্রতিবিম্ব-প্রত্যক্ষরূপ যে কল্পনা সেখানে এ ভেদ অস্বীকৃত ত নয়ই, উপরন্ত এ ভেদ-বুদ্ধি তার প্রাণস্বরূপ। ফলে রবীন্দ্রনাথ অনুভবে যখন কল্পনা বা সৃজনশীলতা মানছেন তা কখনও তথাকথিত কল্পনা হতে পারে না। এ এক স্বতন্ত্র চৈতন্যপ্রকার। হুবহু এক না হলেও এই প্রতিবিম্ব-প্রত্যক্ষরূপ কল্পনার বিরুদ্ধে ফরাসী দার্শনিক সার্ত্রেও তাঁর মত প্রকাশ করেছেন তাঁর নিজস্ব ভাষায়।[৮৪] বস্তুত, সত্য যেখানে সর্বব্যাপক সেখানে উপরের অর্থে কল্পনার আশ্রয় না নিলে সত্য উপলব্ধি করা অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। পাশ্চাত্য দার্শনিক আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড্ তাঁর প্রধান গ্রন্থ *Process and Reality*তে প্রকৃত দার্শনিক পদ্ধতিতে (সামান্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য) কল্পনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন—তাঁর ব্যবহৃত শব্দ হল "*imaginative generalization*" (*Process and Reality*, Chapter I—Speculative Philosophy)। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ও উল্লিখিত দুই পাশ্চাত্য দার্শনিকের তত্ত্ব-বাদ পৃথক হওয়ায় সাদৃশ্যকে বেশীদূর টানা অনুচিত হবে। তবু এ উল্লেখের দ্বারা প্রমাণিত হল যে প্রকৃত জ্ঞানলাভে কল্পনার ব্যবহারে দার্শনিক মহলে রবীন্দ্রনাথ একেবারে নিঃসঙ্গ নন। বিষয়-বিষয়ী ভেদলোপকারী যে সৃজনশীলতা তার

৮৪ "An image can only enter into conscious if it is itself a synthesis, not an element. There are not, and never could be images in consiousness. Rather an image is a *certain type of consciousness*. An image is an act, not something." J. P. Sartre *Imagination*—(translated by F. Williams). The University of Michigan 1962, p. 146.

প্রয়োগে অলীক বিষয় সৃষ্ট হয় না—পরন্তু সম্ভব হয় এক সক্রিয় আত্মবিস্তার। সামঞ্জস্য এমনই সত্য যে তাকে পেতে হলে সৃজন করতেই হবে। সে যে হয়ে নেই, তাকে করতে হয়। বিভিন্নতার মধ্যে তাই যে ঐক্য সৃজন, তাই প্রকৃত প্রজ্ঞা। সৃজনশীলতা তাই একমাত্র এ সত্যকে পাওয়ার পথ। পাওয়া ও হওয়া, আগেই বলা হয়েছে রবীন্দ্রদর্শনে একার্থক। আর হওয়া অর্থ মাত্র প্রাণ পরিবর্তন বা আকার পরিবর্তন নয়, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন—অর্থাৎ নবতর দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করা। সৃজনশীলতা ব্যতীত সৃষ্টি অসম্ভব। অতএব অন্তে প্রজ্ঞা হল সৃষ্টি আর তার সাধক যে অনুভব তা সৃজনশীলতা। সৃজনশীলতাকে অনুভবের অনিবার্য সামগ্রী বলে মানলে মুক্তির প্রয়োজনীয়তাও অবশ্য স্বীকার্য। মুক্ত সত্তা ব্যতীত সৃষ্টি সম্ভব নয়। অতএব অনুভবের শেষ ও চতুর্থ (৪) বৈশিষ্ট্য হল "মুক্তি" (freedom)। মুক্তি সম্পর্কে এর পরের অনুচ্ছেদে বিশদ আলোচনা করব, তাই এখানে সে সম্বন্ধে আর কিছু বলে পুনরুক্তি দোষ বৃদ্ধি করব না। বস্তুত, রবীন্দ্রদর্শনের ভাবধারাটি এমনই সংবৃত ও ভাবগুলি এত পরস্পর নির্ভরশীল যে একটির আলোচনায় সঙ্গতিস্বার্থে আরগুলি ক্রমাগত আসতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথ এই মুক্ত চৈতন্যের বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর দার্শনিক গ্রন্থ *Religion of Man*এ লিখেছেন—

> "And it is in this realm of freedom that he realizes his divine dignity, his great human truth, and is pleased when I as a poet sing victory to him, to Man the self-revealer, who goes on exploring ages of creation to himself in perfection".[৮৫]

সামঞ্জস্য এমনই একটি ভাবধারা যা ধরা পড়ে সুরকারের ঐক্যে— সৃজনশীল ঐক্যে; কেননা সামঞ্জস্য ত স্থির নয়, তা স্পন্দনশীল, ছন্দোময়। আর তাই সামঞ্জস্যস্বরূপ যে বিশ্বমানব তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "music maker" (তুঃ *Religion of Man*)—তিনি শিল্পী, তিনি সুরকার। আর মানবমাত্রই তাই শিল্পী, তাই সে মুক্তি-স্বরূপ। অর্থাৎ সত্য হল সৌন্দর্যের আধার, প্রকৃতপক্ষে সত্য ও সুন্দর হল অভিন্ন। যাই হোক, সামঞ্জস্য জানতে যে সৃজনশীলতার প্রয়োজন একটি দৃষ্টান্তে তা আরও পরিষ্কার হবে। আমরা যখন কোনও গান শুনি তখন গানটি অবশ্যই বহু বিভিন্ন ধ্বনির ছন্দোময় সামঞ্জস্য। অর্থাৎ সুর মাত্র ধ্বনি-সমষ্টি নয়, তা ধ্বনি-সামঞ্জস্য। অতএব এই শোনা গানটি যখন স্মরণ করতে চাই গান হিসাবেই, তখন যদি মনের মধ্যে সুরটি গাইতে না পারি তাহলে প্রকৃতপক্ষে গানটি করতে পেরেছি বলতে পারি না। আর নিজে স্রষ্টা বা গায়ক না হলে এ সম্ভব নয়। গানকে গান হিসাবে জানা অর্থ তাকে সৃষ্টি করা। এ প্রসঙ্গে বলা অসঙ্গত হবে না যে প্রখ্যাত ইতালীয় দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রোচে এই মতের একজন

৮৫ *Religion of Man*, p. 130.

প্রবক্তা। তাঁর মতেও সমগ্রের জ্ঞান একমাত্র Intuition-য়েই সম্ভব—এবং এই intuition প্রকাশ ছাড়া অর্থহীন। এই অর্থে সকল মানবই শিল্পী, কেননা শিল্প মাত্রই প্রকাশ। উপরে অনুভবের যে বর্ণনা দেওয়া হল তাতে নিরাপদেই বলতে পারি যে সৃজনশীলতা ব্যতীত এ অনুভব অসার, অনর্থক। এবার সংক্ষেপে, রবীন্দ্র-দর্শনের মূল প্রমাণ যে "অপরোক্ষ অনুভব" তার চারিটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারি: (১) প্রমাতা-প্রমেয় অভেদ ও সত্তা সামঞ্জস্যে আত্ম-বিস্তার (২) আবেগময়তা ও বিশিষ্ট অর্থে প্রেম ও সহানুভূতিময়তা, (৩) সৃজনশীল কল্পনা প্রয়োগ ও (৪) মুক্তিস্বরূপ সত্যজ্ঞান। এবার এরই একটি সার্থক ছবি যা রবীন্দ্রনাথ বারবার উল্লেখ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ধৃত করব। এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটিতে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বোধ বা অনুভব কি রূপ নিয়েছে তার মূর্ত উদাহরণ মিলবে। এটি তাঁর "মানুষের ধর্ম" গ্রন্থের সংযোজন "মানব সত্য" অংশে উল্লিখিত আছে।

> "তখন প্রত্যূষে ওঠা প্রথা ছিল। . . . মনে আছে একবার ডালহৌসি পাহাড়ে পিতার সঙ্গে ছিলুম। . . . . সেই ভোরে উঠে একদিন চৌরঙ্গির বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে-ছিলুম। . . . . সে দিকে চেয়ে দেখলুম গাছের আড়ালে সূর্য উঠছে। যেমনি সূর্যের আবির্ভাব হল গাছের অন্তরালের থেকে, অমনি মনের পরদা খুলে গেল। মনে হল, মানুষ আজন্ম একটা আবরণ নিয়ে থাকে। সেটাতেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হলে সাংসারিক প্রয়োজনের অনেক অসুবিধা। কিন্তু সেদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খসে পড়ল। মনে হল, সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলুম।"

এই অভিজ্ঞতারই কাব্য-প্রকাশ হল "প্রভাত-সঙ্গীত"। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাটি এই অর্থে এক পরম আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সঙ্কেত। একই গ্রন্থে আর একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে:

> "অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আমার অন্তরে একটা অনুভূতি এল; সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকালব্যাপী একটি সর্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড লীলা। নিজের জীবনে যা বোধ করছি, চার দিকে ঘরে-ঘরে জনে জনে মুহূর্তে-মুহূর্তে যা কিছু উপলব্ধি চলেছে সমস্ত এক হয়েছে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে। . . . সমস্তটার ভিতর দিয়ে একটা নাট্যরস প্রকাশ পাচ্ছে এক পরমদ্রষ্টার মধ্যে যিনি সর্বানুভূঃ।
>
> এমনি করে আপনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমগ্রের মধ্যে খণ্ডকে স্থাপন করা মাত্র নিজের অস্তিত্বের ভাব লাঘব হয়ে গেল। তখন জীবনলীলাকে রসরূপে দেখা গেল কোনো রসিকের সঙ্গে এক হয়ে। আমার সেদিনকার এই বোধটি নিজের কাছে গভীর ভাবে আশ্চর্য হয়ে ঠেকল—একটা মুক্তির আনন্দ পেলুম।"[৮৭]

৮৬ Croce, B., *Aesthetics.*

৮৭ রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৬০৬ ও ৬১১।

উপরিউক্ত বিবৃতি দার্শনিকের স্বীয় অভিজ্ঞতার সত্য উপলব্ধির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অনুভবের সংগঠন সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলে এ পরিচ্ছেদটি শেষ করব। যদিও পূর্বে বলা হয়েছে "প্রত্যক্ষ" লৌকিক অর্থে রবীন্দ্রদর্শনে গ্রাহ্য প্রমাণ নয়, কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে অনুভব লাভ করতে প্রত্যক্ষের কোনও প্রয়োজনীয়তাই নেই। বস্তুত, খণ্ডগুলি যেরূপ খণ্ড হিসাবে অসত্য কিন্তু পূর্ণে সামঞ্জস্যের সামগ্রী, ঠিক তেমনই যদি রবীন্দ্রদর্শনে অনুভবের একটি মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ দিতে হয় তাহলে বলা উচিত যে, লৌকিক প্রত্যক্ষগুলির একটি প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা আছে। যে রূপ, যে স্পর্শ, যে ধ্বনি, যে রস, যে ঘ্রাণ আমরা প্রতিনিয়ত পাই, কোনও এক ব্যাকুল মুহূর্তে তারাই উপলক্ষ হয় আমার চৈতন্যে এক প্রজ্ঞা-সাধক অনুভবের আকস্মিক উদ্ভাসের। যেমন উদ্ধৃত অংশে "সূর্যোদয়"—যা দৃশ্য, যা খণ্ডিত প্রত্যক্ষ—তাই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গেল সেই 'সর্বানুভূঃর' সত্যলোকে, তেমনই অন্যান্য নানা প্রকার প্রত্যক্ষ এই প্রয়োজন সাধন করতে পারে। কি করে প্রকৃত প্রস্তাবে চৈতন্যে এ ঘটে তা বলা বা তার কোন বৈজ্ঞানিক বর্ণনা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়—(এবং বোধ হয় কারও পক্ষেই সম্ভব নয়)। ইনট্যুশ্যান্ যদি মানা হয় তাহলে তার প্রকৃতস্বরূপ বর্ণনা আজও বৈজ্ঞানিকভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। অতি আধুনিক "ইন্দ্রিয়াতীত প্রত্যক্ষের" (Extra sensory perception) যে বিশ্বব্যাপী গবেষণা চলেছে তাতে হয়ত একদিন মনের এ রাজ্যের তাত্ত্বিক বর্ণনা পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানে যাকে "insight" বলে তাও এমনই। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তার ব্যাখ্যা আজও অসম্ভব। প্রতিটি বৈজ্ঞানিক "আবিষ্কারের" মধ্যে হয়ত এ জাতীয় অনুভব-প্রাধান্য মানতে হয়। রবীন্দ্র-দর্শনে অনুভবের কোনও সুবোধ্য মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা (অবশ্য রবীন্দ্রদর্শনের সঙ্গতি রাখতে হলে এ ব্যাখ্যা চাওয়া অযৌক্তিক) দেওয়া সম্ভব না হলেও সাহস করে আমরা একটি ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করছি। উপলক্ষ-স্বরূপ যে সব খণ্ড-প্রত্যক্ষ সেগুলি যখন মনকে অকস্মাৎ প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে তখন উপস্থিত হয় তীব্র আবেগ-প্রাবল্য। এই আবেগময়তা চৈতন্যকে ক্রমাগত ব্যাপ্ত করতে থাকে—বিচ্ছিন্ন একটি রূপ-কল্প (যথা, সূর্যোদয়, বা "বেলা যায়" ধ্বনি) বিস্তৃত হতে হতে ক্রমশ তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে সঙ্কেত হিসাবে চৈতন্যে আনে এক অভিনব অভিজ্ঞতার আবেশ—এ আবেশ তখন সৃজনশীল কল্পনার সাহায্যে প্রকৃত সমন্বয়ে এক চরম প্রজ্ঞাময় রূপ গ্রহণ করে। এ নিতান্তই অস্পষ্ট, কিন্তু এ জাতীয় প্রকল্পের কিঞ্চিৎ সমর্থন পাই রবীন্দ্রনাথের "আকাশ প্রদীপ" কাব্য গ্রন্থের "ধ্বনি" কবিতাটিতে—

> "জলপূর্ণ জীবনের যে আবেগ পৃথ্বীনাট্যশালে
> তালে ও বেতালে
> করিও চরণ পাত,
> কভু অকস্মাৎ
> কভু মৃদু বেগে ধীরে
> ধ্বনিরূপে মোর শিরে

স্পর্শ দিয়ে চেতনারে জাগাইত ধোঁয়ালী চিন্তার,
নিয়ে যেত সৃষ্টির আদিম ভূমিকায়।
চোখে দেখা এ বিশ্বের গভীর সুদূরে
রূপের অদৃশ্য অন্তঃপুরে
ছন্দের মন্দিরে বসি রেখা জাদুকর কাল
আকাশে আকাশে নিত্য প্রকাশে বস্তুর ইন্দ্রজাল।
যুক্তি নয়, বুদ্ধি নয়,
শুধু যেথা কত কী যে হয়—
কেন হয় কিসে হয় সে প্রশ্নের কোনো
নাহি মেলে উত্তর কখনো।
যেথা আদি পিতামহী পড়ে বিশ্ব পাঁচালির ছড়া
ইঙ্গিতের অনুপ্রাসে গড়া—
কেবল ধ্বনির ঘাতে বক্ষস্পন্দে দোলন দুলায়ে
মনেরে ভুলায়ে
নিয়ে যায় অস্তিত্বের ইন্দ্রজাল সেই কেন্দ্রস্থলে,
বোধের প্রত্যূষে যেথা বুদ্ধির প্রদীপ নাহি জ্বলে।"

মুক্তি [FREEDOM]

মুক্তি সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা সত্তা-দর্শনের পক্ষে অতি আবশ্যক না হলেও, যেহেতু সত্তারূপে সৃজনশীলতা নিহিত, অতএব সত্তা-বোধে মুক্তি-চৈতন্য অবশ্যম্ভাবী। এ ভাবধারাটির বিস্তৃতভাবে পরের পরিচ্ছেদগুলিতে স্বতই আলোচিত হবে। এ অনুচ্ছেদে তাই সত্তা ও মুক্তির সম্বন্ধে কিছু সাধারণ আলোচনা ব্যতীত বিশেষ কিছু করা হবে না। প্রথমেই বলে রাখি পাশ্চাত্য-দর্শনে "ফ্রিডম" (freedom) শব্দটির যে জাতীয় দ্যোতনা ও বিশেষ করে ব্যঞ্জনা, বাংলা ভাষায় "মুক্তি" শব্দটির অর্থ তা থেকে কিছুটা বিভিন্ন। ফলে "মুক্তি" শব্দটিকে ইংরাজী "ফ্রিডম" শব্দের হুবহু প্রতিরূপ ভাবলে অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ নিজে ও আরও অনেকে "মুক্তি" শব্দটিকেই মোটামুটি "ফ্রিডম" শব্দটির প্রতিরূপ ধরেছেন, ফলে আমরাও এখানে "মুক্তি" শব্দটি ওই অর্থেই ব্যবহার করব। বাংলায় "মুক্তি" শব্দটির কোথায় যেন এক আধ্যাত্মিক আভাস থেকেই যায়—বস্তুত, ভারতীয় দর্শনের "মোক্ষকে" স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রদর্শনে যদিও আধ্যাত্মিকতা প্রবল তবুও ঐ দর্শনে "মুক্তি" শব্দটি কোনক্রমেই "মোক্ষ" পদটির সমার্থক নয়। যাই হোক, অর্থগত এ অসুবিধা, সাবধানতা ও প্রসঙ্গ-বিশেষ সম্বন্ধে সচেতনতা বজায় রাখলে, বিশেষ দার্শনিক অসুবিধার সৃষ্টি করবে না। অনেক সময়, বিশেষ করে সৃজনশীলতা প্রসঙ্গে, "স্বাধীনতা" শব্দের দ্বারা মুক্তির অর্থ সূচিত হওয়া বৈধ।

রবীন্দ্র-দর্শনে মুক্তি বিষয়ক আলোচনার পূর্বে সাধারণভাবে এই ভাবটির অর্থ কিছুটা আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

মুক্তি-চৈতন্যের তাৎপর্য বর্তমান দর্শন ও সাহিত্যে দুই বিভিন্ন প্রকারে গৃহীত হয়। একটিকে বলা যায় আপেক্ষিক মুক্তি-চৈতন্য এবং দ্বিতীয়টি অপেক্ষাহীন বা চরম মুক্তি-চৈতন্য। কোনও একটি বিশেষ প্রসঙ্গে সেই প্রাসঙ্গিক যে বন্ধন তার থেকে আহরিত যে মুক্তি বা স্বাধীনতা তাই হল আপেক্ষিক মুক্তি-চৈতন্য (relative freedom)। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চিত্রকর যখন ছবি আঁকছেন, তখন সেই অঙ্কন-ব্যাঘাতকারী কোনও বন্ধনের অনুপস্থিতি থাকলেই বলব চিত্রকর স্বাধীন বা মুক্ত; এটি হল আপেক্ষিক মুক্তি-চৈতন্য। অর্থাৎ এই প্রসঙ্গে চিত্রকর হিসাবে তিনি মুক্ত। যখন কোনও কর্মের জন্য কাউকে দায়ী করা হয় তখন এই আপেক্ষিক মুক্তিই ধরে নেওয়া হয়। অবশ্য যে দর্শন বা তত্ত্ব বিশ্বাস করে যে সকল কার্যই কারণ-নির্ধারিত সে দর্শনে কোনও কার্যের জন্য কেউ দায়ী নন; কেননা যেখানে অধিকার বা স্বাধীনতা নেই, সেখানে দায়িত্বের প্রশ্নই ওঠে না। অর্থাৎ কোনও প্রাকৃতিক নিয়ম-তন্ত্রকে যদি সর্ব-নিয়ন্ত্রক বলে মেনে নি তাহলে সেক্ষেত্রে মুক্তির কোনও অবকাশ নেই। এই জন্যই অনেক দার্শনিকের মতে ভারতীয় চিন্তায় কর্মফলবিধি ব্যক্তিগত মুক্তিবিরোধী। অবশ্য এই চরম ও আপেক্ষিক মুক্তির ভেদ বিচার বাস্তবিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। ধরা যাক, আমাকে কেউ বন্দুক দেখিয়ে চুরি করাল। এখানে আমার যে পরাধীনতা তা কি চরম না আপেক্ষিক? অর্থাৎ আমি যে চুরি করলাম এটা কি না করেও পারতাম? আমি কি কোন অর্থেই মুক্ত ছিলাম? উত্তরে বলা যেতে পারে যে অন্তত মরবার স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু মৃত্যু যেখানে মুক্তির একমাত্র প্রকাশ, সে মুক্তি কি প্রকৃত মুক্তি? এ জটিলতা নিতান্তই দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে নানা প্রকার দার্শনিক তথ্যের সংমিশ্রণে। এত কথার মধ্যে না গিয়েও এটুকু বোঝা যায় যে, মুক্তি আপেক্ষিক ও অপেক্ষাহীন বা চরম, দুরকমই হয়। আমাদের প্রদত্ত প্রথম দৃষ্টান্তটিকে জনৈক ব্যক্তি 'ক' চিত্রকর হিসাবে মুক্ত হয়েও মানুষ হিসাবে বা 'ক' হিসাবে মুক্ত নাও হতে পারে। আর এটাই আপেক্ষিক মুক্তি-চৈতন্যের অর্থ। এ জাতীয় মুক্তি সহজেই ভাষায় বর্ণনা করা যায়; কোন কোন নিষেধ মানলে এ মুক্তির অসুবিধা তাও বিশদ ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ ও বর্ণনা করা যায়। এই আপেক্ষিক অর্থে গ্রহণ করার জন্য পাশ্চাত্য দর্শনে দায়িত্বকে মুক্তি নির্ভর করা হয়, ইচ্ছা জগতের মুক্তিকেই (freedom of will) মুক্তির স্বরূপ বলে ভাবা হয়। আমরা পরে দেখব আধুনিক জগতে পাশ্চাত্যে সত্তা-বাদী দার্শনিকরা এ জাতীয় আপেক্ষিক মুক্তির চেয়ে নিরপেক্ষ চরম মুক্তিতেই বিশ্বাসী। অর্থাৎ সত্তাকে মুক্তি-স্বরূপ মেনে রবীন্দ্রনাথের মত তাঁরাও ভাবতে ইচ্ছুক।

মুক্তি যেখানে চরম অর্থে গৃহীত, সেখানে সে চৈতন্য কোনও প্রসঙ্গ-নিরপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "সে আপনিই আপনার জবাবদিহি, আপনিই আপনার লক্ষ্য"।[৮৮] অর্থাৎ সকল বিধি, সকল নিয়মতান্ত্রিকতাই যেখানে পরাস্ত, দার্শনিক ভাষায় মুক্তিই সেখানে

৮৮ "শান্তিনিকেতন", "প্রেম" রবীন্দ্র রচনাবলী ১২শ খণ্ড, পৃঃ ১১২।

সত্তা-স্বরূপ। এই চরম মুক্তি-চৈতন্য কিন্তু অনির্বাচ্য। কোথায় কি ভাবে আমি মুক্ত এটা বর্ণনা করা যায় না, তাই এক অর্থে স্বপ্রকাশ হলেও অনির্বাচ্য। যখনই ভাষায় তাকে বর্ণনা করতে যাব, তখনই অন্তত ভাষার আইন তাকে বাধ্যতার পোশাক পরাবে; আর তৎক্ষণাৎ মুক্তির চরিত্র হবে বিনষ্ট। কোনও আইন যাকে মানতে হয়, সে কখনও চরম মুক্তি-চৈতন্যের আস্বাদন করতে পারে না। আর তাই তা অবর্ণনীয়, অনির্বাচ্য। রবীন্দ্র-দর্শনে মুক্তির যে ধারা তা এই শেষোক্ত প্রকারের। এ মুক্তিতে বিশ্বাস করলে বলতে হবে আত্ম-সত্তায় "মুক্তি" কোনও সত্তাতিরিক্ত ধর্ম (সার হোক, অসার হোক) নয়, সত্তা-স্বরূপ। মুক্তির এই স্বমুখীন (subjective) প্রবাহ চরম মুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ আমার "থাকা", "মুক্ত হওয়া" দুই ভিন্ন পর্যায়ের নয়, আমার "থাকাটাই" অবশ্য "স্বরূপ থাকা" (এবং সেটাই প্রকৃত "থাকা"), আমার মুক্তি। সত্তা ও মুক্তির এই অভিন্নতায় রবীন্দ্রনাথ ভারতীয়, বিশেষ করে বৈদান্তিক ঐতিহ্যের, সার্থক উত্তরসাধক। যদিও তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মস্ত প্রভেদ এই মুক্ত সত্তার স্বরূপে। রবীন্দ্রনাথের দর্শনে এ মোক্ষ সৃজনশীল, উন্মেষশালিনী—সুরকারের ঐক্যে বিধৃত সামঞ্জস্য। সত্তাসমূহকে বাদ দিয়ে নয়, তাদের প্রেমে ঐক্যবদ্ধ করে প্রকৃত মুক্তি। অর্থাৎ দুইকে, বিশ্বকে, বাদ দিয়ে এ মুক্তি আসে না—"আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে", "আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে"। মূল কথা, এ মুক্তি সর্বব্যাপী সত্তাস্বরূপ, আর তাই সর্ব-নিরপেক্ষ চরম (absolute)। রূপান্তর-ন্যায়ে বলা যায়, সামঞ্জস্যই সত্তা, সত্তাই সৃজনশীলতা, সৃজনশীলতাই মুক্তি। অর্থাৎ "আমি আছি" এই সত্যের অনিবার্য রূপ মুক্তি-চৈতন্য। আর জীবনস্বরূপই যদি হয় জীবনাদর্শ তাহলে মুক্তিই সেই আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়—"The only goal of human life is to offer freedom and *be free*, the freedom that guides it to the life which is worth-while"[৮৯]. মুক্তির এই আদর্শই বিশ্ব-বিবর্তনের অনুপ্রেরণা। এ ধারণা রবীন্দ্রনাথ তাঁর *Religion of Man* গ্রন্থে বিবর্তন-ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করলেন। মানুষ যখন দাঁড়াল ঋজু হয়ে, দুপায়ে ভর দিয়ে তখন তার দৃষ্টি হল বিস্তারিত—সুদীর্ঘ রেখা থেকে নিজেকে স্বস্তের কেন্দ্রে অবস্থিত করে নবতর দৃষ্টিতে—মুক্ত দৃষ্টিতে সে দেখল জগৎকে। এই দৃষ্টির মুক্তি দৃঢ়তর হল মানুষের কর্মের মুক্তিতে—দুটি হাতের ব্যবহারে—

> "But the best means of the expression of his physical freedom gained by man in his vertical position is through the emancipation, which is the most distinctly human of all our faculties.[৯০]

এমন করেই মুক্তি-বিস্তারে বিশ্ব অন্বেষণ করেছে সত্য—এগিয়ে চলেছে নব নব সৃষ্টির পথে। এই যে মুক্তির পূর্ণতা তা কখনই মানুষের অংশিক সত্যের আধার নয়—মাত্র তার

৮৯ "Man" Andhra University series No. 16, Waltair, 1937 p. 14.
৯০ *Religion of Man*. p. 53, p. 54.

ইচ্ছা বা দাবীর স্বাধীনতা নয়। আধুনিক সত্তাবাদী দর্শনেও মুক্তির অনেকটা এই সর্বব্যাপী রূপ ধরা পড়েছে। এ জাতীয় দর্শন ব্যাখ্যাকারী জনৈক পাশ্চাত্য দার্শনিক লিখেছেন—

"The rationalistic view of "freedom of the will", as actiion in accordance with a pre-established order is too narrow and leads to determination in the end. The same is true of naturalistic attempts to identify freedom with special forms of determinism (action from internal causes, for rational ends etc.) All such theories attempt to fit freedom into an alien objective frame and therefore destroy it.

As kant pereived, freedom belongs to a world of its own, the world in which we live and exist."[৯১]

মুক্তি কৈবল্যে রবীন্দ্রনাথ ও ফরাসী দার্শনিক সার্ত্রে দুজনেই ছিলেন বিশ্বাসী—কৈবল্যরূপেই মুক্তি আমাদের সমগ্র সত্তাকে পরিব্যাপ্ত রেখেছে।[৯২] এক্ষেত্রে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে রবীন্দ্রনাথ যে মুক্তিকে সত্তাস্বরূপ মানলেন তাতেও প্রচলিত অর্থ খর্ব হল৭ যেখানে কর্ম নেই সেখানে স্বাধীনতার আস্বাদন কোথায়? বন্ধনহীনতা ত একটি এমন সত্য নয় যা নৈষ্কর্ম্যে অনুভূত হয়। রবীন্দ্রদর্শনে এর উত্তর সহজ। আগেই দেখান হয়েছে সত্তাই সৃষ্টি, আর সৃষ্টির চেয়ে মুক্তি-প্রকাশক কর্ম আর কি থাকতে পারে? এই সত্তাকে উপলব্ধি করতে প্রতিনিয়ত আমাকে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে হয়েছে। আমি মুক্তি-স্বরূপ না হলে তা করি কি প্রকারে? সকলের মিলনতীর্থে তাই আমার মুক্তি—কেননা, সেই নিখিল চৈতন্যের সামঞ্জস্যই ত আমার সত্তা। রবীন্দ্রনাথ তাই বললেন—"একলা-আমির কর্মই বন্ধন, সকল-আমির কর্ম মুক্তি"।[৯৩] যদিও ভিন্ন মতাবলম্বী তবু সার্ত্রে এই ভাষাই হুবহু ব্যবহার করলেন মুক্তি-স্বরূপ মানব-সত্তাকে প্রকাশ করতে তাঁর উল্লিখিত পুস্তকেও আরও বিস্তারিত করে তাঁর নতুন বই *The Problem of Method*-এ[৯৪] মোট কথা, যেখানে আমার সঙ্গে অপরের বিরোধ, দ্বন্দ্ব, সেখানেই আমার বন্ধন। যেখানে আমার এই সীমায় অসীমের ধারা প্রকাশিত সেটাই আমার প্রকৃত সত্তা আর তাই সেখানেই আমার মুক্তি। এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে নিখিল চৈতন্যের মিলনতীর্থ যে আমি—সকলকে স্বীকার করে যে মুক্তি তা কিন্তু সত্তা-স্বরূপকে ব্যাহত করে না—এই সামঞ্জস্যেই,

৯১ J. Wild—*Existence and the world of freedom*, p. 16.

৯২ "For I declare that freedom, in respect of concrete circumstances, can hate no other and aim but itself" J. P. Sartre—*Existentialism and Humanism*, p. 51.

৯৩ "মানুষের ধর্ম", রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খণ্ড পৃঃ ৫৯৬।

৯৪ সার্ত্রের ভাষায়—

"And in thus willing freedom, we discover that it depends entirely upon the freedom of others and that the freedom of others depends upon our own."

বারবার মানা হয়েছে, রবীন্দ্রদর্শনের প্রকৃত সত্তা-রূপ। তার অর্থ আপন-স্বরূপে আপনাকে পাওয়াই মুক্তি—স্বাশ্রয়েই আমি মুক্ত।

"মুক্তি এই—সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে,
নহে কৃচ্ছ্রসাধনায় ক্লিস্ট কৃশ বঞ্চিত প্রাণের
আত্ম অস্বীকারে। রিক্ততায় নিঃস্বতায়, পূর্ণতায়
প্রেতচ্ছবি ধ্যান করা অসম্মান জগৎলক্ষ্মীর।"[৯৫]

এখানে রবীন্দ্রনাথ মুক্তি নিলেন ঐতিহ্য-সংস্কার থেকে—কিছু অস্বীকার করে নেতির পথে মুক্তি আসে না, বন্ধন বৃদ্ধি হয় মাত্র। প্রেম ও অনুরাগে সবকিছুর আত্মসাৎ করাই মুক্তি, বৈরাগ্য-সাধনে নয়। "যেমন ঘর ছেড়ে দিয়ে কোনো দূর দেশে যাওয়াকে অন্ধকারমুক্তি বলে না, ঘরের দরজাকে খুলে দেওয়াকেই বলে অন্ধকারমোচন; তেমনি জগৎ-সংসারকে ত্যাগ করাই মুক্তি নয়— .... যা দেখছি একেই সত্য করে দেখা, যা করছি একেই সত্য করে করা, যার মধ্যে আছি এরই মধ্যে সত্য করে থাকাই মুক্তি"। তাই সত্যের স্বভাবে সত্যকে পাওয়া বা হওয়াই মুক্তি। অপূর্ব রবীন্দ্রদর্শনের এই ন্যায় সঙ্গতি• মুক্তির সংজ্ঞা বস্তুত, সত্তা-সংজ্ঞার সঙ্গে একার্থক হল। অর্থাৎ সামঞ্জস্যকে দার্শনিক প্রাধান্য দিয়ে ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুললেন এক অপূর্ব ন্যায়সিদ্ধ সংহত দর্শন। আমরা দেখলাম রবীন্দ্রদর্শনে কোন কিছু অস্বীকার করায় মুক্তি নেই—এমন কি যেটা ভাবা অত্যন্ত স্বাভাবিক সেই বন্ধন-হীনতায়ও মুক্তি নেই। মুক্তি বন্ধনকে মেনে—তাকে স্বরূপে সামঞ্জস্যময় করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "শান্তিনিকেতন" গ্রন্থে "নিয়ম ও মুক্তি" প্রবন্ধে তাই লিখছেন—"তবে মুক্তি কাকে বলে? এই নিয়মকে পরিপূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে নেওয়াকেই বলে মুক্তি। নিয়ম যখন কোন জায়গায় আমার বাইরের জিনিস হবে না, সম্পূর্ণ আমার ভিতরকার জিনিস হবে, তখন সেই অবস্থাকে বলব "মুক্তি"।"[৯৭] যখন নিয়মের সঙ্গে হবে আমার পূর্ণ সামঞ্জস্য তখনই আমি সত্য, আমি মুক্ত। কিন্তু যদি আনন্দ না থাকে, প্রেম না থাকে, তবে সকলকে, সব কিছুকে একান্ত করে, নিবিড় করে স্বাশ্রয়ে উপলব্ধি করব কেমন করে? প্রেমহীন মনের সংশয় ও দ্বিধাই হবে আমার অজ্ঞান, আমার বন্ধন। মুক্তির উপায় তাই আত্মোপলব্ধিরই উপায়, সত্য-লাভের উপায়—সেই লাভেরই আনন্দফল-স্বরূপ। "আমার মধ্যে যদি প্রেম না জাগে, আনন্দ না থাকে, তবে বিশ্ব আমার পক্ষে কারাগার। সেই কারাগার থেকে পালাবার চেষ্টা মিথ্যা; প্রেমকে জাগিয়ে তোলাই মুক্তি"[৯৮]।

উপরে রবীন্দ্রনাথের সত্তা-দর্শনে মুক্তির সার্থকতা দেখানর চেষ্টা করা হল। যুগপৎ এটাও দেখানর চেষ্টা করা হল যে প্রতিটি ভাবধারা পরস্পর ন্যায়ত আপন সত্তা প্রকারে

৯৫ "প্রান্তিক", ৬ সংখ্যক কবিতা।
৯৬ 'শান্তিনিকেতন', "মুক্তি", রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড পৃঃ ২৮৯।
৯৭ রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃঃ ২৭৭
৯৮ রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃঃ ২৯২।

পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ় সন্নিবদ্ধ। এই অসাধারণ ভাব-সংযোগ রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক নিষ্ঠাই মাত্র প্রমাণ করে না, তাঁর দার্শনিক তত্ত্বেরও অবিমিশ্র উৎকর্ষ ঘোষণা করে। এর পরেও যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে দার্শনিক বলতে দ্বিধা করেন বা করবেন তাঁরা তা করবেন নিতান্তই তাঁদের ব্যক্তিগত খেয়াল পরিতৃপ্তির জন্য। পরে, মুক্তির উপর আরও আলোচনা হবে, অতএব এ পরিচ্ছেদটি এখানেই শেষ করছি। হয়ত ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকতে পারে, তাই বলে রাখি যে মুক্তিকে "অনির্বাচ্য" বা "অবর্ণনীয়" বলা আর তাকে "অপ্রকাশ" বলা এক নয়। ফলে যদিও চরম মুক্তি (absolute freedom) অনির্বাচ্য, রবীন্দ্র-দর্শনে তা আত্যন্তিক প্রকাশধর্মী। এবং এ দুইয়ে কোনও অর্থ-অসঙ্গতি নেই। এটাই বরং প্রমাণিত হয় "প্রকাশ" আর "নির্বচন" স্বতন্ত্র ও ভিন্নার্থক, বিশেষ করে রবীন্দ্রদর্শনে।

উপসংহারে এযাবৎ রবীন্দ্রনাথের সত্তা-দর্শন সম্বন্ধে যা বলেছি তাকে যদি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে লিখি তা নিম্নলিখিত রূপ নেবে—সত্তা-সত্য—আমি আছি—সামঞ্জস্য। আর এই সত্তাকে উপলব্ধি করতে হলে চাই—সামঞ্জস্য—অনুভব—সৃজনশীলতা—মুক্তি-প্রেম বা আনন্দ। এই সবকটি ভাবধারাই আবার সামঞ্জস্যের স্বীকৃতি থেকেই লব্ধ।

রবীন্দ্র সত্তা-দর্শনে সামঞ্জস্য ভাবধারা শুধু অপূর্ব সংহতিই দেয় নি, দিয়েছে এক অভাবনীয় রহস্যঘনতা যা তাঁর সাহিত্যে সদাই প্রতিফলিত। আপাত বিরোধ, আপাত সংঘাত যে সত্তায় সমন্বিত—যে সত্তায় সীমা ও অসীমের—প্রবাহ ও প্রশান্তির—সত্য ও শিব ও সুন্দরের অসামান্য মিলনের লীলাক্ষেত্র, সে সত্য এক পরিব্যাপ্ত চৈতন্য দেয়—দেয় আশ্চর্য রহস্যময়তা। এ ধারায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ব্যাখ্যার পদ্ধতি মানলে তাঁর দর্শন ও সাহিত্য দেখা দেবে এক অভিনব ঐক্যে। রবীন্দ্র-চিন্তায় এই রহস্যময়তার দিকটি ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের ভাষায়—"জীবন ও চৈতন্য মানবসত্তায় এমন এক বিশ্ব-পরিব্যাপ্তি পেল যাতে সে সবকিছু ছাড়িয়ে সর্বানুভূঃ হয়ে উঠল। এই হল রবীন্দ্র সৌন্দর্যতত্ত্বের মিস্টিসিজম"।[৯৯]

৯৯ *Golden book of Tagore.*

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রেয়োদর্শন

পবিত্র কুমার রায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

অবতারণা

এমন অভিজ্ঞতা আমাদের প্রায়শই হয়েছে যে আমরা কাউকে না কাউকে বলতে শুনেছি যে তার ফটোগ্রাফ ভাল হয় নি। অথচ আমরা সকলেই মোটামুটি বিশ্বাস করি যে ক্যামেরা ভুল করে না। কিন্তু সেই ক্যামেরাতেই তোলা ছবি আমাদের 'মনোমত' হয় না। এখানে 'মনোমত' কথাটি লক্ষণীয়। অথচ অন্যের ফটোগ্রাফ ভালো হয়েছে এ কথা আমার স্বীকার করতে দ্বিধা হয় না; যদিও এই দ্বিধা কোন না কোন প্রকারে আমার নিজের ছবির ক্ষেত্রে বর্তমান থাকে। আবার আমরা এও লক্ষ করেছি যে আমরা যে পরিমাণ উৎসাহের সঙ্গে অন্যের মনোভাব বা চিন্তা বুঝে ফেলেছি বলে দাবি করি, তেমনি অন্য কেউ আমার মনোভাব বুঝে ফেলেছে, বা আমি যা ভাবছি তা জেনে ফেলেছে এ কথা, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে সত্য হলেও, স্বীকার করতে প্রস্তুত নই। কেউ যদি বলে যে তুমি কি করবে তা আমি জানি—এই প্রকার অনুমান যে আমার সম্বন্ধে কেউ করতে পারে—এই চিন্তাই আমার কাছে অসম্ভব বলে মনে হয়।

উপরোক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা কয়েকটি সাধারণ সূত্রে উপনীত হতে পারি। যথা, আমাদের মনে একটি বোধ সদাক্রিয়াশীল যে আমার প্রকৃত পরিচয় দেশে কালে অবস্থিত কোন প্রক্রিয়া বা বস্তুর দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। কোন বর্ণনা দ্বারাই আমার প্রকৃত পরিচয় বা স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে বিবৃত করা যায় না। আমি স্বভাবত মুক্ত, তাই কর্তারূপে আমি সর্বদা কার্য-কারণের দ্বারা ব্যাখ্যাত হতে পারি না। এই বোধ যে আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় চৈতন্য উৎপাদন করে, যার সঙ্গে এই বোধ মূলত অদ্বৈত, সেই বোধ বা চৈতন্য আমাদের সার্বিক স্বরূপের পরিচায়ক এবং আমাদের আধ্যাত্মিক সত্তার জ্ঞাপক। এই স্বরূপ বা সত্তাই আমাদের 'মানবত্ব'। আমি যেমন আমার হস্তপদাদি-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়েও তা থেকে স্বতন্ত্র, তেমনি কোন বর্ণনা ও কোন অনুমান কদাপি আমাদের মানবত্বকে বা আমাদের সত্তাকে সর্বতোভাবে নিঃশেষে নির্ধারণ করতে পারে না। এই অনিঃশেষতায় বা এই অসীমতার কোটিতেই আমরা স্বরূপত অধিষ্ঠিত। এই অসীমে অধিষ্ঠান বা আমাদের স্বরূপাবস্থান আমাদের চিন্তায়, কর্মে ও বাক্যেই প্রকাশ পেলেও, সব চিন্তায়, কর্মে ও বাক্যেই প্রকাশিত হয় তা নয়। যেমন কবি তাঁর কবিতায় ও জীবনচরিতে উভয়তই প্রকাশিত, কিন্তু কবিতায় তাঁর মুক্ত স্বভাব যে পরিমাণ স্ফূর্তি পায়, জীবনচরিতে তার ব্যত্যয় ঘটে। কারণ, জীবনচরিতে যে মানুষটির পরিচয় আমরা পাই সে দেশ-কাল ও কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার দ্বারা নিঃশেষে নির্ধারিত; সেখানে সব বর্ণনাই বাস্তবিক এবং সকল অনুমানই ত্রুটিহীন হেতু-লিঙ্গাদি দ্বারা প্রাপ্ত। কিন্তু কবিতায় যে মানুষটির পরিচয় পাই তাকে

সর্বদা দেশ-কালে নিঃশেষিত কোন ব্যক্তিরূপে সর্বদা চেনা যায় না, এবং তার হৃদয়বৃত্তির বিশেষ প্রকাশগুলি প্রায়শই আমরা 'অস্মদীয়' রূপে ভাবতে পারি এবং ভেবেও থাকি। কিন্তু, অপরপক্ষে, জীবনচরিতে বর্ণিত মানুষটিকে আমাদের পরিচিত বলে জ্ঞান হলেও, তার সঙ্গে আমরা কদাপি উপরোক্তভাবে একাত্ম হই না। জীবনচরিতে যাকে পাই সে একটি বিশেষ ব্যক্তি, সেখানে তার যে কর্মসূচী পাই তা একান্তভাবে তারই কর্ম, অথচ, কবিতায় যাকে জানি সে বিশেষ হয়েও সাবিক, তার অনুভূতিগুলি একটি বিশেষ ব্যক্তিচৈতন্যে উদ্ভাসিত হয়েও সাধারণীকৃত।

আমরা বলতে পারি যে আমরা কতকগুলি এমন কর্ম করে থাকি যা আমাদের আধ্যাত্মিক সত্তা-প্রকাশক, যে কর্মসমূহ অনুকরণ বা অভ্যাসের পরিণাম নয়, বরং বলতে পারি, সেগুলি 'সৃষ্টি'। অর্থাৎ, সেইগুলি এমন শ্রেণীর ক্রিয়া যা দেশ-কালের কোন ঘটনা দ্বারা সর্বাঙ্গীণরূপে ব্যাখ্যাত হয় না, যা পূর্বাচরিত কোন কর্মের পুনশ্চরণ নয়, যা শুধু অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করা যায় না। আর এও বলা যায় যে এই সব কর্ম সম্পাদনের দ্বারা আমরা পার্থিব কোন লাভ-ক্ষতির চিন্তায় আক্রান্ত হই না, এই সব ক্রিয়া সম্পাদনে আমরা ঐহিক কোন উদ্দেশ্য সাধন করি না। এই বিশেষ শ্রেণীর কর্মগুলি আমাদের এক গভীর তৃপ্তি-বিধায়ক, যাকে আনন্দও বলতে পারি। এই তৃপ্তি বা আনন্দ ইন্দ্রিয়জ অপরাপর কোন আনন্দের সমতুল্য বা সমার্থকও নয়। এই আনন্দানুভূতি 'আমি উপভোগ করছি' এইরূপ চৈতন্য-উৎপাদক নয়, বরং 'আমি আনন্দিত'—অর্থাৎ যে বাক্যে আনন্দানুভূতি ও 'আমিত্ব' অদ্বৈত, এইরূপ বোধের জনক।

বলা যায় যে, শিল্পসৃষ্টি অর্থাৎ উপরোক্ত বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত কর্মগুলি, সত্তাজ্ঞাপক বা আমাদের অস্তিত্বের মূল কেন্দ্র হ'তে উৎসারিত। এই বাক্যের ব্যাখ্যায়, বলা যায় যে আমাদের সত্তার বোধের সামান্য লক্ষণ এই সৃজনশীল কর্মগুলিতেও বর্তমান। যথা, সৃষ্টিমূলক কর্ম মুক্ত বা কোন উদ্দেশ্যবিধায়ক নয়; কোন বর্ণনা বা অনুমান-নির্ভর নয়; কোন বর্ণনা বা অনুমান দ্বারা তার সামগ্রিক পরিচয় অনিঃশেষে দেওয়া যায় না। কোন বর্ণনা বা অনুমান সৃষ্টির আংশিক পরিচয় মাত্র জ্ঞাপন করে।

প্রশ্ন করা যায় যে, মানুষ উপরোক্ত সৃষ্টিশীল কর্মে রত হয় কেন? কোন গূঢ় প্রণোদনা আবিষ্কার করা যায় কি না? বলা যায় যে সৃজনশীল কর্মের দ্বারা মানুষ এক শ্রেণীর প্রাপণীয় বস্তুকে অধিগত করতে চায়। এই প্রাপণীয় বস্তুসকল অন্যান্য পার্থিব কাম্যবস্তু থেকে পৃথক। এই পার্থক্য নিম্নলিখিতভাবে দেখান সম্ভব। যেমন, কোন পার্থিব কাম্যবস্তু প্রাপ্তির কামনা ইন্দ্রিয়জ চেতনার ফলেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু সৃজনশীল কর্মে যে প্রাপণীয় বস্তু আমাদের সৃষ্টিশীল করে তোলে তাকে অধিগত করার প্রেরণা ইন্দ্রিয়জ নয়। অর্থাৎ পূর্বজ্ঞাত বা পূর্বাস্বাদিত অথচ পার্থিব অর্থে আনন্দদায়ক কোন বস্তুই আমাদের জাগতিক কাম্য বস্তু হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, এই শ্রেণীর কোনো কাম্য-বস্তু অধিগত হলে আমাদের কোন-না-কোন ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করে, যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তৎকালীন আমরা ঐহিক চেতনায় একপ্রকার তন্ময়তা লাভ করি। কিন্তু, সৃজনশীল

কর্মে যে প্রাপণীয়কে আমরা চাই, তার প্রাপ্তিতে আমাদের কোন বিশেষ ইন্দ্রিয় বিশেষরূপে তৃপ্তিলাভ করে না, এবং সেই প্রাপণীয় কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ের অধিকারভুক্তও নয়। যেমন, সঙ্গীত কর্ণেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে বটে কিন্তু তার আবেদন উক্ত ইন্দ্রিয়েই সীমাবদ্ধ নয়। অপর পক্ষে সুখাদ্যের স্বাদ ও তৃপ্তি রসনাতেই পর্যবসিত। তৃতীয়ত, সৃজনশীল কর্মের যা প্রাপণীয় তা পূর্বজ্ঞাত বা পূর্বাস্বাদিত নয়, অথচ তার সম্বন্ধে আদি-অন্তহীনতার বা সর্বকালীনতা ও সর্বজনীনতার একটি ধারণা মনে ক্রিয়াশীল থাকে। অর্থাৎ প্রাপণীয় কেবল আমারই কাম্য তা নয়, সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত, এবং তার কাম্যতা আমার কামনা-সঞ্জাত নয়, তা প্রাপণীয় এই অর্থে যে, কাম্যতা তাতে নিহিত (intrinsic), কাম্যতাই তার পরিচয়। পার্থিব কোন বস্তুই অনুরূপ অর্থে কাম্য নয়। তদুপরি, এই প্রাপণীয় বস্তু কদাপি আপতিক অস্তিত্বসম্পন্ন নয়, বরং তার সত্তার এক অনিবার্যতা আছে—এমন একটি ধারণা আমাদের হৃদয়মন অধিকার করে। একটি গোলাপ শাশ্বত মূর্তিতে ধরা দেয় সৌন্দর্যদৃষ্টিতে। "Through what wild centuries roves back the rose"।

পার্থিব অর্থে কাম্য বা ইংরাজীতে যাকে object of desire বলে সেই অর্থে আমরা এর পর থেকে 'প্রেয়'[১] শব্দটি এবং সৃজনশীল কর্মের প্রাপণীয় বা ইংরাজী value শব্দের সমার্থকরূপে 'শ্রেয়' শব্দটি ব্যবহার করব।

চতুর্থত, প্রেয় ও শ্রেয় আমাদের দুভাবে আকর্ষণ করে। প্রেয় লাভের জন্য আমাদের যে প্রযত্ন তাতে প্রেয় বস্তু প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত শারীরিক বা মানসিক অস্বস্তি অনুভূত হয়, অপর পক্ষে শ্রেয় লাভের সাধনা নিরুত্তাপ আজীবন ব্যাপ্ত ও প্রাপ্তির সময় নির্দেশ করা যায় না, কারণ শ্রেয় পার্থিব কোন বস্তু নয়। এবং এর সঙ্গে আমরা একথাও বলতে পারি যে, শ্রেয় সাধনার প্রত্যেক স্তরই এক সমগ্রতার স্বাদ ও চরিতার্থতার আশ্বাস বহন করে। এই অর্থে জীবনে যে পূজা সারা হল না, তাও মূল্যহীন নয়, কারণ, 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'। শেষত, প্রেয় বস্তুর ক্ষেত্রে বেছে নেওয়ার অবকাশ থাকে, অর্থাৎ বলা যায়, বিভিন্ন সময়ে একাধিক বস্তু প্রেয় হতে পারে, এবং আমরা স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে বিভিন্ন প্রেয়গুণসম্পন্ন বস্তুর মধ্য থেকে কোন একটিকে বা একাধিককে নির্বাচন করে নিই। আবার মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে প্রেয়ত্বের স্বরূপভেদ ঘটে। বালককালে যা প্রেয়, যৌবনে তা হাস্যকর, আবার যৌবনে যা প্রেয় বার্দ্ধক্যে তা অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হ'তে পারে। কিন্তু শ্রেয় সাধনার ব্যাপ্তি দ্বারাই শ্রেয়বস্তুর আনন্ত্য এবং ঐক্য প্রমাণিত হয়। উক্ত আনন্ত্য ও ঐক্য থেকে আমরা এই উপসিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে, শ্রেয়বস্তুর একটি অনিবার্যতা আছে, কারণ, এ-ক্ষেত্রে কোন নির্বাচনের প্রশ্ন নেই। এবং অপর উপসিদ্ধান্ত এই যে, যেহেতু শ্রেয়বস্তু অনন্ত ও এক, সেজন্য তা অপরিবর্তনশীল, গতিসঞ্চারক, কিন্তু স্বয়ং অচলপ্রতিষ্ঠ। আরও একটু বিশদ করার জন্য বলা যায় যে, বিভিন্ন কর্মপন্থার মধ্যে নির্বাচনের কালে আমরা এক অনিয়ন্ত্রিত সঙ্কল্প (decision) ব্যবহার করি। ইংরাজী পরিভাষা প্রয়োগ করে বলতে

১ শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। কঠ, ১।২।২

পারি যে, 'choosing' ও 'deciding' দুটি স্বতন্ত্র, বিভিন্ন প্রকারের কর্ম এবং 'choosing' বা নির্বাচনকালে আমরা অভ্যাস (যেমন অ্যারিস্টটল বলেন) অথবা উপযোগিতা ইত্যাদির দ্বারা পরিচালিত হতে পারি। কিন্তু কেন আমরা অভ্যস্ত হতে রাজী হই, কিম্বা কোন উপযোগিতাকে কেন তুলনামূলকভাবে বেশী মূল্য দিই এর একমাত্র উত্তর deciding' বা নৈতিক সঙ্কল্প। এই নৈতিক সংকল্পজ্ঞাপক বাক্যের যদি কোন রূপ দেখাতে বলা হয়, তাহলে আমরা বলব যে, তার রূপ নিম্নপ্রকার: 'কিন্তু আমার মনে হয় . . .।' 'আমার মনে হওয়া' অপরের কাছে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য হতে পারে, কিন্তু তা সত্য কি অযথার্থ এ-বিষয়ে কোন তর্ক উত্থাপন করা যায় না। নৈতিক নির্বাচনের যাথার্থ্য দেখান সম্ভব নানা প্রকার নির্বাচন-বহির্ভূত তথ্যের সাহায্যে। পক্ষান্তরে, সেই তথ্যগুলি কেন আমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রতিভাত হয়েছে তার কারণ দেখান যায় না, একমাত্র নৈতিক সংকল্পকে নির্দেশ করা ব্যতীত। যদি কারণ দেখান যায়, তাহলে সেই কারণেরও যাথার্থ্য সম্বন্ধে অনুরূপ প্রশ্ন তোলা সম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে যুক্তি প্রতীপ-গতি (regress) প্রাপ্ত হয়। আর এই সঙ্গে উল্লেখ্য যে, নৈতিক সংকল্প শ্রেয়জ্ঞাপক, তাই নৈতিক নির্বাচন-জনক।

এখন আমরা লক্ষ করব যে, শ্রেয় চৈতন্য ও সত্তা চৈতন্য মূলত একই চৈতন্য; কারণ আমাদের বিশ্লেষণ অনুসারে উভয় ক্ষেত্রেই একই সামান্য ধর্ম বর্তমান। শ্রেয় চৈতন্য তাই সত্তা চৈতন্যেরই প্রকাশক, এবং যে বাক্যে চরমতমরূপে শ্রেয় চৈতন্য বিঘোষিত হয় তা বিশুদ্ধ সত্তা জ্ঞাপক বাক্য: 'আমি আছি'—এই বাক্যে আমিত্বে অস্তিত্ব আরোপ করা হচ্ছে না; 'আমি' উদ্দেশ্য বা 'আছি' বিধেয় নয়; এবং 'আছি' 'আমি'র অন্যান্য বিশেষণাবলীর মধ্যে একটি, একথাও ঐ বাক্যের নিহিতার্থ নয়। কেবল প্রচলিত বাগ্বিধি বা usage অনুযায়ী উদ্দেশ্য-বিধেয়-সম্পন্ন বাক্যে উপরোক্ত চৈতন্য প্রকাশিত। 'আমি আছি' বাক্যটি অন্যের অস্তিত্বজ্ঞাপক 'সে আছে' বাক্যের সমপর্যায়ের নয়। এই বাক্যটি দেখতে 'পদ্মটি সাদা', 'আকাশ নীল', 'গাছ আছে', 'পাখি আছে', 'সে আছে' ইত্যাদির মতো হলেও প্রকৃতপক্ষে বাক্যটি বক্তার সত্তা চৈতন্যের জ্ঞাপক ও গভীর বোধের শব্দগত প্রকাশ। তর্কশাস্ত্রে উল্লিখিত বাক্যের কোন লক্ষণই এই বাক্যে নেই। তা হলে কি ধরণের বাক্য?

উত্তর দেওয়ার পূর্বে অন্য একটি বাক্যকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করা যাক: 'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবন খানি। তখন তারে জানি।' গানে এমন কি গুণ বর্তমান যার মধ্য দিয়ে কোন বস্তুকে দেখা যায়? কাচের মধ্য দিয়ে ভুবনকে দেখা যায় সত্য, কিন্তু গানের ভিতর দিয়ে দেখা, কী রকম দেখা? বাক্যটির বক্তাকে উপরোক্ত কথা বলা বৃথা। এমন মনে করার কোন কারণ নেই যে, তিনি উক্ত তথ্যগুলি জানেন না। আর এমন ভাবার কারণ নেই যে, উক্ত তথ্য দ্বারা উপরোক্ত বাক্যটির মিথ্যাত্ব প্রমাণ করা যায়। লক্ষ করার বিষয় এই যে, বাক্যটিতে প্রমা, প্রমেয় ও প্রমাণেরও উল্লেখ আছে। এর অর্থ কী? কাচের ভিতর দিয়ে ভুবন দেখার কথা সত্য হলেও, গানের

ভিতর দিয়ে ভুবন দেখা মিথ্যা নয়, এবং গানের ভিতর দিয়ে ভুবন দেখা কোন অভিজ্ঞতার সম্বন্ধে বর্ণনাত্মক বাক্য নয় বলেই, তার সত্য স্বতন্ত্র। একটি অপরটির বাধক নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতার জগতের সাক্ষ্যে আমরা জানি যে, 'কাচের ভিতর দিয়ে ভুবন দেখা' সত্য হলে 'টেবিলের ভিতর দিয়ে ভুবন দেখা' মিথ্যা। অর্থাৎ, একটি অভিজ্ঞতালব্ধ বাক্যের (যার সত্যাসত্য অভিজ্ঞতা দ্বারাই নির্ধারিত হয়) দ্বারা অপর একটি বা একাধিক অভিজ্ঞতালব্ধ বাক্য সম্বন্ধিত হতে পারে। কিন্তু, যে বাক্য অভিজ্ঞতালব্ধ নয় তা দ্বারা কোন অভিজ্ঞতালব্ধ বাক্য সম্বন্ধিত হতে পারে না। আধুনিক তর্কশাস্ত্রের ভাষায় বলা যায় যে, দুটি বাক্য সত্যমূল্যের দিক থেকে অনন্য-স্বতন্ত্র বা independent অনন্য-পরতন্ত্র বা equivalent নয়। এই কথা মনে রেখে আমরা বলব যে, 'আমি আছি' বা 'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবন খানি' ইত্যাদি বাক্য শ্রেয়-বিচারমূলক বাক্য বা value judgment.

এবারে আমরা দুভাবে আমাদের বক্তব্যকে কিঞ্চিৎ গুছিয়ে নিতে পারি: (১) সত্তা-চৈতন্যই 'বর্ণাননেকান্' হয়ে শ্রেয় চৈতন্যরূপে প্রকাশ পায়, যার প্রমাণ এই যে, উভয় চৈতন্যই একবিধ সামান্য লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত। অন্য কথায়, শ্রেয় চৈতন্য সত্তাচৈতন্যেরই প্রকাশ। তাই সত্তার মুক্ত স্বরূপ শ্রেয়চৈতন্যে ও তজ্জাত শ্রেয় সাধনায় প্রকাশিত হয় দেশকালাতীত এবং কার্য-কারণোত্তীর্ণ সৃজনশীল কর্মে। উপরোক্ত কারণে অস্তিত্বজ্ঞাপক 'আমি আছি' শ্রেয় চৈতন্যের রূপনির্দেশক (paradigm) বাক্য, এবং এর কারণ এই যে, সত্তাই চরমতম শ্রেয়। অন্যদিক থেকে বলা যায় যে, সৃজনশীলতাই যথার্থ অস্তিত্ব। (২) শ্রেয়-চেতনা যখন আমাদের আবিষ্ট করে তখন কর্ম সৃজনশীল হয়ে ওঠে ও পরিণামে আমাদের সত্তা-চৈতন্য গভীরভাবে আমাদের জগতের তথ্যসমাহারের ঊর্ধে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। এই সত্তা-চৈতন্যে উদ্ভাসিত যে 'দার্শনিক আমি' তাকে কদাপি প্রমেয়রূপে উপস্থাপিত করা যায় না, সেই বলা যায় যে, 'দার্শনিক আমি' নেই কারণ, সে সর্বদাই প্রমাতা, এবং প্রমাতৃ-চৈতন্য শ্রেয়-চৈতন্যকে আশ্রয় করেই বিকশিত হয়ে ওঠে। কাচের ভিতর দিয়ে ভুবনের তথ্যরাজির সঙ্গে পরিচিত হলাম, কিন্তু গানের ভিতর দিয়েই ভুবনকে জানলাম। এই জানাতেই আনন্দ। কারণ, এ ক্ষেত্রে জ্ঞেয়বস্তু নীরস তথ্য নয়, যাকে একটি বা একাধিক বিবৃতি-বাক্য দ্বারা নিঃশেষে নির্ধারণ করা যায়। জ্ঞেয়বস্তু এ ক্ষেত্রে শ্রেয়, তাকে জানার সঙ্গে নিজেকেই পাচ্ছি আরও নিবিড়ভাবে, তাই আনন্দ। এই জন্য শ্রেয়-চৈতন্য যে বাক্যে প্রকাশ পায় তাকে বলি আকৃতিবাক্য, যে বাক্যে তথ্য নূতন আলোকে দীপ্যমান— "ধূলায় ধূলায় জাগে পরম বাণী"; আর বক্তার সত্তা-চৈতন্য অন্তহীন বিস্ময়বোধে জারিত হয়ে প্রকাশিত—"That I exist is a perpetual surprise which is life"। রসোবৈ সঃ।

রবীন্দ্রনাথের মতানুসারে শ্রেয় সাধনা সত্তা উপলব্ধির সহায়ক এবং ধর্মসাধনার নামান্তর। সত্তার উপলব্ধি বা আত্মোপলব্ধির জন্য এক ব্যাকুলতা মানুষের গভীরে

বর্তমান। সেই ব্যাকুলতার ফলশ্রুতি মানুষের শ্রেয়বোধ। সত্তার ধর্ম প্রকাশ, কারণ, এই সত্তা নির্গুণ, নির্বিশেষ অস্তিত্বমাত্র নয়—ভারতীয় অদ্বৈত দর্শনে যাকে 'সৎ' বলে অভিহিত করা হয়। মানুষের সত্তা প্রকাশধর্মী বলেই শ্রেয় চৈতন্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সত্তার প্রকাশ কামনাই মানুষের ধর্ম, যার বিচিত্ররূপ আমরা দেখি মানুষের বিভিন্ন সাধনায় —তার সভ্যতায়, তার ইতিহাসে, তার আত্মত্যাগে, তার দুর্গমতার অভিযানে, আর তার অশেষবিধ সৃজনশীল কর্মপ্রয়াসে। এই সত্তা ছান্দোগ্য উপনিষদ কথিত ভূমার সাদৃশ্য 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ শ্রেয়বোধ সত্তার বিভূতি। মানুষের ধর্ম সৃজনশীল কর্মপ্রয়াসের দ্বারা সত্তার অনন্ত সম্ভাবনার বৈচিত্র্যের উপলব্ধি এবং প্রকাশের সাধনা, ও তার ইতিহাস। এর জন্য প্রয়োজন 'to realise that to live as a man is great, requiring profound philosophy for its ideal, poetry for its expression heroism in its conduct'।[২] এর তাৎপর্য হল যে মানষের সত্তার প্রকাশের তাগিদেই মানুষ শ্রেয়কে সৃষ্টি করে। তাই তার ধর্ম এবং সেই সৃষ্ট শ্রেয় মানুষের ইতিহাসে ঈশ্বর, সৌন্দর্য ও মঙ্গলের ধারণায় রূপ লাভ করেছে।

প্রশ্ন করা যায় যে, উপরোক্ত বিবরণ কী প্রকারের বিবরণ? আমরা উত্তর দেব যে, এই বিবরণ নিঃসংশয়ে ভাববাদী দার্শনিক বিবরণ। কারণ, এই বিবরণে মানুষের সম্বন্ধে এমন এক প্রকার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে সিদ্ধান্তের সত্যতা ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার নিরিখে স্থির করা যাবে না। বিজ্ঞানে, যথা মনোবিজ্ঞানে আমরা একপ্রকার সিদ্ধান্তবাক্যের সাক্ষাৎ পাই, যার সত্যতা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্থির করতে পারি। তার কারণ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অভিজ্ঞতা-সিদ্ধ বাক্য ও ইন্দ্রিয়জ তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত। কিন্তু যে সিদ্ধান্ত আকৃতিবাক্যাবলীর নিগমন, এবং যে আকৃতিবাক্যসমূহ অনুভূত তত্ত্বের প্রকাশক, সেই সিদ্ধান্ত অপর কোন উপায়ে পরীক্ষিত হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে আমরা অন্যতর যাথার্থ্য-প্রমাণ প্রয়োগ করব। যথা, যে শ্রেয়বোধ ও সৃজনশীল কর্ম প্রণোদনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উপরোক্ত তত্ত্বাবতারণা করা হল তা সুসমঞ্জস কিনা তাই বিচার্য, এবং উক্ত বোধ ও কর্ম-কাণ্ডকে ঐ তত্ত্ব কী পরিমাণে তৃপ্তিকর রূপে ব্যাখ্যা করে তাই লক্ষণীয়। আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ যে দার্শনিক মতবাদ (system) প্রস্তাব করেছেন তার মূল কথা সামঞ্জস্য, যার প্রধান লক্ষণ একটি দার্শনিক অনুভূতি। তাই বলা উচিত যে, এক্ষেত্রে এই দার্শনিক মতবাদের যাথার্থ্য তার সৌষ্ঠব-মূল্যে। এমনকি,. যে পূর্বপক্ষ এই মতবাদ ত্যাগ করে (কারণ, আধুনিক দর্শনে এই প্রকার কোন মতবাদকে খণ্ডন করা যায় না। দ্রষ্টব্য Lazerowitz প্রণীত The *Structure of Metaphysics* গ্রন্থের The Nature of Metaphysics নিবন্ধ) অপর কোন মতবাদ গ্রহণে ইচ্ছুক, তাঁদের এই দুটি মতবাদের মধ্য থেকে তদীয় মতবাদকে বরণ করার মানদণ্ড শেষ পর্যন্ত নান্দনিক। (পুনরায় Lazerowitz প্রণীত পূর্বোক্ত গ্রন্থে: "people, in part, are drawn to philosophy for . . . a

২ *Creative Unity*, p. 183

temperamental reason)। আরও এ কথাও স্মরণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ যে-মানুষের কথা বলেছেন সে দেশ-কালে ও কার্য-কারণ শৃঙ্খলায় বদ্ধ ও নির্ধারিত মানুষ নয়। সে মানুষ 'universal man' সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। আমরা স্বীকার করতে ইচ্ছুক যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের সত্তা, তার প্রকাশধর্মিতা ও শ্রেয়বোধ-জাত সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের প্রস্তাবে আকৃতিবাক্যসমূহের সমবায়ে যে দার্শনিক যথাক্রম উপস্থাপিত করেছেন তা বিন্যাসে সুসমঞ্জস ও আবেদনে তৃপ্তিকর।

সত্তা প্রকাশধর্মী। কিন্তু তার প্রকাশ কোন ভূমিকা গ্রহণ করে? আমরা পূর্বে দেখেছি যে, সত্তাজ্ঞাপক বাক্যের রূপনিদর্শন (paradigm) 'আমি আছি'। যে সত্তাকে 'আমি' শব্দ দ্বারা আমরা নির্দেশ করি তার বোধ কি প্রকার? আমার হর্ষ, বেদনা, সুখ, দুঃখ—এক কথায় আমার যাবতীয় অভিজ্ঞতাকে 'আমার' বলি কী উপায়ে? প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় এটি অতি বিতর্কিত প্রশ্ন। ছান্দোগ্য উপনিষদের 'ইন্দ্র-বিরোচন-প্রজাপতি সংবাদ' ও ইংরাজ দার্শনিক হিউমের সিদ্ধান্ত বিপরীত ধর্মী হলেও একই মূল সমস্যার প্রকারান্তর। কান্ট ও সাম্প্রতিক কালে ভিট্‌গেনস্টাইন থেকে স্ট্রসন পর্যন্ত এই দার্শনিক সমস্যা, 'persons'-সংক্রান্ত সমস্যা অভিধায় প্রচারিত হয়েছে। 'ক', 'খ' ও 'গ' যদি তিনটি অভিজ্ঞতা হয়, তা হলে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি যে, 'ক', 'খ' ও 'গ' কার অভিজ্ঞতা? আমরা নানা প্রকার অভিজ্ঞতাকে নিজেদের প্রতি বিধেয়রূপে আরোপ করে থাকি। এই ধরনের মতবাদ সাধারণ্যে প্রচলিত আছে যাকে বলা যায় বেওয়ারিশবাদ বা no-ownership theory। কিন্তু এই মতবাদ সর্বার্থসাধক নয় এই কারণে যে, আমরা নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক অভিজ্ঞতা অপরের ক্ষেত্রেও বিধেয়রূপে আরোপ করি। তার কী ব্যাখ্যা দেব? অভিজ্ঞতা মাত্রই ব্যক্তিগত (private) এ কথা মানলে 'আমি কাতর'—এই বাক্যের তাৎপর্য বুঝি—কিন্তু 'সে কাতর'—এই বাক্যের যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য কী যদি না অন্যদেরও আমার মত (of the same logical type) অভিজ্ঞতা-আরোপী বাক্যের উদ্দেশ্যরূপে স্বীকার না করি। উপরোক্ত সমস্যার সমাধান-কল্পে স্ট্রসন বিধেয় শব্দাবলীকে দুভাগে ভাগ করেছেন, যার একভাগে আছে সেই সব শব্দাবলী যা নানাবিধ হওয়া সত্ত্বেও, কেবল 'persons'-এর ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ এই শ্রেণীর বিধেয়গুলি আত্মবাচ্য ও পরবাচ্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়। এই বিশেষ শ্রেণীর বিধেয় শব্দাবলী দ্বারা আমরা বিবিধ চিত্তবৃত্তি এবং বিভিন্ন শারীরলক্ষণ 'persons' এর প্রতি আরোপ করি। কিন্তু 'persons' কী? স্পষ্টতই persons কোন প্রাণ-স্পন্দিত শারীরবৃত্ত (animated body) নয়। বরং ন্যায়গত ভাবে (logically prior) ব্যক্তি চেতনার পূর্ববর্তী—কিন্তু এই সমাধান ভাষাগত এবং হিউম যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন সেই পদ্ধতিতেও সমাধান প্রাপ্তব্য নয়, সেই প্রস্তাবও পাওয়া গেল। সেই দিক থেকে ভিট্‌গেনস্টাইন যে বলেছেন যে 'দার্শনিক আমি' পৃথিবীর সীমা, পার্থিব কোন বস্তুপুঞ্জে তার সন্ধান পাওয়া যাবে না,—এই ভাবগম্ভীর উক্তি আরও সার্থকতর ব্যঞ্জনাবাহী।

উপরোক্ত কিঞ্চিৎ পরিভাষা-বিড়ম্বিত আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল হল এটাই দেখান যে, রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং তাঁর সমাধান ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক হলেও সাম্প্রতিক দার্শনিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য আছে। যথা, রবীন্দ্রনাথেরও মতে 'দার্শনিক আমি' (১) পৃথিবীর সীমা—পার্থিব অর্থে অসৎ; (২) তাকে প্রাণস্পন্দিত, শারীর-বৃত্ত বলা যায় না; (৩) ব্যক্তিচেতনার তুলনায় 'দার্শনিক আমি' ন্যায়গত ভাবে পূর্ববর্তী; এবং (৪) সমস্যার মূল প্রশ্ন একই: অভিজ্ঞতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে কোথায়? এই অভিজ্ঞতারাজি কার? একদা রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যার সমাধান পেয়েছিলেন তাঁর 'জীবন দেবতা' ধারণায়, পরবর্তী কালে আমরা তাঁর দার্শনিক আলোচনার নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য পাই:

> "What I mean by personality is a self-conscious principle of transcendental unity within man which comprehends all the details of facts that are individually his in knowledge and feeling, wish and will and work.[৩]

কান্ট যাকে বলেছেন 'Transcendental unity of Consciousness' রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন 'পার্সেন্যালিটি' বা মানব-ব্যক্তিত্ব, "আমি আমার এই আশ্চর্য অস্তিত্বের অধিকার কেমন করিয়া রক্ষা করিতেছি?"[৪] "আমার অন্তর্নিহিত . . . সৃজনীশক্তির" দ্বারা, "যে শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখকে সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান, তাৎপর্য দান করিতেছে।"[৫] অন্যভাবে বলা যায়, গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে আত্মস্বরূপ আবিষ্কার করা বা সত্তা-চৈতন্যে আরূঢ় হওয়াই এই অন্তর্নিহিত সৃজনী শক্তির তাৎপর্য। মানুষই এই দুর্লভ শক্তির অধিকারী, আর সেই জন্যই এই আবিষ্কার মানুষের ধর্মের প্রথম প্রস্থান-ভূমি। "মানুষের আর একটি প্রাণ আছে, সেটা শরীর প্রাণের চেয়ে বড়—সেইটে তার মনুষ্যত্ব। এই প্রাণের ভিতরকার সৃজনীশক্তিই হচ্ছে তার ধর্ম। . . . মানুষের ধর্মটিই হচ্ছে তার অন্তরতম সত্য।"[৬]

এই অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তির মাহাত্ম্যে মানুষ তার ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ও বহুত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য ও ঐক্য লাভ করে। এই সামঞ্জস্য ও ঐক্য আমাদের সকল অভিজ্ঞতার সম্ভাবনার পূর্ব মীমাংসা। আমাদের জ্ঞানক্রিয়ার অনুষঙ্গী হয়ে যদি এই সৃজনীশক্তি না থাকত তাহলে আমরা বিদ্রোহী অরাজক সংবেদনার রাজ্যে পথভ্রান্ত হয়ে পড়তাম। কিন্তু, এই সৃজনীশক্তি, যার প্রধান তত্ত্ব হল সামঞ্জস্য, আমাদের ব্যক্তিচেতনাকে সুবিন্যস্ত করে তাকে এক সুগভীর তৃপ্তিকর তাৎপর্য দান করে। তাই মানুষ জ্ঞানে, কর্মে ও অনুভবে সর্বত্রই সামঞ্জস্য প্রয়াসী। এই অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তি মানুষের 'বিশ্বরূপ'।

৩ *Religion of Man*, p. 119
৪ আত্মপরিচয় / র. র. / শ. সং / ১০ম খণ্ড / পৃঃ ১৭৩
৫ ঐ, পৃঃ ১৭২
৬ ঐ, পৃঃ ১৮৫।

"মনুষের এক প্রান্তে তার বিশ্ব, অন্য প্রান্তে আর বিশেষত্ব। এই দুই দিয়ে তার সম্পূর্ণতা, তার আনন্দ।"[৭]

উপরোক্ত দার্শনিক আলোচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বাধর্ম্য লক্ষণীয়। কান্ট দেখিয়েছেন যে, আত্মচৈতন্য (I think) অভিজ্ঞতার আবশ্যিক সর্ত (necessary condition) এবং উপরোক্ত আত্ম-চৈতন্য অভিজ্ঞতার জগতে অপ্রাপ্য। জ্ঞেয়বস্তুকে জ্ঞানের সামগ্রী হয়ে উঠতে হলে তাকে সামঞ্জস্যস্বরূপ আত্ম-চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, তাই এই আত্ম-চৈতন্য, কোন অভিজ্ঞতালব্ধ পদার্থ নয়, বস্তুত তা 'logical subject' বা প্রান্তিক ধারণা (limiting concept)। রবীন্দ্রনাথ তার আলোচনা শ্রেয়োদর্শনের দিক থেকে করলেও, সিদ্ধান্তে তিনি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের নিকটবর্তী। তিনিও অনুভব করেছেন যে, (ক) অভিজ্ঞতার সম্ভাবনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য অভিজ্ঞতা-অতিক্রান্ত কোন তত্ত্বে পৌঁছান প্রয়োজন। (খ) এই তত্ত্ব মূলত সামঞ্জস্য বিধায়ক। (গ) এই তত্ত্ব তাঁর মতে, কান্ট ও ভিট্‌গেনস্টাইন যেমন বলেছেন, প্রান্তিক ধারণা, এবং এই কারণে পদার্থ নয়। রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, তিনি মুখ্যত শ্রেয়োদর্শনের প্রয়োজনেই এই তত্ত্ব স্বীকার ও প্রয়োগ করেছেন, যা পাশ্চাত্য দার্শনিকরা করেন নি, তাই একে 'সৃজনী' বলেন নি। 'সামঞ্জস্য আমাদের নিতান্তই চাই'।[৮] এখন দেখা যাক রবীন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তায় এই ধারণার ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত এই অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তিই শ্রেয় চৈতন্যের উৎস ও কেন্দ্র। সেই দিক থেকে এটি একটি মৌল ধারণা (primitive)। রবীন্দ্রনাথ মানুষের যে বিশ্বরূপের কথা বলেছেন তার মধ্যে একটি উদ্বৃত্তের ব্যঞ্জনা আছে। সেই উদ্বৃত্ত এর তটস্থ লক্ষণ।[৯] 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।' সৃজনীশক্তির কোন একটি প্রকাশেই ওই উদ্বৃত্ত নিঃশেষিত হয় না।

দ্বিতীয়ত, এই উদ্বৃত্তের লীলা মানুষের শ্রেয় সাধনায় অসমাপিকা। এই উদ্বৃত্ত সৃজনীশক্তির দ্বারা মানুষ তার আদর্শরূপ বা বিশ্বরূপ রচনা করে—এবং এই মনুষ্যত্বের ধারণার কোন পরিমাপ নেই 'দেশে কালে', 'ideally he is limitless';[১০] অপরপক্ষে, দেশে কালে এই বিশ্বরূপকেই মানুষ 'অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়' রূপ দেওয়ার ব্রতে রত। তাহাই মানুষের শ্রেয় চৈতন্যে প্রকাশিত বা মানুষের শ্রেয়-সাধনা। এই শ্রেয় সাধনায় মানুষ নিজেকেই প্রকাশ করেছে। এই আত্মপ্রকাশ এক ক্রমশ বৃহৎ সামঞ্জস্য লাভের প্রয়াস: নিজ অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তির সামঞ্জস্য এবং সেই সামঞ্জস্য

৭ শান্তিনিকেতন, বিশেষত্ব ও বিশ্ব / র. র. / শ. সং / ১২শ খণ্ড, পৃ: ১৩৯,

৮ ঐ, মানুষ / ঐ পৃ: ১৩৫ তু: "Connectedness is of the essence of all things of all type."—Whitehead, *Modes of Thought*, p. 13

৯ 'নিষেধমুখ বৃত্তীনাং', বেদান্ত সংজ্ঞাবলী, ৫৯

১০ 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না'—গীতবিতান

'আছি আমি
এ কথা স্মরিলে মনে মহান বিস্ময়
আকুল করিয়া দেয়, স্তব্ধ এ হৃদয়
প্রকাণ্ড রহস্যভারে'—উৎসর্গ

স্পষ্ট শ্রেয় ধারণার দ্বারা অপর মানুষের ও বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আত্মবোধ থেকে বিশ্ববোধে, স্বার্থ থেকে পরমার্থে উত্তীর্ণ হওয়াই মানুষের ধর্ম—মানুষের অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তির উন্মুক্তই তার প্রবণতা। রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োদর্শন তারই phenomenological বিবরণ। 'মানুষ যতই কর্ম করছে ততই সে আপনার ভিতরকার অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলছে, ততই সে আপনার সুদূরবর্তী অনাগতকে এগিয়ে নিয়ে আসছে। এই উপায়ে মানুষ আপনাকে কেবলই স্পষ্ট করে তুলছে।'[১১] মানুষ 'Angel of Surplus.' এবারে আমরা রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োদর্শনের কয়েকটি প্রধান ধারণা নিয়ে আলোচনা করব।

১১ শান্তিনিকেতন, কর্মযোগ / র র / শ সং / ১২শ খণ্ড / পৃঃ ৩৮৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সৌন্দর্য

মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে সৌন্দর্য তিন প্রকারের হওয়া সম্ভব, যথা (১) শিল্পিতবস্তুর সৌন্দর্য (২) সাহিত্যের সৌন্দর্য ও (৩) প্রাকৃতিক বা নিসর্গ সৌন্দর্য। অর্থাৎ আকৃতি-বাক্য নানাবিধ হতে পারে যার মধ্যে আমরা 'সুন্দর' শব্দটি বিধেয়রূপে প্রয়োগ করি। সেই 'সুন্দর'-বিধেয়-সম্পন্ন বাক্যকুটকে আমরা বিষয়ানুগ প্রয়োগানুযায়ী তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি।

সৌন্দর্য-দর্শনে রবীন্দ্রনাথের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, তিনি, ইংরাজ দার্শনিক মূরের ন্যায় 'সৌন্দর্য' শব্দটিকে গুণবাচক মনে করেন না বলে, সৌন্দর্য বিষয়ক চিন্তা আকৃতি-বাক্যে প্রকাশ করেন ও 'সৌন্দর্য' শব্দের সংজ্ঞা-সম্ভাবনায় বিশ্বাসী নন।[১২] তাঁর রচনায় এমন বাক্যও দেখা যায় যেগুলি প্রত্যক্ষত বিবৃতিবাক্য মনে হলেও মূলত ছদ্মবেশী আকৃতিবাক্য। তদুপরি কিছু এমন বাক্যও আছে যেগুলি বিবরণপ্রয়াসী হলেও ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতালব্ধ কোন তথ্যের বিবৃতি দেয় না, বরং এক ধরনের দার্শনিক উক্তি যার খণ্ডন ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের দ্বারা অসম্ভব, কিন্তু মতবাদে প্রযুক্ত বক্তব্য বিন্যাসের সামঞ্জস্যে যার যাথার্থ্য ধরা পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ইংরাজী 'art' শব্দের সমার্থকরূপে 'সাহিত্য' শব্দ এবং 'সৌন্দর্য' ও 'সাহিত্য' একার্থকরূপে ব্যবহার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-দর্শন প্রধানত ও মূলত সৌন্দর্য এবং সাহিত্য ব্যাপারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা। 'শিল্পবস্তু কী?'—ইত্যাদি প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেন নি। তাঁর ব্যাখ্যার প্রতিপাদ্য 'আত্মসংস্কৃতির্বাব' মানুষের সৌন্দর্য সাধনা। ইন্দ্রিয়গম্য যে শিল্পবস্তু তার বিশেষ প্রকারগুলি সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন নি তা নয়, তবে তা মুখ্যত চিত্রকলা,

১২। (ক) দ্রঃ *Personality* গ্রন্থের 'What is Art' প্রবন্ধ। "Definition of a thing which has a lifegrowth is really limiting one's own vision in order to be able to see clearly. And clearness is not necessarily the only, or the most important, aspect of a truth. . . . Therefore I shall not define Art" p. 6-7.

(খ) সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মুখ্যত সাহিত্য-বিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে। তার জাতিকুল নিয়ে নয়। অবশ্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিংবা তাত্ত্বিক বিচার হতে পারে। সে রকম বিচারে শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই। —সাহিত্যের পথে, র. র / শ. সং / ১৪শ খণ্ড / পৃঃ ৩৪১

(গ) সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত। শ্রেণীগত নয়। এখানে 'ব্যক্তি' শব্দটিতে তার ধাতুমূলক অর্থের উপরই জোর দিতে চাই। স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে উঠেছে তাই ব্যক্তি। —সাহিত্যের পথে, র. র. / শ. সং / ১৪শ খণ্ড / পৃঃ ৩৩৬

সংগীত, কবিতা ও নাটক-এর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। অপরাপর শিল্পকলা, যথা ভাস্কর্য, স্থাপত্য ইত্যাদির আলোচনা আমরা তাঁর সৌন্দর্য-দর্শন সংক্রান্ত রচনায় পাই না। আবার ইতিহাসকে তিনি যে-দৃষ্টিতে দেখতেন, সেই কারণে তাঁর আলোচনায় শিল্পের ইতিহাস অপেক্ষা, শিল্পের দার্শনিক তাৎপর্যই প্রধান আলোচ্য বিষয়। শেষে আমরা ভুলবো না যে, 'সৌন্দর্য' রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্তা, উদ্বৃত্ত, সামঞ্জস্য ইত্যাদির সমার্থক মৌল ধারণা এবং তাঁর শ্রেয়োদর্শনে এই ধারণাটির গুরুত্ব বোধকরি সর্বাধিক।[১৩]

"উদাসীনের নিকট একটা তৃণে কোন আনন্দ নাই; তৃণ তাহার নিকট তুচ্ছ, তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত হীন। কিন্তু উদ্ভিদ্‌বেত্তার নিকট তৃণের মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ আছে, কারণ তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ব্যাপক, উদ্ভিদপর্যায়ের মধ্যে তৃণের সত্য যে ক্ষুদ্র নহে তাহা সে জানে। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দ্বারা তৃণকে দেখিতে জানে তৃণের মধ্যে তাহার আনন্দ আরও পরিপূর্ণ—প্রতিবিম্বিত।"[১৪] এই প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিতে আমরা তিনটি মূল্যবান ভিত্তিতত্ত্ব পাচ্ছি: (ক) উদাসীনের নিকট তৃণের প্রকাশ ক্ষীণ বলে তৃণে তার কোন আনন্দ নেই। (খ) বৈজ্ঞানিকের নিকট তৃণের সত্য তার জাতিত্বের প্রতিনিধিত্বে[১৫] এবং তার সত্যতা স্বাশ্রয়ী নয়, পরাশ্রয়ী। (গ) অধ্যাত্ম-দৃষ্টির অধিকারীর কাছে তৃণ ভূমাস্বরূপ হয়ে ওঠে। তথ্য মাত্র নয়, সে 'সুন্দর'। রবীন্দ্রনাথের মতে শেষোক্ত দৃষ্টিই সৌন্দর্য-দৃষ্টি। উদাসীনের দৃষ্টিতে তৃণের 'ব্যক্তিত্ব-হারা অস্তিত্ব'কে রবীন্দ্রনাথ অনস্তিত্বের সামিল মনে করেন। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে তৃণ তথ্যরূপেই মূল্যবান, দ্রষ্টার অনুভূতিকে সে কোন প্রকারে রঞ্জিত করে না। অনস্তিত্বের পর্যায়ভুক্ত না হলেও বিশেষ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রয়োজনের দ্বারা তার প্রয়োজনাতিরিক্ত তাৎপর্য সীমিত। পক্ষান্তরে, সৌন্দর্যদৃষ্টিতে বস্তুর ওপর থেকে সাম্প্রতের আবরণ সরে যায়, তা এমন এক আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে দেখা দেয় যে আলোক সম্বন্ধে বলা যায় "that was never on sea or land" এবং দ্রষ্টার চেতনা সুন্দর বস্তুতে একটি গভীর সৌষম্য আবিষ্কার করে নিজের সত্তার গভীরে এক হ্লাদৈক রসের আস্বাদনে আনন্দিত হয়।[১৬] মানুষের আত্মসৃজন পদ্ধতিই সাহিত্যের পদ্ধতি।

আমরা বলতে পারি যে, সৌন্দর্য-বিচার আপেক্ষিক। বিবৃতিবাক্যে যেমন সর্বদাই

১৩। রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্য মঙ্গল সাধনার বস্তু, তাহাদের প্রেমের, সৌন্দর্যের দিক দিয়া। সত্যের সত্যতার জন্য তিনি সত্যের ততখানি উপাসক নহেন, মঙ্গলের মাঙ্গল্যের জন্যও তিনি মঙ্গলের পূজারী নহেন। কিন্তু সত্যকার সত্য আবার সত্যসত্যই সুন্দর; পরম মঙ্গল আবার সুন্দর। সুন্দর বলিয়াই সত্য ও মঙ্গল তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে। —নলিনীকান্ত গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৭

১৪। ধর্ম, উৎসব / র. র. / শ. সং / ১২শ খণ্ড / পৃঃ ৬

১৫। 'শ্রেণীগত সত্য' —সাহিত্যের পথে ঐ / ১৪শ খণ্ড / পৃঃ ৩১৬

১৬। রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার করে তাকে অনির্বচনীয়ভাবে অতিক্রম করে। রসপদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব করে না। এখানে তার প্রকাশ আর আমার প্রকাশ একই কথা। —সাহিত্যের পথে ঐ / পৃঃ ৩৫৫

অনুষঙ্গী আত্মচেতনা সূচিত হয়, তেমনিই সৌন্দর্য পরিগ্রহ ও বিচার, সত্তাচৈতন্য জাত 'আমি আনন্দিত'—এই বোধের দ্বারা ওতপ্রোত। অর্থাৎ, সৌন্দর্য-বিচার বাক্যে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সামঞ্জস্যের সাক্ষ্য প্রকাশ পায়। "গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'। সুন্দর হল সে।" কিন্তু এই আপেক্ষিকতার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে দুটি প্রতিভূ-বাক্যের সাহায্য নেওয়া যাক:

(১) "আত্মার কার্য আত্মীয়তা করা"

(২) "সৌন্দর্য আত্মার সহিত জড়ের মাঝখানে সেতু"

সত্তার যে অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তির মাহাত্ম্যে আমাদের অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হয়, সেই শক্তির বলেই আমরা অন্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যের প্রয়াসী। যে প্রতিক্রিয়ায় আমরা বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্বে উপনীত হই, মানুষের ব্যক্তিত্বে যে উদ্বৃত্ত সক্রিয়, তার ফলেই মানুষ 'সুদূরের পিয়াসী'। আমরা তখনই বেদনা বোধ করি যখন আমাদের সহজাত সামঞ্জস্যর বোধ বাধিত হয়। যেমন, কোন প্রত্যঙ্গ অসুস্থ হলে শরীরের অপরাপর অঙ্গের সঙ্গে সামঞ্জস্য হারায় ও বেদনার কারণ হয়, তেমনই আমরা ব্যক্তিসীমাতে বদ্ধ হলে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের ঐক্যানুভূতি ব্যাহত হয়, এবং পরিণামে এক আধ্যাত্মিক দুঃখ আমাদের বিচলিত করে। এই দুঃখ-জিজ্ঞাসার উত্তর সত্তার উদ্বৃত্তের অসীমমুখীনতায় আত্মোপলব্ধির তাগিদেই।[১৭] মানুষের শ্রেয় সাধনায় তার মানব-ব্যক্তিত্বের সীমার অন্তহীন প্রসারণের প্রয়াস। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে প্রাত্য- হিকের পরিচিত তথা তার অতিপরিচয়ের আবরণ উন্মোচন করে 'সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে'।

কিন্তু মানুষ তথ্যকে 'অনির্বচনীয় ভাবে অতিক্রম' করে কি উপায়ে? রবীন্দ্রনাথের মতে দু উপায়ে তা সম্ভব হয়। জ্ঞানে এবং লীলায় (Imagination)।[১৮] বিশুদ্ধ জ্ঞানে মানুষ তথ্যের নৈরাজ্য থেকে নিয়মের স্বরাজ্যে উত্তীর্ণ হয়। এই নিয়মই মানুষকে প্রকৃতির উপর তার অধিকার বিস্তার করতে শক্তি দেয়, নিয়মের ভূমিকায় মানুষ সমগ্র তথ্যরাজির তত্ত্বকে অধিগত করে। নিয়মকে জানলেই সেই নিয়মের অধিগত সকল তথ্যকে জানা হয়। অ্যারিস্টটল যেমন বলেছেন যে, 'স্বর্ণ'কে জানলে 'স্বর্ণময়' তাবৎ বস্তুকেও জানা যায়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, নিয়মের ভূমিকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তা আধুনিক বিজ্ঞান-দর্শনর সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিস্ময়করভাবে সমধর্মী। গিলবার্ট রাইল (Ryle) বলেছেন যে, নিয়মগুলি হ'ল 'inference ticket'—অর্থাৎ একটি নিয়মের সাহায্যে আমরা উক্ত নিয়মের অন্তর্গত যাবতীয় বস্তুপুঞ্জের ভবিষ্যৎ অবস্থা

১৭। (Art) "has come out of some impulse of expression, which is the impulse of our being itself." —*Personality*. p.7.

১৮। ইংরাজী Imagination শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলা 'কল্পনা' অসার্থক। পাশ্চাত্ত্য সমালোচনায় Imagination শব্দের একটি তত্ত্বগত ভাবে গভীর অর্থ আছে যা 'কল্পনা' শব্দের নেই। দ্রষ্টব্য *The Romantic Imagination* by Sir Maurice Bowra, বিশেষত, প্রথম অধ্যায়।

সম্বন্ধে অনুমান করতে পারি।[১৯] (ভাষাগত ভাবে নিয়মগুলি প্রাকৃতিক ঘটনা ও বস্তুপুঞ্জকে বর্ণনার উপায় মাত্র: "a form of description") এই নিয়মের আবিষ্কারে মানুষের একটি আনন্দ আছে,[২০] শুদ্ধ জ্ঞানের সাধনায় মানুষ এক মুক্তির স্বাদ অনুভব করে। কারণ, "আমাদের মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ আছে। আমরা যা কিছু জানি কোন-না-কোন ঐক্যসূত্রে জানি।"[২১] এবং তাই নিয়মের মধ্যে সেই ঐক্যের সত্যকেই উপলব্ধি করি যে সত্য তার সত্তার নিগূঢ় সামঞ্জস্যপ্রয়াসী চেতনায় সক্রিয়। অর্থাৎ মানুষের সত্তা সামঞ্জস্য বলেই সে জগতে সামঞ্জস্য বা ঐক্য অনুভব ক'রে তৃপ্ত হয় ও মুক্তির আনন্দলাভ করে।[২২] দ্বিতীয় যে প্রকারে মানুষ তথ্যের সংকীর্ণতা উত্তীর্ণ হয়ে 'সত্যের অসীমতায় প্রবেশ করে তার উৎস মানুষের সত্তার উদ্বৃত্তের লীলাবৃত্তিতে। লীলাবৃত্তির পরিণামে আমরা কোন তথ্যকে 'রসের ভূমিকায়' দেখতে সক্ষম হই। দেখা যাক কোন্ তথ্যকে আমরা 'রসের ভূমিকায়' দেখে কিভাবে উত্তীর্ণ হই।

লীলাবৃত্তি "আমাদের রূপসৃষ্টি করবার বৃত্তি, প্রয়োজন সাধনের বৃত্তি নয়।"[২৩] অর্থাৎ প্রয়োজন সাধনের বৃত্তি আমাদের চেতনাকে উদ্দেশ্যমুখীন করে তোলে। সেক্ষেত্রে শ্রেয়ের সন্ধানই করি এবং শ্রেয়-প্রাপ্তিতেই আমাদের তৎকালীন শারীর-পিপাসা তৃপ্ত হয়। কিন্তু মানুষ এমন অনেক কাজই করে যার প্রয়োজন-ধর্মিতার সচরাচর গ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।[২৪] বলা যায়, মানুষের জৈবিক অস্তিত্বকে অতিক্রম করে

১৯। "... Laws of nature express only the forms of regularities ; the burden of our experimental observations is borne, not by them...." Stephen Toulmin, *The Philosophy of Science*, p. 89.
অথবা ভিটগেনস্টাইন যেমন বলেছেন, "The fact that it can be described by Newtonian mechanics tells us nothing about the world" তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ "once you get hold of the laws of gravitation you can dispense with the necessity of collecting facts ad infinitum. You have got at one truth which governs numberless facts."—*Sadhana*, p. 26.

২০। "... discovering of a truth is pure joy to man—it is a liberation of his mind." ঐ p. 26.

২১। সাহিত্যের পথে, র. র. / শ. সং / ১৪শ খণ্ড / পৃ: ৩১২

২২। "A general statement is always the product of an ability of the human mind ; this process may be called induction, inductive guessing, *imagination*. In any case, *it is not logical derivation*." Phillipp Frank, *Philosophy of Science*, p. 22.
রবীন্দ্রনাথের মতের সঙ্গে কান্টের বিখ্যাত 'mind is the law-giver of nature' উক্তির সাধর্ম্য লক্ষণীয়।

২৩। সাহিত্যের পথে পৃ: —৩১২ তুলনীয় "... imagination which is the most distinctly human of all our faculties." *Religion of Man*, p. 54.

২৪। "... the pleasure we indisputably get from a work of art cannot easily be related to our biological needs, especially is this the case with music. It is difficult to understand why, in the struggle of existence, a peculiar sensibility to certain sequences of non-natural sounds should ever have been developed."—G. W. N. Sullivan, *Beethovan*, p. 15.

মানুষের সত্তার উদ্বৃত্ত শ্রেয় চৈতন্যে উদ্বোধিত হয়ে ওঠে। মনুষ্য-সীমানাতেই আমাদের অসীমতার মহিমা আভাসিত। তখন খণ্ড, বিচ্ছিন্ন তথ্য লীলাবৃত্তির উপকরণ-রূপে রসবস্তু হয়ে উঠে আমাদের চেতনায় এমন এক গভীর সৌষম্যের স্বাদ বহন করে আনে যে, রসবস্তুর প্রকাশ ও সত্তার প্রকাশ অদ্বৈত হয়ে যায়। তথ্য তখন সত্য হয়ে ওঠে। তথ্য যে সত্য হয়ে উঠল তার প্রমাণ সত্তার আনন্দানুভূতি, যে অনুভূতিতে মানুষ তার বিশ্বরূপ দেখতে পায় বা তার অস্তিত্বের 'অতিবিশেষ' তাৎপর্য খুঁজে পায়: "a larger meaning of my own self ... the barrier vanished between me and what was beyond myself."[২৫]

এই আত্মবিস্মৃতি সৌন্দর্যবোধেই ঘটে, কারণ বিজ্ঞানে জ্ঞেয় পদার্থই মুখ্য। কিন্তু শিল্পে সত্তাচৈতন্যই প্রধান। বিজ্ঞানে যে মুক্তি তা জ্ঞানের মুক্তি, নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু সৌন্দর্যবোধে যে মুক্তি তা অস্তিত্বের সর্বানুভূতি বা আমাদের সমগ্র মানবব্যক্তিত্বের মুক্তি। বিজ্ঞানে আমরা বিষয় (object) চেতনায় ক্রিয়াশীল, কিন্তু সৌন্দর্যবোধে আমরা 'আত্মক্রীড়'[২৬] ও সৃজনশীল। জ্ঞানের মুক্তিতে আমাদের যে আনন্দ তা আংশিক, কারণ বিজ্ঞান কেবল আমাদের বুদ্ধিকেই তৃপ্তি দেয়, আমরা কেবল বস্তুপুঞ্জের বর্ণনাক্ষম এক ঐক্যের সাক্ষাৎ পাই কিন্তু সেই বস্তুপুঞ্জের সঙ্গে সামঞ্জস্য-সূত্রে সম্বন্ধিত হই না, অথবা কোন তথ্য কদাপি মানবিক অর্থে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে না। পক্ষান্তরে, সৌন্দর্যবোধে সত্য মানবিক।[২৭] মানুষের শ্রেয় চৈতন্যে সুন্দরের আবির্ভাব মানব-ব্যক্তিত্বের প্রকাশক ও আমাদের সমগ্র অস্তিত্বের আনন্দদায়ক, এবং সুন্দর বস্তুর সৃষ্টিতে ও তার সকাশে আমাদের যে অখণ্ড সুষমার বা বৃহৎ ঐক্যানুভূতি জন্মে তা বিজ্ঞানের ঐক্যানুভূতি অপেক্ষা অধিকতর গভীর,[২৮] প্রায় বিশ্বব্যাপী। 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে'। শিল্পে আমরা বিশ্বকে আত্মসাৎ করি ভাবের দিক থেকে। ভাবের দিক থেকে বিশ্বকে যে আত্মসাৎ করব তা

২৫। *Religion of Man*, p. 99. এবং "... beauty carries an eternal assurance of our spiritual relationship to reality"— ঐ p. 108 পুনরায় "Reality, in all its manifestations, reveals itself in the emotional and imaginative background of our mind. We know it, not because we can think of it, but because we directly feel it."— ঐ p. 130. Whitehead এর মতে দার্শনিক "always assaulting the boundaries of finitude.—*Modes of Thought* p. 234.

২৬। ছান্দোগ্য, ৭।২৫।২ ক্রীড়া বাহ্য-বস্তু-সাপেক্ষ

২৭। 'Reality is human'—*Religion o/ Man*, p. 134. এবং "Truth is the infinite pursued by Metaphysics ; fact is the infinite pursued by science, while reality is the definition of the infinite which relates truth to the person."— ঐ p. 134.

২৮। "... music is the one incorporeal entrance into the higher world of knowledge which comprehends mankind" শ্রীমতী এলিজাবেথ ব্রেনটানোর গোটেকে লিখিত পত্রে বিটোফেনের কথোপকথন। পত্রটি সুলিভানের *Beethvan* গ্রন্থে উদ্ধৃত। তৎপরে মন্তব্য —"Beethovan regarded art as a way of communicating knowledge about Reality. Beethovan was a firm believer in what Mr. I. A. Richards calls the 'revelation theory' of art" p.p. 11-12.

একদিকে যেমন আত্মসৃজন আবার অন্যদিকে প্রাকৃতিক পৃথিবীর আপন প্রেম বোধানুযায়ী মানবীকরণ। এই দুয়ে মিলে সৃষ্টি। "সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল উৎসারিত হয়ে কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না। ...কবি এবং গুণীদের কাজই এই যে, যারা ভুলে আছে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া যে, জগৎটা আমার, ওটা রেডিও-চাঞ্চল্য মাত্র নয়।"[২৯]

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের আরো একটি লক্ষণ উল্লেখ করেছেন তা হলো: 'নবীনতা'। স্রষ্টার প্রতিভার বলেই প্রাত্যহিক অভ্যাসের জড়তা উন্মোচিত হয় এবং আমরা শিল্পসৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে এক নব আবিষ্কারের আনন্দ উপলব্ধি করি। শিল্পে রূপের স্পষ্টতায় শিল্পীর মুক্তি। আর এর জন্য প্রয়োজন অনুভূতির এবং রচনার বিশেষত্ব। 'অতি-পরিচয়ের ম্লানতার মধ্যেই চিরবিশেষের উজ্জ্বলরূপ দেখতে পারে যে গুণী সেই তো গুণী।' পাশ্চাত্যজগতে এডিসন নবীনতাকে (novelty) মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের সমতুল্য আহ্লাদজনক বলে মনে করতেন। নবীনতাকে হয় নান্দনিক আনন্দের necessary condition (আবশ্যিক সর্ত) অথবা সৌন্দর্য অভিজ্ঞতার necessary consequence (আবশ্যিক পরিণাম) বলে ধরা যেতে পারে। কোন বস্তুর সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে হলে সেই বস্তুর নান্দনিক গুণাবলীর, যথা সমগ্রের সঙ্গে অংশের সম্বন্ধ ইত্যাদির প্রতি মনঃসংযোগ প্রয়োজন। সাধারণ সম্ভাব্য উপযোগিতা-দৃষ্টির পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় এবং সেই বস্তুর শ্রেণীগত মূল্য বিস্মরণযোগ্য। Pepper বলেছেন 'the tearing off of habit' এই ধারণাটি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের যে ধারণা দিয়ে শিল্পবস্তুকে ব্যাখ্যা করা হয় তার পরিপূরক। রবীন্দ্রনাথের নিজের ক্ষেত্রে এর উদাহরণ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র অভিজ্ঞতা। নবীনতার আস্বাদে একটি চমৎকারিত্ব বর্তমান—যা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার চমক বা fashion থেকে পৃথক। শেষোক্ত চমৎকার অতিপরিচয়ে ম্লান হয়ে তার আকর্ষণ হারায়, কিন্তু শিল্পের চমৎকারিত্ব চিরায়ত। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন 'চির-নবীনতা'। তাঁর মতবাদের সত্যতা আমরা বুঝি যখন দেখি যে আধুনিক শিল্প আন্দোলনে abstract expressionism অ্যারিস্টটলীয় এই নীতিকেই মূল্য দিয়েছেন যে নবীনতা প্রচলিত প্রাত্যহিকতার মধ্যে দুষ্প্রাপ্য। শিল্পবস্তুর আঙ্গিকে বৈচিত্র্যের মধ্যে যে অপূর্ব সামঞ্জস্য আছে তার জন্যই বারবার আমরা তার আস্বাদনে নবনবতর ব্যঞ্জনা অনুভব করি। রবীন্দ্রনাথের মতে এইটিই সৃষ্টির রহস্য। নবীনতার প্রত্যাশা সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসার একটি তথ্যগত সত্য। প্লেটো (Theaetetus 1551) ভেবেছিলেন যে মানুষ বিস্ময়ের জন্যই দর্শনচর্চায় আকৃষ্ট হয়। এবং দর্শনে বিস্ময় হারালে শিল্পচর্চায় রত হয়। আবার যা কিছু ভয়ানক তাই বিস্ময়োৎপাদক, তাই বিয়োগান্ত নাটকাবলীর আয়োজন; ভয়ানকের আতিশয্য বাদ দিয়ে যা অদ্ভুত তাহাও বিস্ময়কর, সেই জন্য কৌতুক ও grotesque এর সমাবেশ। যাহা সদ্য বা নূতন তাহাও বিস্ময়-

২৯। সঞ্চয়, আমার জগৎ। প্রসঙ্গত: "মানুষ আপনার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির মধ্যে আপনারই আনন্দময় স্বরূপকে দেখিতে পায়।" —ঐ, রূপ ও অরূপ / র. র. / শ. সং / ১২শ খণ্ড / পৃঃ ৫১৯

জনক, তার প্রমাণ শিল্পীরা অহরহ দিয়ে থাকেন। রোমান্টিকরা ভাবতেন যে, যাবতীয় ঐশ্বরিক প্রকাশই বিস্ময় জাগায় আর শিল্পীর কর্তব্য জগৎকে সেইভাবে উদ্ঘাটন করে দেখানো। সৌন্দর্য-সৃষ্টিকে যখন বিস্মিত চোখে দেখি তখনই আমরা বুঝি যে কাব্য সংসারে 'কবিরেব প্রজাপতি' এবং তাঁর সৃষ্টিতে তাঁরই প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ 'সত্তার চরমতা'কেই নবীনতার কারণরূপে দেখিয়েছেন। যে বস্তুতে আমরা সত্তার চরমতা অনুভব করি, তাই নবীন ও ফলত সুন্দররূপে প্রতিভাত হয়। আর সত্তার চরমতা হ'ল "আপন অংশ-প্রত্যংশের সমাবেশে" যে সুসংগত ঐক্যের প্রকাশ যার জন্য "আমাদের মন একটি পুরো দেখাতে দেখে"। অন্য ভাষায় বলা যায়, সত্তার চরমতা হ'ল বিশুদ্ধ দেখার অহেতুক বিষয়। এখন প্রশ্ন করা যায় যে, একটি স্টীম ইঞ্জিনে কি অংশ-প্রত্যংশের ঐক্য নেই? রবীন্দ্রনাথ বলবেন, আছে। কিন্তু তা প্রয়োজন-ঘটিত ঐক্য। রেলগাড়ীকে যখন স্টেশনে দেখি তখন একরকম, অথচ সেই রেলগাড়ীই খোলা মাঠের মধ্যে অন্যতর অনুভতি জাগায়। আবার রেলগাড়ী প্রতীকের পর্যায়ে উন্নীত হলে তার রূপও বদল হয়, যেমন "এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ী"। প্রয়োজন-ঘটিত ঐক্যে ব্যবহারিক সুবিধা আছে, তা কৌতূহলের বিষয় হতে পারে, কিন্তু "বিশুদ্ধ দেখার অহেতুক বিষয়" হলেই তা নবীন হয়ে ওঠে ও বিস্ময় জাগায়।" "জীবনের পথে চলতে চলতে অগণ্য বস্তুর ভীড়কে আমরা পাশ কাটিয়ে যাই। সুন্দর হঠাৎ বলে ওঠে, 'চেয়ে দেখো'। সে যে নিশ্চিত আছে, এই বার্তাটাই তার সৌন্দর্য আমার কাছে উপস্থিত করলে। সে যে সৎ, এইটে একান্ত উপলব্ধি করতে পারলুম বলেই সে এত আনন্দ দিলে।"[৩০] সুন্দরের অভিজ্ঞতায় "মন বলে ওঠে, নিশ্চিত দেখতে পেলুম—তা সে যাকেই দেখি না কেন, এক টুকরো পাথর, একটা গাধা, একটা কাঁটা গাছ, একজন বুড়ি, যাই হোক। নিশ্চিত দেখতে পাই যেখানেই, সেখানেই অসীমকে স্পর্শ করি, আনন্দিত হয়ে উঠি।"[৩১] নবীনতাকে রবীন্দ্রনাথ সত্তাদর্শনের সঙ্গে যুক্ত করার ফলে, তিনি শিল্পী হিসাবে, ফ্যাসানের তৎকালীন চটুলতার উর্ধে থাকতে পেরেছিলেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা তিনটি প্রয়োজনীয় তথ্য পাচ্ছি। (ক) আত্মীয়তার ধারণা দিয়ে সুন্দরকে জানা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। সৌন্দর্য সম্বন্ধে এই ধারণা ও ব্যাখ্যা প্রতিযোগী অপরাপর ধারণার তুলনায় সার্থকতর ও গ্রাহ্য। যথা, হেগেলের মতে তখনই সুন্দরের আবির্ভাব হয়, যখন 'বিশ্বাত্মা কোন বস্তুর মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, অর্থাৎ যখন কোন বিশেষরূপের মধ্যে অবিশেষ পরম সত্যের (Reality) বোধ জন্মায়। কিন্তু বিশ্বাত্মা বা পরমসত্যকে কেন আমরা বিশেষের মধ্যে দেখি, হেগেল এর কোন সদুত্তর দেন নি। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যবোধকে বুদ্ধিবৃত্তি থেকে পৃথক করে দেখেছেন এবং সৌন্দর্য-বোধ তাঁর মতে অনুভূতিমার্গের সাধ্য, তাই সৌন্দর্যবিচার আকূতিবাক্যে প্রকাশ পায়। তথ্য সৌন্দর্যবোধে অবান্তর, সত্যই মুখ্য—যে সত্য মানব-ব্যক্তিত্বের আনন্দময় স্বরূপের

৩০। পশ্চিম যাত্রীর ডায়রী র. র. / শ. সং / ১০ম খণ্ড / পৃঃ ৫৮৯
৩১। পথে ও পথের প্রান্তে। ঐ পৃঃ ৮২৭

সৃজনশীল প্রকাশ। (খ) ক্রোচের মতবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সাদৃশ্য প্রায়ই আলোচিত হয়। কিন্তু, তুলনা অমূলক, কারণ উভয়ের চিন্তার আপাতসাদৃশ্য অপেক্ষা দার্শনিক বৈসাদৃশ্য গুরুত্বপূর্ণ। (গ) সৌন্দর্য প্রয়োজনাতিরিক্ত। উপযোগবাদের (utilitarianism) ভিত্তিতে সৌন্দর্যদর্শন গড়ে তোলা যায় না, অর্থাৎ সৌন্দর্যবিচারের আকৃতিবাক্যগুলিকে উপযোগের বিবৃতিবাক্যে অনুবাদ করা অসম্ভব। কারণ সৌন্দর্যবোধ যে সৃজনশীল ক্রিয়ায় প্রকাশ পায়, তা আত্মপ্রকাশের আনন্দেই সাধিত, আত্মরক্ষার বা জনকল্যাণের জন্য নয়। রবীন্দ্রনাথের এই মতবাদের প্রধান সমালোচক হবেন হিউম প্রমুখ দার্শনিকেরা।

এখন আমরা (ক) ও (খ) সংখ্যক মন্তব্যগুলির কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করব। এই আলোচনাকালে আমরা রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যধারণার ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত 'প্রকাশ', ও 'আনন্দ' ইত্যাদি দ্বিতীয় স্তরের (second order) ধারণাগুলিকে ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাব।

প্রথমে ক্রোচের কথাই ধরা যাক। পরমসত্তা চিৎ, যার স্বরূপ সৃষ্টি বা ক্রিয়া। ক্রোচে প্রশ্ন তুলেছেন চিৎস্বরূপ পরমসত্তার গতিপথের পর্যায়গুলি কি কি? এই পর্যায়গুলিকে তিনি দুভাগে ভাগ করেছেন এবং এই দুটি ভাগই স্বতন্ত্র, বিরোধী কিছু নয়।[৩২] এই দুটি ভাগ হল জ্ঞানগত ও কর্মগত। জ্ঞানগত পর্যায় স্বাশ্রয়ী, যদিও কর্মগত পর্যায় জ্ঞানগতের মুখাপেক্ষী। কারণ, জ্ঞান মানেই কোন ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে জ্ঞান এমন নয়, যদিও জ্ঞান বাদ দিয়ে কোন ক্রিয়াই সম্ভব নয়। জ্ঞান-নিরপেক্ষ কার্য উন্মত্ততা। উপরোক্ত পর্যায় দুটির প্রত্যেকটিকে পুনরায় দুটি করে স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত করতে হবে। জ্ঞানগত বিভাগের দুই পর্যায় হ'ল প্রজ্ঞা ও প্রত্যয়, এবং কর্মগত বিভাগের দুটি পর্যায় হ'ল বৈষয়িক ও নৈতিক। যেভাবে কর্ম অধিষ্ঠিত থাকে জ্ঞানে সেইভাবেই প্রত্যয় নির্ভর করে প্রজ্ঞার উপর, নৈতিকের অনিবার্য অধিষ্ঠান বৈষয়িক। দেখা যাচ্ছে যে, মানস ক্রিয়ার চারটি পর্যায়। প্রজ্ঞা, প্রত্যয়, ব্যবহার ও নীতি। এখন লক্ষণীয় এই যে প্রত্যয় যদিও প্রজ্ঞার উপর নির্ভরশীল, তবুও প্রজ্ঞা প্রত্যয়-নির্ভর নয়; নীতি ব্যবহার-নির্ভর হলেও ব্যবহার নীতি-নির্ভর নয়। মানসক্রিয়ার উপরোক্ত চারিটি পর্যায়ের চরম উৎকর্ষ যথাক্রমে সুন্দর, সত্য, উপযোগ ও মঙ্গল। অন্যভাবে বলা যায়, পরমসত্তা চিৎ। সৃষ্টিই তার স্বরূপ। এই মনের প্রথম সৃষ্টি বিশুদ্ধ প্রতিরূপ (image)। এর পিছনে বুদ্ধি অনুপস্থিত, আছে শুধু প্রজ্ঞা ও শিল্পে তার অভিব্যক্তি (expression)। এই

৩২। পরমসত্তার মূলে দ্বন্দ্ব-সংশ্লেষণের প্রেরণা, সে সত্তা চিৎ-স্বরূপ, গতিশীল—এই তত্ত্ব হেগেলের মহৎ আবিষ্কার। ক্রোচের মতে হেগেল এ কথা বোঝেননি যে, বিরুদ্ধ ধারণার সমন্বয় ও স্বতন্ত্র ধারণার সমন্বয় একই ন্যায় প্রয়োগের দ্বারা ব্যাখ্যাত হতে পারে না। দুটি বিরুদ্ধ ধারণার সংশ্লেষণে যে নূতন ধারণার সৃষ্টি হয় একমাত্র তার মধ্যেই অর্থ ও সত্য বিরাজমান। কিন্তু ক্রোচের মতে, স্বতন্ত্র ধারণার বেলায় এ কথা সত্য নয়। স্বতন্ত্র ধারণাগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োজন উন্নত ও অবনতের প্রভেদ টানা। ক্রোচে এ পার্থক্য মনে রেখে পরম সত্তার নূতনতর বর্ণনায় দর্শনের মুক্তি খুঁজেছেন।

বিশুদ্ধ প্রতিরূপগুলিকে আশ্রয় করে শুরু হয় মানসক্রিয়া (প্রতিরূপ এখানে প্রত্যয়ভুক্ত হয়)। (শিল্পের রাজ্য থেকে মন এসে পড়ে ন্যায় শাস্ত্রের (logic) রাজ্যে।) বৈষয়িক রাজত্বের বিশেষ পরিচয় সত্যের সন্ধান। তবুও এই বৈষয়িক রাজত্ব শিল্পরাজ্যের মুখাপেক্ষী, কারণ শিল্পের মূল লক্ষণ প্রতিরূপের প্রকাশ, এবং ন্যায়শাস্ত্র অনিবার্যভাবেই 'প্রকাশ্য' হতে বাধ্য। ভাষায় প্রকাশ হয় নি এমন ন্যায়শাস্ত্র একান্তই অসম্ভব।

ক্রোচে বলেন, প্রতিরূপ সৃষ্টিও যা তার প্রকাশও তাই। প্রজ্ঞা ও প্রকাশ একই ব্যাপারের নামান্তর মাত্র। এবং যেহেতু সহজ জ্ঞানের প্রতিরূপ সৃষ্টিই শিল্প, তাই শিল্প প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। সংক্ষেপে এই হ'ল ক্রোচের নন্দনতত্ত্ব।

এখন ক্রোচে প্রতিরূপ সৃষ্টি বলতে ঠিক যা বুঝতে চান তা হ'ল যে, প্রজ্ঞাশিথিল অলস মুহূর্তের রচনা কল্পচিত্র নয়—কারণ সেখানে জ্ঞানের আধিপত্য থেকে বোধহয় মুক্তি নেই। অতীত জ্ঞান সংস্কার হিসাবে প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে। সৃষ্টির মুহূর্তে প্রজ্ঞা যে প্রতিরূপ সৃষ্টি করে তা একেবারে বিশুদ্ধ প্রতিরূপ, প্রত্যয়ের সঙ্গে কোন পরিচয় নেই। প্রত্যেকটি প্রতিরূপ বৈশিষ্ট্যময় ও মূর্ত, অথচ প্রত্যয় মাত্রই সামান্য ও অমূর্ত। ক্রোচে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার প্রতিরূপ সৃষ্টির নাম দিয়েছেন 'প্রকাশ'। সৃষ্টি ও প্রকাশ একই ব্যাপারের দুই দিক মাত্র। শিল্পীর মহিমা তাই প্রজ্ঞার গভীরতায় নয়, প্রকাশের কৌশলে। আর্নস্ট কেসিরার মনে করেন যে, ক্রোচের এই মতবাদের মূল আছে রুসোর ও গ্যেটের সৌন্দর্য চিন্তায়। গ্যেটে বলেছিলেন যে "Art is formative long before it is beautiful" এবং এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যভাবে অনুকারবাদের প্রত্যাখ্যান। শিল্প প্রকাশ-ধর্মী ঠিকই, কিন্তু কারু-কৃতি ব্যতিরেকে তা কখনই প্রকাশ্য হতে পারে না। আর যদি তাই হয় তাহলে কলিংউডের কথাও মানতে হয় যে, শিল্পী প্রকৃতপক্ষে কোন একটি অনুভূতিকে প্রকাশ করতে উৎসুক। আর প্রকাশ করা ও ভালভাবে প্রকাশ করা একই কথা। এই মতবাদ স্পষ্টতই একদেশদর্শী। কারণ, এই মতবাদ স্বীকার করলে, এও মানতে হয় যে, "Every utterance and every gesture that each one of us makes is a work of art"।[৩৩] পরিণামে এও স্বীকার্য হয়ে পড়ে যে, ভাবপ্রকাশক ভঙ্গী মাত্রই শিল্প নয়, যেমন চীৎকার, আর্তনাদ বা বা হাস্য ভাষা নয়। কারণ বিস্ময়াদিসূচক অব্যয় শব্দগুলি অনৈচ্ছিক প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়া, তার উচ্চারণে প্রকৃত স্বতঃস্ফূর্ততা নেই, অথচ, ভাষায় ও শিল্পসৃষ্টিতে একটি সচেতন উদ্দেশ্য (teleology) বর্তমান থাকে। অভিনেতা সত্যই তার ভূমিকায় 'অভিনয়' করে, এবং শিল্পিত বাণীর একটি সামগ্রিক আঙ্গিকগত সৌষম্য থাকে। শিল্প কেবল প্রকাশই নয়, উপস্থাপনা ও ভাষ্যরচনাও বটে। যাইহোক, 'অব্যক্তধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি'—অর্থাৎ ভাষার অতীত কোন ভাবের সত্তা ক্রোচে মানতে রাজী নন;[৩৪]

৩৩। R. G. Collingwood রচিত *The Principles of Art*. দ্রষ্টব্য

৩৪। 'A song is when your inside is too big for the outside and it makes a bubble'—Erdmann.

ভাব যদি গভীর হয়, প্রকাশ অনিবার্য। তাহলে সব মানুষই কি শিল্পী? তাই জাতিগত ভাবে বা গুণের দিক দিয়ে কোন তফাৎই নেই কবি ও অকবির মধ্যে। কেবল সাধারণ মানুষের মধ্যে শিল্পগুণ সংকীর্ণ, শিল্পীর মধ্যে সেগুণের প্রাচুর্য।

তাহলে দেখা গেল, শিল্পের স্থান জ্ঞানের রাজত্বে নয়, ক্রিয়ার রাজত্বেও নয়। শিল্প স্বাধীন ও স্বাশ্রয়ী। হেগেল শিল্পকে জ্ঞানের অধিকারে রেখেছিলেন—কারণ, তাঁর মতে শিল্প আর কিছুই নয়, চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়ের পথে আত্মবিকাশ। আবার কেউ কেউ, যথা টলস্টয়, নিছক কর্মকাণ্ডে শিল্পের সন্ধান চেয়েছিলেন—শিল্প সুনীতির সুচারু পরিবেশন মাত্র। ক্রোচের কাছে উভয় মতবাদই অগ্রাহ্য। শিল্প, সংক্ষেপে, উক্তি ও উপলব্ধির সাযুজ্য।

ক্রোচে ও রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শনে যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বর্তমান তার আলোচনায় প্রথমেই বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যবোধের ব্যাখ্যা যেভাবে দিয়েছেন ক্রোচের তা অস্বিষ্ট নয়। সৌন্দর্যবোধ রবীন্দ্রনাথের কাছে মানুষের ধর্মের সামান্য লক্ষণ, তার জন্য সুন্দরের তাৎপর্য আত্মিক, 'আত্মসংস্কৃতির্বাব' তিনি সুন্দরের প্রত্যয়ে বা সৌন্দর্যবোধে পৌঁচেছেন মানুষের স্বভাবের—অভিজ্ঞতার—অনুভূতির ও কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণের দ্বারা। যত না বিশ্লেষণের, তদপেক্ষা তত্ত্বানুভূতির [৩৫] পথে। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যবোধকে বুদ্ধিবৃত্তি থেকে পৃথক করে লীলাবৃত্তিতে স্থাপিত করেছেন একথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। রাজশেখর যাকে 'কাব্যপুরুষ' [৩৬] বলেছেন, সেই স্রষ্টা, রবীন্দ্রনাথের মতে 'একাকী, অখণ্ড, সম্পূর্ণ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন। তাহার অসীম নীল ললাটে বুদ্ধির রেখামাত্র নাই, কেবল প্রতিভার জ্যোতি চির দীপ্যমান।' [৩৭] উলিয়াম জেমস্‌-এর মত রবীন্দ্রনাথও মনে করেন যে বুদ্ধি সাধারণত স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ; প্রয়োজনবোধেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু জ্ঞান সর্বদাই তা নয়। জ্ঞানেও অহেতুকী আনন্দস্বাদ থাকে। যার উদাহরণ, রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, বিশুদ্ধ গণিত। [৩৮] এবং গণিতের চর্চা গণিতজ্ঞকে এক অবিমিশ্র সৌন্দর্যের জগতের সন্ধান দেয় বলে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল। জ্ঞানেও মানুষ একপ্রকার

৩৫। 'Reflective feeling'—কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-কৃত *The Concept of value*

৩৬। কাব্য-মীমাংসা, তৃতীয় অধ্যায় শেষ

৩৭। পঞ্চভূত/র. র./শ.সং/১৪শ খণ্ড/পৃঃ ৬৬৫

৩৮। 'উচ্চঅঙ্কের গণিতের মধ্যে যে একটি গভীর সৌষম্য, যে একটি ঐক্যরূপ আছে, নিঃসন্দেহে গাণিতিক তার মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করে। তার সামঞ্জস্যের তথ্যটি শুধু জ্ঞানের নয়, তা নিবিড় অনুভূতির; তাতে বিশুদ্ধ আনন্দ। কারণ, জ্ঞানের যে উচ্চশিখরে তার প্রকাশ যেখানে সে সর্বপ্রকার প্রয়োজন নিরপেক্ষ, সেখানে জ্ঞানের মুক্তি।'

—সাহিত্যের পথে/র. র./শ. সং/১৪শ খণ্ড/পৃঃ ৩৫৪

তুলনীয় বারট্রাণ্ড রাসেল: 'Mathematics, rightly viewed, possesses not only truth, but supreme beauty—a beauty cold and austere. . . sublimely pure and capable of a stern perfection such as only the greatest art can show. The true spirit of delight, the exaltation, the sense of being more than Man, which is the touchstone of the highest excellence is to be found in mathematics as surely as in poetry." —*Mysticism and Logic* p. 62

মুক্তির আস্বাদ লাভ করে, 'জাগতিক ভূমা আমাদের জ্ঞানের বিষয়' যদিও 'মানবিক ভূমা আমাদের সমগ্র দেহ, মন্ ও চরিত্রের পরিতৃপ্তি ও পরিপূর্ণতার বিষয়।'[৩৯] বিষয়-মুখ্যতা ও আত্মমুখ্যতাই জ্ঞান ও সৌন্দর্যবোধের অবচ্ছেদক ধর্ম। ক্রোচের মতে সৌন্দর্য চেতনায় সত্যজিজ্ঞাসা ঘটে না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় সৌন্দর্য কখনই সত্যবিরহিত নয়, কারণ সৌন্দর্যবোধে 'বিশ্ববস্তু' ও 'বিশ্বরস' অব্যবহিতভাবে সত্তায় উপলব্ধ হয়।[৪০] জ্ঞান বচনীয়, সৌন্দর্য অনির্বচনীয়।[৪১] সৌন্দর্য-বোধের, শিল্পপরিণামের এই লক্ষণ ক্রোচে স্বীকার করেন না।

আসলে, ক্রোচের 'প্রত্যয়'-বিষয়ক মতবাদই দোষাবহ—কারণ, তিনি শিল্প ও দর্শনে প্রজ্ঞার ও প্রত্যয়ের যে বিরোধের কথা বলেছেন আমার তা স্বীকার করতে অপারগ। শিল্পে যে প্রজ্ঞাসমূহ সক্রিয় তারা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, এবং 'সম্বন্ধ' একটি প্রত্যয়। কবি বা শিল্পী কদাপি কোন প্রজ্ঞাকে সর্ববস্তু সম্পর্ক বিচ্যুত[৪২] করে প্রকাশ করে না। আর, তাঁর 'কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার . . . সারবত্তা থাকে' বলেই তা সম্ভব। সৌন্দর্যানুভব অন্য হৃদয়-সংবেদ্য হয় তার কারণ তাতে সার্বিক বিশ্বমানবের অভিজ্ঞতার সারাৎসার রূপান্বিত হয়েছে। যে সব উপকরণের সাহায্যে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয় সেগুলি সর্বজনীন; বিশেষণ মাত্রই সার্বিক প্রত্যয়। আবার, প্রত্যয় মাত্রই যে বিশেষের সামান্যীকরণ তা নয়, কল্পনার, চিন্তার ও অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুর পুনর্বিন্যাসের দ্বারাও আমরা প্রত্যয় পেয়ে থাকি। মানুষ যে কেবল ক্রোচে-কথিত প্রজ্ঞা দ্বারাই উদ্বেজিত হয় তা নয়। প্রত্যয়াত্মক কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট সম্ভাবনা ও আদর্শগুলির দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়। কবি যখন বলেন, 'গঙ্গা যেন হেসে দুলায় ধূর্জটির জটা' অথবা 'রূপনারায়ণের কূলে জেগে উঠিলাম'—তখন সংশয় করা যায় কি যে তিনি কতকগুলি প্রতিরূপ দ্বারা আমাদের মনোরঞ্জনের প্রয়াসী? এমন 'মহৎ' কবি দুর্লভ যাঁর রচনায় মনস্বিতার স্বাক্ষর অনুপস্থিত। তাছাড়া, সত্য ও সৌন্দর্যের তাদাত্ম্য রবীন্দ্রনাথের প্রিয় মতবাদ ছিল, এবং এই মর্মে তিনি কীটসের পংক্তি বিশেষ উদ্ধারে অক্লান্ত ছিলেন। তাঁর *personality* গ্রন্থে তিনি জ্ঞানের এক দার্শনিক শ্রেণী বিভাগ করেছেন: 'Knowledge by intellect' ও 'knowledge by emotion'। অনুভূতি বলতে আমরা যে বিষয়নিষ্ঠতার ধারণা পোষণ করি তার খণ্ডনার্থে রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, 'অনুভব শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে অন্য কিছুর অনুসারে হয়ে ওঠা: শুধু বাইরে থেকে সংবাদ পাওয়া নয় অন্তরে নিজেরই মধ্যে একটা পরিণতি ঘটা। বাইরের পদার্থের যোগে কোন বিশেষ রঙে, বিশেষ রসে, বিশেষরূপে আপনাকেই বোধ করাকে বলে অনুভব করা।' সেদিক দিয়ে আমরা বলতে পারি যে, সৌন্দর্যবিচারে প্রযুক্ত আকৃতিবাক্যগুলির সৌন্দর্য-

৩৯। মানুষের ধর্ম/ঐ/১২শ খণ্ড/পৃঃ ৫৮৪
৪০। সাহিত্যের পথে,/ঐ/১৪শ খণ্ড/পৃ ৩০০
৪১। Wittgenstein এর মতে Aesthetics transcendental; বচনীয় অর্থাৎ বিবৃতি বাক্যে প্রকাশ সম্ভাবনাহীন হওয়ার জন্য।
৪২। রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্য 'সহিতত্বই' বিধায়ক।

বোধের সংস্কারগত এক প্রকার বিবৃতিধর্মিতা (character of stating fact) আছে, যা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করতেন, এবং যা ক্রোচেও স্বীকার করতেন, অথচ, যা আধুনিক পজিটিভিস্টরা লক্ষ্য করেন নি। দেখা যাচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তায় অনুভূতির বিষয়িমুখীনতা ও জ্ঞানের সর্বাত্মক বিষয়মুখীনতা স্বীকৃত হয় নি। তিনি একথা মানেন নি যে, অনুভূতি মাত্রই অনবস্থিত (variable) এবং জ্ঞান মাত্রই সহরূপ (uniform) ও সার্বিক (universel)। অভিজ্ঞতাকে বিষয়গত ও বিষয়িগত ভাবে বিভাজনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না, এবং একথাও মনে করতেন যে, তথাকথিত বিষয়গত জ্ঞানেও বিষয়ীর ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর নয়। বিজ্ঞান ব্যক্তি-স্বভাববর্জিত ও তার ধর্ম সত্য সম্বন্ধে অপক্ষপাত কৌতূহল। রবীন্দ্রনাথের মতে "আমরা সত্তামাত্রকে যেভাবে যেখানেই স্বীকার করি সেটা মানষের মনেরই স্বীকৃতি। . . . বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতায় আমরা যে জগৎকে জানি বা কোনকালে জানবার সম্ভাবনা রাখি, সেও মানবজগৎ। অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধির, যুক্তির কাঠামোর মধ্যে কেবল মানুষই তাকে আপন চিন্তার আকারে আপন বোধের দ্বারা বিশিষ্টতা দিয়ে অনুভব করে।"[৪৩] শিল্পে স্রষ্টা যে অনুভূতির্রাজি প্রকাশ করেন, তা বিশিষ্ট হলেও একান্ত ব্যক্তিগত নয়, কোন উৎকেন্দ্রিক পছন্দ-অপছন্দ নয়। পক্ষান্তরে তা বিশ্বমানবের আত্মপ্রকাশ। 'সৃষ্টিতে তব আনন্দ আছে মমত্ব নেই কভু।'

'প্রকাশ' কথাটিও কম বিভ্রান্তিকর নয়। সত্য বটে যে, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'প্রকাশ আমার ধর্ম'। কিন্তু ক্রোচে 'প্রকাশ' যে অর্থে ব্যবহার করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেই অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেন নি। ভামতীকার শারীরক ভাষ্যের টিকায় অভিজ্ঞতার ('অনুভব') সংজ্ঞানির্দেশে 'অর্থ-প্রকাশ'-এর উপর জোর দিয়েছেন। আমরা বলতে পারি যে, সাহিত্যে বা শিল্পের সংজ্ঞা দেওয়া যায় ধ্যেয় বস্তুর নির্দেশে অথবা যে জীবনের বা অভিজ্ঞতার অধিকারী হন কবি বা শিল্পী, তার নির্দেশে। বলা বাহুল্য, এই দুই দৃষ্টিভঙ্গী পরস্পর সম্পর্কিত।' কারণ, হিউম যেমন দেখিয়েছেন যে মন ও তার মানসিক অবস্থাগুলিকে কখনও পৃথক করা যায় না, তেমনই রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যে যে প্রকাশ তা 'মানব-প্রকাশ'। শ্রেয় চৈতন্য যেহেতু সত্তার উদ্বৃত্তের প্রকাশ, তাই সৌন্দর্যসৃষ্টিতে মানবব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। 'যেখানে মানুষের আত্মপ্রকাশে অশ্রদ্ধা সেখানে মানুষ আপনাকে হারায়'।

প্রকাশ অর্থে মিলন। ধাতুগত অর্থে সাহিত্য শব্দে মিলনের ভাবটি নিহিত। কার সঙ্গে মিলন? মানুষের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে মিলন—, এক কথায় যা সত্য তার সঙ্গে মিলনই মানব-প্রকাশ। মানবসত্তা উদ্বৃত্ত বলে প্রকাশ-ধর্মী। অর্থাৎ একাধারে সৃজ্যমান ও সৃজনশীল। আবার এই উদ্বৃত্ত সামঞ্জস্য-স্বরূপ, তার প্রকাশে 'সহিতত্ব' বা সামঞ্জস্য সাধিত হয়। বলা বাহুল্য ক্রোচে এই অর্থে শিল্পকে প্রকাশ বলেন নি। তাঁর মত যেন অনেকটা দেকার্তের[৪৪]

৪৩। মানুষের ধর্ম/র. র./শ. সং/১২শ খণ্ড, পৃ ৫৮৪

৪৪। ক্রোচের জ্যামিতিক উদাহরণের সাহায্যে প্রজ্ঞা ও প্রকাশের তাদাত্ম্য বোঝানোর প্রয়াস নিরাপদ হয় নি বলেই আমরা মনে করি। কারণ জ্যামিতিক ধারণা শিল্পপ্রজ্ঞার সমগোত্রীয় নয়। এবং তা ক্রোচের মতানুসারেই।

clare et distinctiva ধারণার কথা মনে পড়তে পারে কিন্তু তাতে প্রজ্ঞা তর্ক বাক্যে প্রকাশ, এই কথাই প্রমাণিত হবে। নিঃসন্দেহে, ক্রোচে তা সমর্থন করবেন না। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ অর্থে 'বিকাশ'[৪৫] শব্দও ব্যবহার করেছেন, তার দ্বারা তাঁর অভিপ্রেত অর্থটি আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৪৬] শ্রেয় চৈতন্যের দ্বারা সৃজনশীল কর্মের মাধ্যমে মানুষ তার সত্তাবোধে প্রতিষ্ঠা পায়। এই সত্তাবোধের অনুষঙ্গী যে সৃজনশীলতা তাই প্রকাশ। একটি সূর্যাস্ত, বা কোন মুখশ্রী যাই হোক না কেন, যখনই কোন বিষয়বস্তু রসবস্তুতে পরিণত হয়, অর্থাৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত সত্তা লাভ করে, অথবা তথ্যসীমা অতিক্রম করে তখনই সত্য হয়ে ওঠে। অপর কথায়, যখন তা মানুষের আত্মার ঐক্যের সঙ্গে যুক্ত হয়, যখন তা মানুষের আত্মীয় হয়ে ওঠে, তখন এই বিকাশের প্রণালীই প্রকাশ। আর যাকে বলি, রূপসৃষ্টি তা এই প্রকাশেরই সহোদর। সৌন্দর্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে দার্শনিক হিসাবে, রবীন্দ্রনাথ সংকার্যবাদী,[৪৭] অর্থাৎ সৃষ্টিহীন সৌন্দর্যবোধ অসার্থক। সৃজনশীলতা দ্বারাই সৌন্দর্যচেতনা আভাসিত। রূপ ও ভাব 'বাগর্থবিব সম্পৃক্তৌ'। 'অলংকার জিনিসটাই চরমের প্রতিরূপ।'[৪৮] রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৌন্দর্যদর্শনকে এমনভাবে গঠন করেছেন যে তাঁকে Aristotle-এর মতো physics ও aesthetics-র ভেদ-বিলোপের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার প্রয়োজন হয় নি। যে বস্তুর মধ্যে আমরা রসবোধের চরমতা পাই তাকে অলংকৃত করেই আমরা তৃপ্ত হই। রসাত্মক বাক্য অলংকৃত হতে পারে না। মানুষের শ্রেয় চৈতন্যে সুন্দরের আবির্ভাব সৃজনশীলকে অলংকৃতরূপ ধরেই প্রকাশিত হয়। কারু-কারিতা সৌন্দর্যবোধের অন্তর্গত; বাইরের বিষয় নয়।[৪৯] সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে সৃষ্ট সুন্দর বস্তুর অনুষঙ্গ ও সামঞ্জস্য আছে বলেই তার কাম্যতা।[৫০] কোন বস্তু অসুন্দর তখনই,

৪৫। 'সমগ্রের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ যতরকম করিয়া যতদূর ব্যাপ্ত হইতে থাকে ততই প্রত্যেকের বিকাশ।—সাহিত্য সৌন্দর্য ও সাহিত্য

৪৬। ক্রোচের প্রকাশবাদের যে আধুনিক সমালোচনা 'প্রকাশ' কথাটিকে কেন্দ্র করে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। দ্রষ্টব্য *Aesthetics and Language*; Elton সম্পাদিত গ্রন্থের The Expression theory of Art প্রবন্ধ —লেখক O. K. Bouwsma,

৪৭। 'ভাবের সৃষ্টি......বস্তুসৃষ্টির মতোই একটা অমোঘ নিয়মের অধীন। ...তাহার একটা বৃহৎ কার্যকারণ সম্বন্ধ দেখিবার জন্য আগ্রহ জন্মে।' —সাহিত্য / র. র. / শ. সং / ১৩শ খণ্ড / পৃ: ৭৮৬

৪৮। সাহিত্যের পথে / র. র. / শ. সং / ১৪শ খণ্ড / পৃ: ৩২৭

৪৯। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শনে প্রকাশ কেবল ভিতরকে বাইরে নেওয়া নয়, ভিতর ও বাইরের একাত্মতা সাধন। কেবল রূপান্তরের মাত্র নয়, রূপের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত হওয়া এবং বিস্তারের মধ্য দিয়ে সত্য হওয়া। '...এই বিস্তৃতিতেই সত্যতা, এই বিস্তৃতিতেই সমৃদ্ধি। এই জন্যই তিনি বলেছেন—"প্রকাশটা একটা ঐশ্বর্যের কথা"। পাশ্চাত্ত্য expression কথাটির মধ্যে এই ঐশ্বর্যের ইঙ্গিত নেই। ...প্রকাশের দিক—বহুবিচিত্র রূপের ঐশ্বর্যে আত্মপরিচয় লাভের দিক। 'প্রকাশের জগৎ রূপের জগৎ।' সৌন্দর্যের প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ, বেতার জগৎ, ৩৬ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১৮৮৭ শকাব্দ।

৫০। 'রূপভাবের দেহ' ...এই মর্মে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে "খুশি হয়েছি এ কথাটা বোঝাতে লাগে সুর, লাগে ভাব ভঙ্গী। ...এই খুশির বাহন অকিঞ্চিৎকর হলে হয় না, যা অত্যন্ত অনুভব করি সে তো অবহেলার জিনিস নয়। এই কথা প্রকাশ করতে হয় কারুকাজে।" —সাহিত্য স্বরূপ / র. র. / শ. সং / ১৪শ খণ্ড / পৃ: ৫১০-১

যখন আমাদের সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে তার ঐক্যসম্পর্ক স্থাপিত হয় না। বিশুদ্ধ ভাব বা বিশুদ্ধ রূপ কোনটিই একান্তভাবে প্রকৃত সৌন্দর্যবোধের সাধক নয়। সৃষ্টিতে যখন রূপই একান্ত হয়ে ওঠে, তখন সুমিতির অভাব ঘটে, উপকরণের বাহুল্যে[৫১] মানুষ তার সত্তার ঐক্য উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হয়। আবার অপরূপ ভাব "বীণাহীন সভায় যন্ত্রীর আঙুল" যার নর্তনে সুর বাজে না, এ কেবল "ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব"। আধুনিক ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায় বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের মতে ভাব ও রূপের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা reflexive নয়, symmetrical। ক্রোচে প্রজ্ঞা ও প্রকাশের সম্বন্ধ reflexive বলেই মনে করেন। এমন ধারণা অসঙ্গত যে, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শনে সুন্দরের বিষয়গত কোন আধার স্বীকৃত হয় নি। কারণ, বিশ্ববস্তুর ব্যতিরেকে বিশ্বরসও অপ্রামাণ্য হয়ে পড়ে। 'Artist' এর প্রতিশব্দ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ 'রূপদক্ষ' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ অর্থে প্রয়োগ করেছেন। শিল্পবস্তু বা রূপ তথ্যশ্রেণীর পদার্থ নয়, যার সম্বন্ধে বিবৃতি বাক্য রচনা করা যেতে পারে; তা সত্য। ঐতিহাসিকতার ঊর্ধ্বে তার রসগর্ভ স্বাশ্রয়ী সত্তা (ontology)[৫২] বর্তমান—একথা রবীন্দ্রনাথ মানেন। আর স্বাশ্রয়ী সত্তা আছে বলেই কোন বিবৃতিবাক্য দ্বারা শিল্পবস্তুকে নিঃশেষে নির্ধারণ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের দর্শনেই এই মতবাদের যাথার্থ্য নিহিত। এই মতবাদের গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য হওয়ার মানদণ্ড অন্যতর (বলা বাহুল্য সৌন্দর্যদর্শনগত নয়) বিচারের অপেক্ষা রাখে।

এবারে, দেখা যাক, উপযোগবাদীরা সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে কি বলেন। তাঁদের মতে সৌন্দর্যবিচার বিবৃতিবাক্যেই প্রকাশ পায়, অর্থাৎ সৌন্দর্য সংক্রান্ত আকৃতিবাক্যকে বিবৃতি বাক্যে অনুবাদ করা যায়। অথবা, 'শ্রেয়' শব্দের সংজ্ঞা তথ্য-শব্দদ্বারা সম্ভব। এক কথায় উপযোগবাদীরা 'সৌন্দর্য' বা 'সুন্দর'-এর সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব মনে করেন।

দ্বিতীয়ত, তত্ত্বগত পার্থক্য হল এই যে, উপযোগবাদীরা যেভাবে সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা দেন রবীন্দ্রনাথ তা স্বীকার করেন না। যথা, হিউম দেখিয়েছেন, সেই স্তম্ভগুলিকেই স্থাপত্যে আমরা সুন্দর বলি যেগুলির ভারবহন ক্ষমতা অধিক। বলা যায় যে নারীর সেই প্রত্যঙ্গগুলিই 'সুন্দর' বলে স্বীকৃত হয় যেগুলি প্রত্যক্ষত জননক্রিয়া ও সন্তানপালনের পক্ষে উপযোগী। যেমন—নিতম্ব, স্তন ইত্যাদি। (হিউমের *Enquiry*র Section VI, Part II 200 এবং *Treatise* এর Section I, Part III, pp. 576-577 দ্রষ্টব্য)

৫১। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান রচনায় এই তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ করেছেন। ভাব ও রূপের অদ্বৈত নয়, দ্বৈতাদ্বৈতই তাঁর অন্বিষ্ট। অনুসন্ধিৎসু পাঠক রবীন্দ্রনাথের 'সংগীত চিন্তা' গ্রন্থে দেখতে পাবেন। তাঁর মতে প্রাণ ও আর্ট উভয়েরই ধর্ম সুমিতি।

৫২। The poem no doubt owed its form to the touch of the person who produced it, but at the same time with a gesture of utter detachment, it has transcended its material — the emotional mood of the author. It has gained its freedom from any biographical bondage by taking a rhythmic perfection which is precious in its own exclusive merit . . . directly a poem is fashioned it is eternally freed from its genesis, it minimizes its history and emphasizes its independence. —*Religion of an Artist*, p. 24 ; তুলনীয় 'শাজাহান', বলাকা।

তাঁর মতে উপযোগিতাই সৌন্দর্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করবেন, "শরীরের পিপাসা মেটাবার যে জল তার জন্য ভাঁড় হোক, গণ্ডুষ হোক কিছুতেই আসে যায় না। এমন অপরূপ পাত্রের প্রয়োজন কি? কি বিচিত্র এর গড়ন, কত রং দিয়ে আঁকা। একে সময় নষ্ট করা বললে প্রতিবাদ করা যায় না। রূপদক্ষ আপনার চিত্তকে এই একটি ঘটের উপর উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে; বলতে পার, সমস্তই বাজে খরচ হোল। সেকথা মানি; সৃষ্টির বাজে খরচের বিভাগেই অসীমের খাস তহবিল। এইখানেই যত রঙের রক্তিমা, রূপের ভঙ্গি।"[৫৩] আসলে রবীন্দ্রনাথ মানুষের সত্তার যে স্বভাবে বিশ্বাসী, সেই উদ্বৃত্তের তত্ত্বই তাঁকে উপযোগবাদ স্বীকারের বিরোধী ক'রে তুলেছে। তাছাড়া, উপযোগবাদ যে বিবৃতিবাক্যে প্রচারিত তার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শনের আকৃতি বাকগুলির খণ্ডন হয় না—একথা আমরা পূর্বেই দেখেছি। সত্য বলতে কি, হিউম যে গ্রীক স্থাপত্যের স্তম্ভগুলিকে উদাহরণরূপে ব্যবহার করেছিলেন, সেইগুলিকে নেহাৎ তর্কের খাতিরে ছাড়া, বাস্তবিক পক্ষে উপযোগের সৃষ্টি বলে মনে করার কোন কারণ নেই। এমন কি, আধুনিক যে স্থাপত্য রীতিকে functional বলে অভিহিত করা হয় সেটিও উপযোগবাদের উদাহরণ নয়।[৫৪]

শিল্পসৃষ্টিবিষয়ে ন্যায়শাস্ত্রসম্মত বিভিন্ন প্রকারের কাব্যরচনা সম্ভব: (ক) বিবৃতি (description), (খ) ভাষ্য বা ব্যাখ্যা (interpretation) ও (গ) আকৃতি বা বিচার (evaluation)। উপযোগবাদীরা এই তিনটি ন্যায়শাস্ত্রসম্মত প্রভাবের বিভিন্নতা বিস্মৃত হন। যথা 'কোনো স্তম্ভ ভারবাহনে সক্ষম'—এই বিবৃতি থেকে এই আকৃতিবাক্যে কখনই পৌঁছান যায় না যে, 'স্তম্ভটি সুন্দর' যদি না ভাষ্য দ্বারা 'সুন্দর' শব্দের প্রয়োগের একটি বিধি সৃষ্টি করি। আর প্রয়োগবিধি সৃষ্টি করলেই তা সর্বদা মান্য হবে এমন কোন কথা নেই। অন্যতর প্রয়োগবিধিও সমান মান্য বা সঙ্গত হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা কোনটিকে মান্য করব সে বিষয়ে স্বাধীন ভাবে স্থির করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ কদাপি বিবৃতিবাক্য থেকে আকৃতিবাক্যের নিগমন দেখান না। তিনি যে বোধ কোন আকৃতিবাক্যের জনক সেই বোধের ব্যাখ্যা রচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শনের বিরুদ্ধে আর এক প্রকারের উপযোগবাদীর আপত্তি উত্থাপন করা যায়। যথা, শিল্প সামাজিক ব্যাপার। অর্থাৎ শিল্প যদি বৃহত্তর সমাজের মঙ্গলের বিধায়ক না হয় তাহলে তা অসার্থক। আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্রকে[৫৫] উক্তপ্রকার মতবাদের প্রবক্তা হিসেবে গণ্য করা হয়। 'যদি . . . লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন

৫৩। সাহিত্যের পথে / র. র. / শ. সং / ১৪ শ খণ্ড / পৃঃ ৩১৪ ; তুলনীয় 'ভুলস্বর্গ লিপিকা।

৫৪। "Functional architecture, so much spotlighted of late, is determined not only by function in the sense of purpose, but even more by the materials of the building. The architect is an artist, and like any great artist, etc. loves materials."—Virgil C. Aldrich, *Philosophy of Art*, p. 57.

৫৫। বঙ্কিমচন্দ্র নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন। ৩নং / পৃঃ ২৭২

করিতে পারেন। অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।" এই জটিল বাক্যটিকে যদি আমরা বিয়োজক (disjunctive) বাক্যরূপে গ্রহণ করি—অর্থাৎ যে কোন একটি বাক্য অবশ্যই সত্য—তাহলে, সেক্ষেত্রে বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ তার তাৎপর্য হারায়। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র মঙ্গল ও সৌন্দর্যের মিলন ঘটাতেই চেয়েছিলেন। তাই যদি সংযোজক (conjunctive) বাক্যরূপে অর্থ করা হয় তাহলে সৌন্দর্য ও মঙ্গলের এমন সংজ্ঞা দিতে হবে যার ফলে উভয় বাক্য একই কালে সত্য হওয়া সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' ও উত্তর চরিতের আলোচনায় দ্বিতীয় পন্থারই প্রয়োগ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, শিল্পের "উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞানে নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। শিল্প-স্রষ্টা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্ত শুদ্ধ বিধান করেন।"[৫৬] চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তকারণ 'কবি, ধর্মের একজন প্রধান সহায়'[৫৭] এবং চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অভাবে ধর্মের হানি হয় বলেই বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন। আর সামঞ্জস্য রক্ষা করে মানবিক বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধনই ধর্ম। 'হিন্দুর পূজনীয় দেবতাদিগের প্রাধান্য রূপবান চন্দ্রে বা বলবান কর্তিকেয়ে নিহিত হয় নাই; বুদ্ধিমান বৃহস্পতি বা জ্ঞানী ব্রহ্মায় অর্পিত হয় নাই; রসজ্ঞ গন্ধর্ব্বরাজ বা বাগ্দেবীতে নহে। কেবল সেই সর্বাঙ্গ সম্পন্ন অর্থাৎ সর্বাঙ্গীণ পরিণতিবিশিষ্ট ষড়ৈশ্বর্যশালী বিষ্ণুতে নিহিত হইয়াছে।'[৫৮] বলা বাহুল্য, উপরোক্ত মতবাদ রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শনের পূর্বপক্ষ হতে পারে না, কারণ রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য-দর্শনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধনই প্রস্তাবিত হয়েছে। 'জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার মন ব্যাপ্ত হইবে, কর্মের দ্বারা জগতে আমার আনন্দ ব্যাপ্ত হইবে, মনুষ্যত্বের ইহাই লক্ষ্য। অর্থাৎ, জগৎকে জ্ঞানরূপে পাওয়া শক্তিরূপে পাওয়া ও আনন্দরূপে পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে।'[৫৯] কারণ, 'মঙ্গলের সঙ্গেই সৌন্দর্যের, বিষ্ণুর সঙ্গেই লক্ষ্মীর মিলন পূর্ণ।'[৬০]

সৌন্দর্যদর্শনে মঙ্গলের প্রসঙ্গ বিশুদ্ধ দার্শনিক প্রয়োজনে ওঠে না, যদি না আমরা মঙ্গলের সংজ্ঞা ও সুন্দরের সংজ্ঞার মধ্যে কোন সাদৃশ্য আবিষ্কার করি, এবং 'সুন্দর মঙ্গলময়' এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই। ন্যায়শাস্ত্রের এই শর্ত ব্যতীত সৌন্দর্যদর্শন আলোচনায় মঙ্গলের প্রশ্ন আর একভাবে উঠতে পারে যথা, সৌন্দর্য-বিষয়ক আকৃতিবাক্যে যদি মঙ্গল বিষয়ক অনুজ্ঞা প্রস্তাব করা হয় এবং যদি সুন্দর ও মঙ্গলের প্রত্যয়গত সাধর্ম্য-বিষয়ক ভাষ্য লোকব্যবহার-সমর্থিত রূপে উপস্থিত করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রে এর উদাহরণ আমরা দেখেছি। শ্রেয়োদর্শনে অনুরূপ পদ্ধতির প্রয়োগ ও উল্লেখ ইংরাজ দার্শনিক মূরের রচনাতেও লক্ষ্য করা যায়।[৬১]

৫৬। বঙ্কিমচন্দ্র / বিবিধ প্রবন্ধ / উত্তর চরিত / পৃঃ ১৮৩
৫৭। ঐ / ধর্মতত্ত্ব / চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি / পৃঃ ৬৭০
৫৮। ঐ / ধর্মতত্ত্ব / জ্ঞানাজনীবৃত্তি/ পৃঃ ৬১৩ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সকল উদ্ধৃতিই সংসদ।
৫৯। সাহিত্য / র. র. / শ. সং / ১৩ শ খণ্ড / পৃঃ ৭৭৭ থেকে গৃহীত।
৬০। সাহিত্য / র. র. / শ. সং / ঐ / পৃঃ ৭৫৯
৬১। "... two different predicates of value, 'good' and 'beautiful' which

রবীন্দ্রনাথের মতে সুন্দর মঙ্গল তখনই, যখন মঙ্গলের ব্যবহারিক প্রয়োজনাতিরিক্ত, অহেতুক আকর্ষণ লক্ষ করা যায়, কারণ, সৌন্দর্য প্রয়োজনাতিরিক্ত—অর্থাৎ মানব-সত্তার উদ্বৃত্তেই তার উৎস। অন্যভাবে বলা যায় যে, মঙ্গলকর্ম যদি সৃষ্টিধর্মী হয়, বা মঙ্গলনীতি যদি মানব-ব্যক্তিত্বের প্রকাশক ও বিকাশ-সহায়ক হয়, আর যদি 'মঙ্গল'-চৈতন্য সামঞ্জস্য-সাধক ও ঐক্যবোধজনক হয়। শেষত, যদি মঙ্গল-চৈতন্য আকৃতিবাক্যেই প্রকাশিতব্য হয়। উপরোক্ত শর্তগুলি যদি 'মঙ্গল' পূর্ণ করে তাহলেই আমরা বলতে পারি 'সুন্দর মঙ্গলময়' বা 'মঙ্গল সুন্দর'। অর্থাৎ, দুটি 'সুন্দর' ও 'মঙ্গল' বিধেয়সম্পন্ন বাক্য তর্কবাক্যরূপে তুল্যমূল্য।

আমরা জানি যে, 'মঙ্গল' বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হলে কোন তথ্যকে বিবৃত করে না, কারণ মঙ্গল শ্রেয়বাচক প্রত্যয়, তথ্যবাচক প্রত্যয় নয়। তাই মঙ্গলের প্রত্যয়াত্মক বিশ্লেষণে যদি তথ্যাতিক্রান্ত কোন ব্যঞ্জনা না থাকে, তাহলে শ্রেয় নীতি ও বিজ্ঞানের ভেদরেখা লুপ্ত হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় শ্রেয় নীতির এই দার্শনিকবিধি কখনো লঙ্ঘিত হয় নি। পুনরায়, মঙ্গলের কাম্যতা তখনই যাথার্থ্য লাভ করে যখন মানুষের চেতনায় তার জন্য একটি আতি থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, নৃত্যের শিল্প হিসাবে একটি কাম্যতা আছে কারণ, মানুষের প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের মধ্যেই নৃত্যের সম্ভাবনা বর্তমান এবং তার পুনর্বিন্যাসের ইচ্ছার দ্বারা মানুষ নৃত্যশীল হয়ে ওঠে। আবার মানুষের সত্তা সামঞ্জস্য-স্বরূপ বলে তার শ্রেয় বোধের সর্বপ্রধান নিয়ামক অখণ্ডতা ও ঐক্য। এই অখণ্ডতার বোধ সুন্দরের অভিজ্ঞতায় যেমন জন্মে, মঙ্গলচেতনাতেও তেমনই। 'সর্বগতঃ শিবঃ।' 'মঙ্গলমাত্রেরই সমস্ত জগতের সঙ্গে একটা গভীরতম সামঞ্জস্য আছে।'[৬২] এই গভীরতম সামঞ্জস্যই আমাদের অপর কাউকে উপায়রূপে ব্যবহার করতে বাধা দেয় কারণ, বিশ্বমানবই উপেয়। কোন মানুষকে উপায়রূপে ব্যবহার করলে 'গভীরতম সামঞ্জস্য' অস্বীকৃত হয়। তৃতীয়ত মানুষের কল্যাণমতিকে প্রয়োজন-সাধক বৃত্তিরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। জৈবিকতার উর্ধ্বে এর কোন আশ্রয় যদি না থাকে, তাহলে বিধি-বাক্যের অমোঘ অলঙ্ঘ্যতা থাকে না। অর্থাৎ 'মানুষের মুক্তস্বরূপেই, মানুষের সত্তাচৈতন্যের উদ্বৃত্তেই কল্যাণের অধিষ্ঠান'—এই আকৃতিবাক্যকে সত্য বলে ধরে না নিলে শ্রেয় নীতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে—যেমন হয়ে পড়ে, সৌন্দর্যদর্শনের বা সৌন্দর্য-বোধের। মানুষ যা 'পারে' আর যা 'পারা উচিত', যা সে 'করে', আর যা তার 'করা উচিত'—এই দ্বন্দ্ব তথ্য ও সত্যের সমান্তরাল এবং মানবজীবনের দ্বিকোটিক চরিত্রের নির্দেশক। সম্ভাবনা ও ঔচিত্য, মানব-অস্তিত্বের যে কোটিকে নির্দেশ করে তা সত্তার উদ্বৃত্তের বা ঐশ্বর্যের দিক, প্রকাশের সীমাহীন সম্ভাবনার দিক। তাই মানুষের ধর্মের

are nevertheless so related to one another that whatever is beautiful is also good'— *Principia Ethica*, p. 20

প্রসঙ্গত গ্রীকরা নাকি একই শব্দদ্বারা 'সুন্দর' ও 'মঙ্গল' উভয়কেই প্রকাশ করতেন। Mackenzie, *A Mannual of Ethics*, p. 19

৬২। সাহিত্য / র. র. / শ. সং / ১৩শ খণ্ড / পৃঃ ৭৫৬

পরিপ্রেক্ষিতে 'সুন্দর মঙ্গলময়' ও 'মঙ্গল সুন্দর'। সত্য ও সন্দর রূপেই যুগপৎ আনন্দলোকে বিরাজিত। "Apart from Beauty, Truth is neither good, nor bad."[৬৩]

আমরা দেখলাম যে, সৌন্দর্যসাধনা, বস্তুত শ্রেয় চৈতন্যজাত সকল সৃজনশীল কর্মই, আত্মোপলব্ধিরই সাধনা। তাই বলতে পারি, সৌন্দর্য সত্তার পরিপূরক প্রত্যয়। সত্তা চৈতন্যে সৌন্দর্যের যে স্থান, সত্তার নিবিড় অনুভবের প্রসঙ্গে আনন্দেরও সেই ভূমিকা। আনন্দের প্রত্যয়ের বৈশিষ্ট্য হোল যে, দুঃখ এর বাধক নয়। 'গভীর দুঃখ ভমা'।[৬৪] আনন্দ সুখের সমার্থক নয়। রবীন্দ্রনাথ আনন্দের প্রত্যয়ের দ্বারা পাশ্চাত্ত্য সৌন্দর্য-দর্শনে প্রচলিত 'Sublime' ও 'Beautiful' উভয় ধারণারই ব্যাখ্যা করছেন। সৌন্দর্যের একটি স্তর আছে—যাকে বলতে পারি রমণীয়। এর অনুষঙ্গী অনভূতি সুখ। কিন্তু সৌন্দর্যের আনন্দ সহজ নয়—তা সাধনাসাপেক্ষ। সুখের বিপরীত দুঃখ—কিন্তু আনন্দের নয়। 'দুঃখ আনন্দেরই অন্তর্ভূত।'[৬৫] 'দুঃখের অনুভূতি সহজ আরামবোধের চেয়ে প্রবলতর।'[৬৬] সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতার এই স্তর দুইটির পারিভাষিক নাম দেওয়া যেতে পারে সহজ-সুন্দর ও মহীয়ান।[৬৭] (Sublime)।

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতার দুটি স্তরভেদের অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক কোন প্রয়োজন আছে কি না। আছে। কারণ, সৌন্দর্য-বিচারের বিষয় নানা প্রকার হতে পারে, যথা প্রাকৃতিক ও মানবিক। প্রাকৃতিক সুন্দর, যেমন, ফুল, প্রজাপতি, অথবা যে কোন নিসর্গ দৃশ্য—যা সুখদরূপে সহজেই ধরা দেয় তার আকারের সুমিতি, বর্ণের সুষমা ইত্যাদির তৃপ্তিকরতার মাহাত্ম্যে। কিন্তু 'এর মধ্যে সদর অন্দরের রহস্য নেই।

৬৩। Whitehead, *Adventures of Ideas*, p. 266
৬৪। সাহিত্যের পথে /র. র. / শ. সং / ১৪শ খণ্ড / পৃঃ ২৯২
৬৫। সাহিত্যের পথে / ঐ / পৃঃ ৩৫৩
৬৬। সাহিত্যের পথে / ঐ / পৃঃ ৩৫৮
৬৭। ইংরাজী sublime শব্দটির যথাযথ ও অদ্বিতীয় বাংলা শব্দ না থাকায় ভিন্ন ভিন্ন শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি।

(ক) সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত—
স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন জানি,
বর্ণে বর্ণে রচিত।
খড়্গ তোমার আরো মনোহর লাগে
বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে,
গরুড়ের পাখা রক্ত রবির রাগে
যেন গো অস্ত-আকাশে।
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত—
খড়্গ তোমার হে দেব বজ্রপাণি,
চরম শোভায় রচিত। —গীতিমাল্য, ৩০ নং

(খ) "যাকে সুন্দর বলি তার কোঠা সংকীর্ণ, যাকে মনোহর বলি তা বহুদূর প্রসারিত।" —সাহিত্যের পথে / র. র. / শ. সং / ১৪শ খণ্ড / পৃঃ ৩৬২

(গ) 'কত যে তুমি মনোহর, মনই তাহা জানে।'

... সাধনার অপেক্ষা রাখে না।'[৬৮] আমরা যদি আরো কয়েকটি উদাহরণ যোগ করি, যেমন, সিন্ধুতরঙ্গের তাণ্ডব ইত্যাদি তাহলেই দেখবো, যে সাধারণ সুখদ সংবেদন-নির্ভর সৌন্দর্যবোধ এক জায়গায় এসে থেমে যাচ্ছে, অর্থাৎ যেখানেই "মনের দান" মিশেছে সেইখানেই আমাদের মনে অন্যতর রসের সঞ্চার হচ্ছে। অন্যভাবে বলা যায় যে, সিন্ধু তরঙ্গের তাণ্ডবে আমাদের সত্তাকে ফুল বা প্রজাপতির চেয়ে অনেক বেশী দোলা দেয়। কারণ, কেবল সুখানুভূতির দ্বারা ঝনঝাক্ষুব্ধ সিন্ধুতরঙ্গের শোভা আস্বাদন করা যায় না। ইন্দ্রিয়বেদ্য সুখানুভূতির স্তরে যে সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা তা প্রাণ-কেন্দ্রিক, কিন্তু তার সঙ্গে যখন মানবব্যক্তিত্ব সামঞ্জস্য পায় অস্মিতাসূচক ভাবে, বা নাস্তির দিক থেকেও, তখন আমাদের সৌন্দর্যচেতনা সত্তার গভীরতাকেই, তার অসীম রহস্যকেই অপরূপ ভাবে প্রকাশিত করে।[৬৯]

৬৮। সাহিত্যের পথে / র. র. / শ. সং

৬৯। ধরা যাক কোলরিজের সেই প্রবীন নাবিকের কাহিনীর অনৈসর্গিক সামুদ্রিক অভিজ্ঞতা—যা মোটেই সুখকর নয়। অথচ কাব্যে তার আস্বাদনে আমরা পরাঙ্মুখ নই। বরং উৎসাহ বোধ করি। তার কারণস্বরূপ বলা যায়, যেমন বলেছেন Edward Bullough, যে এক আধ্যাত্মিক দূরত্ব (Psychic distance) সৃষ্টি হওয়ার ফলে আমাদের এই অভিজ্ঞতার শিল্পগত আস্বাদন সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু ঐ তথাকথিত দূরত্ব কেন হয় তার কোন সদুত্তর অধ্যাপক বুলো দেন নি। সেদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতবাদ অনেক বেশী গ্রাহ্যতার দাবী রাখে। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন "মনের দান", তার উদাহরণ দেখি যখন 'মেঘনাদ বধ'-এ রাবণের মুখে শুনি : 'কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, প্রচেতঃ' অথবা লীয়র যখন বলেন,—

Blow, winds, and crack your cheeks ; rage, blow,
You sulpherous and thought-executing fires,
Vaunt-couriers of oak-clearing thunderbolts,
Singe my white head.

যখন আমাদের আত্মোপলব্ধি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সত্তাকে এমন করে উপলব্ধি করি যার নিবিড় বোধে চৈতন্য উদ্বোধিত হয়ে ওঠে এবং এর দ্বারাই সমান হয় সুন্দরের। পাঠকের দিক দিয়ে যেমন, তেমনই স্রষ্টার দিক দিয়ে। সমুদ্র যে সমুদ্র সেটা সংবাদ, সেখানে ঔদাসীন্য সম্ভব, কিন্তু সৌন্দর্য যেখানে মানব ব্যক্তিত্বের দর্পণ হয়ে ওঠে, তখন তা সত্য, তাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। Whitehead প্রাকৃতিক ও মানবিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে বলেছেন,—

"The work of art is a fragment of nature with the mark on it of a finite creative effort, so that it stands alone, an individual thing detailed from the vague infinity of its background. Thus Art heightens the sense of humanity. It gives an elation of feeling which is supernatural. A sunset is glorious, but it dwarfs humanity, and belongs to the general flow of nature. A million sunsets will not spur on men towards civilization. It requires Art to evoke into consciousness the finite perfections which lie ready for human achievement." —*Adventures of Ideas*, p. 270

প্রকৃতি মানবিক তাৎপর্যেই শিল্পে স্থান পায়। রবীন্দ্রনাথের উপমা ব্যবহার করে বলা যায় যে মানবিক তাৎপর্যহীন প্রকৃতি বন্দিনী নিদ্রিতা রাজকন্যার মত—শিল্পের বা মানব স্রষ্টার সত্তাচৈতন্যের সোনার কাঠির পরশের অপেক্ষায় রয়েছে। ডঃ নারাভনে যাকে বলেছেন "reservoir of reality upon which art can most readily draw." *The Philosophy of Tagore*, p. 184

ডঃ শিশিরকুমার ঘোষ তাঁর Metaaesthetics গ্রন্থে এই মর্মে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন উপরিউক্ত আলোচনায় তার-ও নিরসন হয়।

আরও এক ধরনের সৌন্দর্য আছে যার ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও যা তাঁর সমগ্র সৌন্দর্যদর্শনের পরাকাষ্ঠা। 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যের শেষে রাণী রাজার কোন রূপ দেখে বলেছিল, 'বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে'। 'মানুষের মুখ'কে রবীন্দ্রনাথ এক বিশেষ দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যবহার করেছেন। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'এখানে শুধু চোখে চেয়ে সরাসরি রায় দিতে গেলে ভুল হবার আশঙ্কা। সেখানে সহজ আদর্শে যা অসুন্দর তাকেও মনোহর বলা অসম্ভব নয়। এমন কি, সাধারণ সৌন্দর্যের চেয়েও আনন্দজনকতা হয়তো গভীরতর। . . . তাকে চিনে নেবার জন্যে অনুশীলনের দরকার হবে।'[৭০] আমরা দেখছি যে, সহজ সৌন্দর্য থেকে চরম সৌন্দর্য পর্যন্ত আনন্দের বিস্তার। যে ক্ষেত্রে সত্তাবোধ বা আত্মোপলব্ধি যত নিবিড়, আমাদের শ্রেয় চৈতন্য ততই গভীর। সত্য ততই রূপবান, বিশিষ্ট ও চরিত্রসম্পন্ন। সহজসৌন্দর্যের ক্ষেত্রে সুখ ও দুঃখ বিপরীত কোটিতে অবস্থিত। আমাদের সৌন্দর্যবোধ যত গভীরে যায়, ততই সকল বৈপরীত্য আনন্দবোধে এক মহৎ ঐক্যে বিধৃত হয় এবং এই ঐক্য সত্তার সামঞ্জস্য থেকেই উৎসারিত।

কান্টের উপরোক্ত বিষয়ের আলোচনার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যার উৎকর্ষগত্ গ্রাহ্যতা অনেক বেশী। কান্টকে দুই প্রকার সৌন্দর্যের ব্যাখ্যায় দুটি বিভিন্ন প্রত্যয় প্রয়োগ করতে হয়েছে—Sublime ও Beautiful। তাঁর মতে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য হল যে, উভয়ই আনন্দজনক, এবং উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যয়নিরপেক্ষ আকৃতিবাক্য রচিত হয়। কিন্তু বৈসাদৃশ্য অপ্রতুল নয়। যথা, Beautiful এর ক্ষেত্রে কল্পনা (imagination) ও বুদ্ধির (understanding) প্রয়োগের সীমার মধ্যে থাকে। কারণ 'Beautiful'-এর আকার নির্দিষ্ট তাই কল্পনার অনুষঙ্গী এবং ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের (intuition) মাহাত্ম্যে প্রত্যয়াত্মক বৃত্তি যে বুদ্ধি, তার পরিধির অন্তর্গত। কিন্তু Sublime কল্পনা ও বুদ্ধিকে বিমূঢ় করে দেয়, কারণ Sublime নিশ্চিত কোন আকারে প্রতিভাত হয় না। বরং বৃহৎ সামগ্রিকতার (totality) বোধকে জাগ্রত করে, ফলে অন্যতর এক বৃত্তির (reason) অনুষঙ্গী ('exhibition of an indefinite idea of reason')। আবার Sublime-এর অভিজ্ঞতায় বিস্ময়ই মুখ্য, আনন্দ (Kant-এর অর্থে joy) গৌণ। কিন্তু Beautiful-এ বিস্ময় একেবারেই নেই। আর বিস্ময়ের প্রাবল্য হেতু Sublime-এর অভিজ্ঞতায় তাৎক্ষণিক বিস্ফোরণের সমতুল্য। অথচ Beautiful-এর ধ্যান শান্তচিত্তে আহ্লাদ সঞ্চার করে। শেষত, যাকে বলা হয় 'charm' বা প্রীতিকর তা Beautiful-এর থেকে পৃথক হলেও তার সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু যা প্রীতিকর তার সঙ্গে Sublime-এর কোন যোগ নেই। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, সহজ সুখদ সৌন্দর্য থেকে চরম সৌন্দর্যানুভূতি আনন্দের নিবিড়তারই প্রকার ভেদ এবং তা মাত্রাগত। সত্তার প্রকাশের পূর্ণতাই উৎকর্ষের মাপকাঠি।[৭১]

৭০। সাহিত্যের পথে / র. র. / শ. সং / ১৪শ খণ্ড / পৃঃ ৩৬২

৭১। "সৌন্দর্যবোধ যখন শুদ্ধমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়ের সহায়তা লয় তখন যাহাকে

দ্বিতীয়ত, মানবব্যক্তিত্বই সৌন্দর্যবিচারের প্রধান মৌল ধারণা, তাই আত্মোপলব্ধিই সৌন্দর্যসাধনার ও বিচারের মূল লক্ষ্য। তৃতীয়ত, সত্তাচৈতন্যে প্রকৃতি কি ভাবে স্থান পায় ও কি রূপ ধারণ করে, সে বিষয়ে তাঁর বক্তব্য হলো যে, মানবমনের সঙ্গে যুক্ত না হলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রশ্নই ওঠে না।[৭২] এবং এই যুক্ত হওয়ার মাত্রাই সৌন্দর্যের তারতম্যের নিয়ামক। চতুর্থত, মানুষই, শেষ বিচারে, শ্রেষ্ঠ শিল্পের আধেয়। কান্ট শিল্পে মানবপ্রকাশের বিষয়ে সন্তোষজনক কোন আলোচনাই করেন নি। তিনি ধারণাগত প্রকৃতির ভীষণতার মূর্তি ও তার অনুষঙ্গী ভাবনাতেই সৌন্দর্য খুঁজেছেন।[৭৩] মানবসত্তাই যে শিল্পে আমাদের দুনিবার ভাবে আকর্ষণ করে সেকথা কান্ট বিস্মৃত হয়েছেন। (রবীন্দ্রনাথের কাছে মানবপ্রকাশের মূল্যেই সৌন্দর্যের যাথার্থ্য নিরূপিত হয়।) পঞ্চমত, কান্ট বিস্ময়বোধ ও আনন্দচেতনা মেলাতে পারেন নি কারণ, চরম সৌন্দর্য তাঁর কাছে বিস্ফোরক স্বভাবের। অপর পক্ষে, ভারতীয় মানসে চরম সৌন্দর্য আমাদের এমন এক বৈশিষ্ট্য দান করে যার অধিকারীকে আমরা বলি 'বীতরাগ প্রশান্ত'[৭৪]: কারণ চরম সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতায় আমরা সত্তাচৈতন্যে অচলপ্রতিষ্ঠ হই, আর সেই জন্য, বিস্ময়-বোধ ও আনন্দচেতনা একীভূত হয়। আর কান্ট এও দেখান নি যে, দুঃখবোধ সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে স্থান পায় কি না। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু সৌন্দর্যসাধনার মূল খুঁজেছেন সত্তাচৈতন্যের সামঞ্জস্যে, সেই জন্য যা কিছু, তা সে সুখকর হোক বা দুঃখকর হোক, আমাদের সত্তার

আমরা সুন্দর বলিয়া বুঝি তাহা খুবই স্পষ্ট, তাহা দেখিবামাত্রই চোখে ধরা পড়ে। সেখানে আমাদের সম্মুখে একদিকে সুন্দর ও আর একদিকে অসুন্দর এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব একেবারে সুনির্দিষ্ট। তারপর বুদ্ধিও যখন সৌন্দর্য বোধের সহায় হয় তখন সুন্দর অসুন্দরের ভেদটা দূরে গিয়ে পড়ে। ...সেখানে আমরা চোখ ভুলান সৌন্দর্যের দাসখত তেমন করিয়া আর মানি না। তারপরে কল্যাণ বুদ্ধি যেখানে যোগ দেয় সেখানে আমাদের মনের অধিকার আরও বাড়িয়া যায়, সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্ব আরও ঘুচিয়া যায়। সেখানে কল্যাণী সতী সুন্দর হইয়া দেখা দেন, কেবল রূপসী নহে।" —সাহিত্য / র. র. / শ. সং / ১৩শ খণ্ড / পৃঃ ৭৫৯

৭২। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও ভীষণতা "আমাদের হৃদয়ের জিনিষ, প্রকৃতির জিনিষ নয়"।

৭৩। 'dynamical sublime' ও 'mathematical sublime'

৭৪। "Our passions are no longer dark and impenetrable powers; they become, as it were, transparent . . . the image of passion is not the passion itself, the poet who represents a passion does not imfect us with this passion . . . we are not at the mercy of (the) emotions ; we look through them ; we seem to penetrate into their very nature and essence. . . . It is not the degree of infection but the degree of intensification and illumination which is the measure of the excellence of art." —Ernst Cassirer, *An Essay on Man*, Chapter 9

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন যে, শিল্পের অনুভূতি "felt as unfelt"। শিল্পের অভিজ্ঞতায় কোন অনুভূতি একই কালে সুখকর ও দুঃখকর রূপে অনুভূত হয়। আমাদের হৃদয় বিদারিত না হয়েও আমরা 'হৃদয় বিদারক' ট্রাজেডি উপভোগ করতে পারি। এ ক্ষেত্রে সুখ ও দুঃখ মিশ্রিত হয় নি, আবার পাশাপাশিও নেই। সুখ অথবা দুঃখের অনুভূতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। ট্রাজেডির উপভোগ অনুভূতি বেদনা থেকে পৃথকীকৃত নয়, ওই বেদনাই উপভুক্ত হচ্ছে। কিন্তু দুঃখ বা বেদনা উপভোগ থেকে পৃথকীকৃত এই অর্থে যে, বেদনাই উপভোগ্য। দ্রষ্টব্য তাঁর *Studies in Philosophy*, The concept of value.

বোধকে নিবিড়তর করে; তাই শিল্প পরিণামে আনন্দজনক। আর এই আনন্দ উপরোক্ত কারণে সুখ ও দুঃখের চেয়ে ব্যাপকতর প্রত্যয়। অর্থাৎ, 'যে সত্যকে আমরা হৃদা মনীষা মনসা উপলব্ধি করি তাই সুন্দর। তাতেই আমরা আপনাকে পাই।' এবং 'আমি যে আমি, এইটে খুব করে যাতেই উপলব্ধি করায় তাতেই আনন্দ'। . . . 'দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেন না সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক।[৭৫] রবীন্দ্রনাথ একথাও বলবেন না যে, চরম সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতায় আমরা বিমূঢ় হয়ে যাই—কারণ তাঁর মতে সৌন্দর্যবোধ আমাদের অপরাপর বৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণতা দান করে। যথার্থ সৌন্দর্যবোধে চোখের সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে বুদ্ধির ও সর্বশেষ আধ্যাত্মিক দৃষ্টির যোগ হয়। আত্মা একাধারে জ্ঞান-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ। আর সত্তার অসীমতার উপলব্ধিই বিস্ময়জনক; তাই তাঁর মতে সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা মাত্রই অসীমের অনুভূতিব্যাঞ্জক।

রমণীয় ও পরম উভয় প্রকার সৌন্দর্যানুভূতিই তথ্যাতিক্রান্ত অসামান্যতার ভিত্তিতেই মূল্যবান—অর্থাৎ, আত্মার আত্মীয়তাই সৌন্দর্যানুভূতির প্রাথমিক শর্ত। কেবল আত্মীয়তার গভীরতা ও ব্যাপকতার দ্বারাই সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতার স্তরগুলিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অন্যকথায়, সত্তাচৈতন্যের উপলব্ধিতে সৌন্দর্যানুভূতির কোন স্তরই অনুপস্থিত নয়—কেবল তার নিবিড়তাই সৌন্দর্যানুভূতির চরমতার জ্ঞাপক। রবীন্দ্রনাথ বলবেন যে, Beautiful ও Sublime দুটি স্বতন্ত্র অনুভূতি নয়, একই অনুভূতির সাধারণ ও চরম রূপ। যাকে বলা হয় charm, ললিত বা রমণীয়—তাও সৌন্দর্যের সাধারণ রূপের প্রান্তেই অবস্থিত। কারণ যা ললিত রমণীয় তাও অবস্থা বিশেষে সৌন্দর্যের সার্বিক তাৎপর্য লাভ করতে পারে। "এই তো তোমার প্রেম ওগো হৃদয় হরণ, এই যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ।" অর্থাৎ apriori[৭৬] বস্তু নির্দেশ করে কদাপি Beautiful ও Sublime এর বিষয় স্থির করা যায় না। আর, সৌন্দর্যসাধনা যেহেতু শ্রেয়-সাধনা তাই চরম সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা আত্মোপলব্ধির নামান্তর। এবং চিত্তে সত্তার উপলব্ধির জড়তা দূরীকৃত হওয়ার উপর নির্ভর করে। সৌন্দর্যসাধনার প্রার্থনা 'নিঃশেষ জাড্যা-পহা'। কান্টের এই কথাও রবীন্দ্রনাথের স্বীকার্য হবে না যে, অনেক পার্থিব বস্তু যথার্থই

৭৫। সাহিত্যের পথে / র. র. / শ. সং / ১৪শ খণ্ড / পৃঃ ২৯২

৭৬। "... all sublimity... is an image of infinity.—'beautiful' too, though in a different way, is an image of infinite ... 'Beauty'... is the image of the total presence of the Infinite within any limits it may choose to assume ; sublimity the image of its boundlessness, and of its rejection of any pretension to independence or absoluteness on the part of its finite forms ("পাত্রখানা যায় যদি যাক ভেঙেচুরে") ; the one image of its immanence, the other of its transcendence ... we distinguish, for example, one kind of sublimity from another, and we must do so : but in the actual experience the single instance, these kinds often melt together ... In life, the imagination, touched at one point, all over and responds at all points... What it cares for is the truth that, when they are sublime, they are all the same ; for each becomes infinite, and it feels in each its own infinity."— A. C. Bradley, *Oxford Lectures on Poetry*, pp. 61-3

সুন্দর, কিন্তু চরম সৌন্দর্য কদাপি বস্তুগত নয়, একান্তভাবেই অনুভূতিগত। সুন্দর ও চরম সুন্দরের মধ্যে এই প্রভেদ রবীন্দ্রনাথের মতে অন্যায্য। কারণ, সুন্দর ও চরম সুন্দর দুইই অনুভূতিগত, এমন কি যা সহজ সুন্দর তাও। "অনুভূতির বাইরে রসের কোন অর্থই নেই।"[৭৭]

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, ভারতীয় মানসে পাশ্চাত্ত্যসুলভ Beautiful ও Sublime-এর দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক নয়, এবং রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় মানসিকতার অনুসারী বলেই, তাঁর পক্ষে একথা বলা সহজ: 'তুমি হৃদয়-পূর্ণ-করা ওগো, তুমিই সর্বনেশে'।[৭৮] ভারতীয় সৌন্দর্যধারণায় নটরাজ রুদ্র ও মধুরের মিলনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শিব-মহিম্নঃ স্তোত্রে বলা হয়েছে জগৎরক্ষার জন্য তুমি নৃত্য কর, 'জগদ্রক্ষায়ৈ ত্বং নটসি', অথচ, মহী 'পাদাঘাতদ্‌ব্রজতি সহসা সংশয়পদং'—তোমার পদাঘাতে মনে হয় বুঝি বা তৎক্ষণাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। 'ননু বা মৈব বিভুতা'—তোমার অতি বিপুলতাই বুঝি বা প্রতিকূল। 'তথাপি স্মর্তৃণাং বরদ পরমং মঙ্গলমসি'—তথাপি তুমি তোমার স্মরণকারীর প্রতি পরম মঙ্গলস্বরূপ। শংকরাচার্যকৃত 'হর গৌর্যাষ্টক'এ দৃশ্যগত ভাবে রুদ্র ও মধুরের মিলিত রূপ বর্ণিত হয়েছে। 'প্রপন্নপৃষ্ঠে সুখদাশ্রয়ায়ৈ, ত্রৈলোক্যসংহারক তাণ্ডবায়। কৃতস্মরায়ৈ বিকৃতস্মরায়ৈ' ইত্যাদি। চণ্ডীতেও বলা হয়েছে 'কেশোপমা ভবতু তেজস্য পরাক্রমস্য রূপঞ্চ শত্রু-ভয় কার্যাতিহারি কুত্র'। গীতার একাদশ অধ্যায়ে ভগবানের বিশ্বরূপ প্রদর্শন ও তারপর 'ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুঃ' পরস্পরবিরোধী নয়। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শনে যে Beautiful ও Sublime-এর দ্বন্দ্ব স্বীকৃত হয় নি তার কারণ তাঁর সৌন্দর্যধারণা উপরোক্ত উদাহৃত সংস্কারের অনুসারী। রবীন্দ্র-নাথ তাঁর 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায়' রূপের উদাত্ত রুদ্র ও ললিত রমণীয় প্রকাশের সামঞ্জস্য দেখিয়েছেন। এবং আমরা বলব যে, সুন্দরই সৌন্দর্যদর্শনের মূল প্রত্যয়—Sublime বহিরাগত ধারণা। সুন্দরের ধারণার মত Sublime-এর ধারণার apriori সৌন্দর্য-দর্শনের মৌল প্রত্যয়রূপে গণ্য হবার কোন কারণ নেই।

৭৭। সাহিত্যের পথে / র. র. / শ. সং / ১৪শ খণ্ড / পৃঃ ৩৫৫
৭৮। গীতবিতান / প্রকৃতি / ২২৫ নং

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মঙ্গল

ইতিপূর্বে আমরা সৌন্দর্যবিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে মঙ্গলের কিঞ্চিদধিক আলোচনাও করেছি। এখন সাধারণভাবে আমরা মঙ্গল প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্নের সমাধান লাভের চেষ্টা করব। তৎপূর্বে আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনার সারসঙ্কলন করলে ভাল হয়।

মঙ্গল শ্রেয় নীতির মূলপ্রত্যয় বা মঙ্গল শ্রেয়। মঙ্গল তার অহৈতুকী আকর্ষণের জন্য সৌন্দর্যের সমার্থক। তাই মঙ্গল সত্তাদর্শনের অঙ্গীভূত। আর সেই কারণেই, মঙ্গলের সামান্যলক্ষণ সামঞ্জস্য। মঙ্গল বলতে রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের নিকটবর্তী অন্তরতর সৌন্দর্য'[৭৯] বোঝেন। সৌন্দর্য ও মঙ্গলের মধ্যে যে সম্পর্ক তা আত্মা ও শরীরের মতো: 'সৌন্দর্য-মূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণ-স্বরূপ।'[৮০] আমরা বলতে পারি যে, মঙ্গল যেহেতু মানুষের অন্তরতর সৌন্দর্য, তাই মঙ্গলের অধিষ্ঠান বা তার উৎস মানব-সত্তার উদ্বৃত্তে। এই উদ্বৃত্ত প্রকাশধর্মী ও সৃজনশীল কর্মে প্রকাশিত। সেই জন্য মঙ্গল-কর্ম সৃজনশীলকর্ম। মঙ্গলকর্মে আমরা কখনও যথার্থ সৌন্দর্য বোধশূন্য হতে পারি না। আর মঙ্গলকর্মের দ্বারা আমরা সত্তার ঐশ্বর্যেরই পরিচয় পাই। অর্থাৎ মঙ্গলকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা আমাদের আত্মবোধ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অথবা বলা যায়, মঙ্গলসাধনা আত্মোপলব্ধির উপায়। এবং আত্মা বা মানবসত্তা সামঞ্জস্যস্বরূপ বলে মঙ্গলকর্মের অনুষ্ঠানে আমরা এক অখণ্ড ঐক্যবোধের অধিকারী হয়ে উঠি।

মঙ্গল পার্থিব গুণ নয়, আধ্যাত্মিক সত্য, তাই মঙ্গলময়তার বিচার আকৃতিবাক্যে প্রকাশ পায়, এবং কোনো জাগতিক তথ্যের মাধ্যমে 'মঙ্গল' প্রত্যয়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ 'মঙ্গল', 'ধর্ম' ও 'কল্যাণ' সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহার করেছেন। 'মঙ্গল' শব্দটি কর্মের বাচক ও সেই অর্থে অনুজ্ঞাসূচক। 'আমি কী করবো?'—এই প্রশ্নের যে উত্তর, তাতে একটি 'চোদনালক্ষণ' অথবা অনুজ্ঞা প্রস্তাবিত হয়। কারণ, আমি কী করি, তা আমার জানা, আর যা আমি জানি, সে প্রসঙ্গে 'আমি কী করব?' এই প্রশ্ন করলে পুনরুক্তি করা হয়। 'আমার কী করা উচিত?' তা আমার সচরাচর অনুষ্ঠিত কর্মের সমপর্যায়ের নয়। অর্থাৎ, যা আমি করি, এবং যা আমার করা উচিত—দুটি বিভিন্ন স্তরের কর্ম। যা আমি করি, তার কারণ শ্রেয়ত্ব, যদি না অন্য কোন উপায়ে সেই কর্ম সম্পাদনে আমি বাধ্য হই। অথবা অন্য ভাবে বলা যায়, ইষ্টসাধনতা জ্ঞান, কৃতি-সাধনতা জ্ঞান ও বলবদনিষ্ঠাননুবন্ধিত্ব-জ্ঞান যা আমি করি তার চিকীর্ষা রূপে

৭৯। সাহিত্য / র. র. / শ. সং / ১৩শ খণ্ড / পৃঃ ৭৫৬
৮০। সাহিত্য / ঐ / পৃঃ ঐ

ক্রিয়াশীল। সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ-প্রতিহারত্ব স্বেচ্ছাধীন কর্মের প্রবৃত্তি। কিন্তু আমার যা করা উচিত এমন কর্ম শ্রেয় অর্থাৎ ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের সঙ্গে কার্যতাজ্ঞানও উপস্থিত, এবং উভয়ের বিষয় অভিন্ন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, শ্রেয়ত্ব যে কর্মের প্রেরণা তার ইষ্টসাধনতা নির্ভর করে সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ-প্রতিহারত্বের উপর। কিন্তু শ্রেয় প্রেরণা রাগ ও দ্বেষ দ্বারা নির্ধারিত হয় না। রাগ ও দ্বেষ দ্বারা কর্মপ্রেরণা নির্ধারিত হলে তাকে প্রকৃত স্বাধীন কর্ম বলা যায় না। আর শ্রেয় কর্ম যেহেতু মুক্তিপ্রদায়ীরূপে ব্যাখ্যাত, সেই জন্য শ্রেয়কর্মের ক্ষেত্রে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান হয়। সে ইষ্ট ও শ্রেয় কর্মের ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের ইষ্ট এই দুয়ের মধ্যে বৈজাত্য আছে। এমন কি নিত্যসুখের কামনাও বন্ধনের হেতু। আবার, দুঃখদ্বেষও তাই। আমরা বলতে পারি যে শ্রেয়-কর্মের ইষ্ট 'অপ্রতিকূল' মাত্র।

শ্রেয় কর্মের ইষ্ট অপ্রতিকূল বলে তৎসংক্রান্ত বাক্যগুলি অনুজ্ঞাসূচক হয়। উপদেশ বাক্যের জন্য যুক্তি দেখান যায়—অর্থাৎ কোন অনুষ্ঠেয় কর্মের সুবিধা অসুবিধার তুলনামূলক বিচারের ফলে আমি তার ইষ্টসাধনতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারি। কিন্তু আদেশবাক্য যুক্তি-নিরপেক্ষ, কারণ আদেশবাক্যের ইষ্ট অপ্রতিকূল। বলা যায় যে, আমরা শ্রেয় সাধনায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্থির করি আমার কী করা উচিত, অর্থাৎ অনুকূল বা প্রতিকূল কোন প্রকার ইষ্টসাধনতাই সে ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এই স্বাশ্রয়ী সঙ্কল্পই, শ্রেয় নীতির বিধায়ক ক্রিয়া ও পরবর্তী অনুকূল ইষ্টাদির নির্বাচনের জনক।

এখন 'কর্ম' বলতে কী বোঝায় তা আরো একটু বিশদভাবে বুঝবার চেষ্টা করা যাক। প্রথমেই বলা যায় যে, কর্ম কোন ঘটনা নয়। অর্থাৎ কোন পরিবর্তন-পরিণামী তথ্যকে কর্ম বলা যায় না, যেমন ভূমিকম্প। কারণ, কর্মের জন্য কেউ না কেউ দায়ী থাকে এবং ভূমিকম্প বা ঐ জাতীয়, জলপ্লাবন বা দাবানল ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনার দায়িত্ব কোথাও স্থাপন করা যায় না। ঘটনা সর্বদাই প্রাকৃতিক আর তা থেকে কর্মের পার্থক্য নির্দেশক যে শব্দটি রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত তা হ'ল 'মানবিক'। অর্থাৎ মানুষের স্বেচ্ছাধীন পরিবর্তন পরিণামী ক্রিয়াকেই কর্ম বলব কারণ উক্ত কর্ম সম্পাদনের সঙ্গে কর্তার দায়িত্ববোধ ও ইষ্টানিষ্ট জড়িত। ব্যক্তিচৈতন্যের পটভূমি ব্যতীত কখনই শ্রেয় নীতির কর্মকাণ্ডের আলোচনা সম্ভব নয়। আবার, ব্যক্তিচৈতন্য নিঃসঙ্গ মানুষের চৈতন্য হলে চলবে না, সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে যে ব্যক্তি-চৈতন্য বিকশিত, সেই ভূমিকাতেই কর্মের বিচার সম্ভব। দেখা গেল যে, কর্মের একটি আশ্রয় প্রয়োজন যেটি পাওয়া যাচ্ছে ব্যক্তি-চৈতন্যে; আবার, ব্যক্তি-চৈতন্যেরও একটি আশ্রয় চাই যা পাচ্ছি সমাজে। রবীন্দ্রনাথ তথ্য ও সত্যের যে পার্থক্য প্রস্তাব করেছেন, এই প্রসঙ্গে তা স্মরণীয়। আমরা বলতে পারি যে, কর্ম কোন তথ্য নয়। কর্ম মানবব্যক্তিত্বের সত্য প্রকাশক সৃজনশীল ক্রিয়া। এই সত্যপ্রকাশের উপরই কর্মের অপকর্ষ-উৎকর্ষের বিচার করণীয়। মানবব্যক্তিত্বের সত্যপ্রকাশ দ্বি-মুখী, যথা, কোন কর্মের অনুষ্ঠানে মানুষ যে পরিমাণে উদ্বৃত্ত-জীবিত ও যে পরিমাণে অপরাপর মানুষের সঙ্গে সামঞ্জস্যসূত্রে গ্রথিত হয়, সেই পরিমাণেই উক্ত কর্মের উৎকর্ষ। কোনো

কর্মের অনুষ্ঠেয়ত্ব কল্যাণকর যদি সেই কর্ম দ্বারা মানুষ তার অহং-এর জৈবিকতা থেকে সত্তার উদ্‌বৃত্তের আত্মিকতায় উত্তীর্ণ হয়। আর এই উত্তীর্ণ হওয়ার অর্থ হ'ল মানুষের বিশ্বমানুষের (যা তার সত্তার অন্তর্নিহিত সত্য—'মনের মানুষ') সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

এই বিবরণের যাথার্থ্যের কারণ হ'ল যে, 'মানুষের মনে একটি মূল্যভেদের আদর্শ আছে যাতে আয়তনের বা পরিমাণের তৌল চলে না। মানুষের মধ্যে বস্তুর অতীত একটি অহেতুক পূর্ণতার অনুভূতি আছে একটা অন্তরতম সার্থকতার বোধ।' উদ্ধৃতির বিবৃতিমূলক অংশে যে মূল্যভেদের আদর্শের কথা বলা হয়েছে তা তথ্যগতভাবে ইতিহাসে, সমাজে ও ব্যক্তিচৈতন্যে সমর্থিত। আর 'অন্তরতম সার্থকতার বোধ'ই উক্ত আদর্শের অনিবার্যতা এবং 'পুরুষবিশেষণ'রূপে সঙ্কল্পের জনক। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, কার্যতাজ্ঞান বাহ্যিক নয়—আন্তরিক। কান্টকেও বুদ্ধিবহির্ভূত (non-rational) অনুরূপ একটি বোধ স্বীকার করতে হয়েছিল—'feeling of reverence for Moral Law'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেয় নীতির সঙ্গতি রক্ষা করেই 'মূল্যভেদের আদর্শ' ও 'অন্তরতম সার্থকতার বোধ'কে যুক্ত করেছেন। আবার ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের অনিবার্যতা বা কার্যতাজ্ঞান সংকল্পের স্বাশ্রয়িত্বের সঙ্গে যুক্ত। সংকল্পের স্বাশ্রয়িত্ব বা কৃতিসাধ্যতা মানুষের দ্বিকোটিক চরিত্রের দ্বারা নির্দেশ করা যায়। শ্রেয় নীতির আদেশবাক্যগুলির কার্যতাজ্ঞান জাগতিক কার্যকারণ দ্বারা প্রাপ্ত নয়। মানুষের নৈতিক অস্তিত্বকে উত্তীর্ণ হয়ে যে উদ্‌বৃত্ত,—দৈনন্দিন জীবনের তথ্যভিত্তিক চিন্তাকে অতিক্রম করে যে সত্তাচৈতন্যের সত্য, সেইখান থেকেই আসে আদর্শের উপলব্ধির কার্যতাজ্ঞান ও তৎসংক্রান্ত কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান। ইষ্ট ও কার্যতাজ্ঞানের মধ্যবর্তী পদ হ'ল স্বাশ্রয়ী সংকল্প। লোকব্যবহারের দ্বারা যদি ইষ্টের কার্যতার উৎস খুঁজি তাহলে বিভ্রান্ত হওয়ারই সম্ভাবনা। অর্থাৎ, মানুষ একাধারে কার্যকারণে আবদ্ধ অথচ স্বাশ্রয়ী সঙ্কল্পের জনকত্বে নিজেকে জীবধর্মসীমার অতিরিক্ত সত্তার অধিকারীরূপেও ভাবতে পারে। আর এই সত্তাচৈতন্যই মানুষের শ্রেয় নীতির মূল প্রেরণা। 'লোকসংখ্যা গণনা করিয়া যদি ওজন দরে মানুষের ধর্ম বিচার করিতে হয় তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে নিজের অন্ন পরকে দান করা মানুষের ধর্ম নহে; কেন না অনেক লোকই পরের অন্ন কাড়িবার বাধাহীন সুযোগ পাইলে নিজেকে সার্থক মনে করে। তবু আজ পর্যন্ত মানুষ একথা বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই যে দয়াই ধর্ম, দানই পুণ্য। . . . মানুষের চিত্ত তাহার কল্যাণকে সুদূর পর্যন্ত চিন্তা করিতে পারে।'[৮১] আমরা বলতে পারি যে লোক-ব্যবহার তথ্যমাত্র, কিন্তু স্বাশ্রয়ী সংকল্প দ্বারা সে তার শ্রেয় ধারণাকে সত্য বলে মনে করতে পারে। অর্থাৎ, জীবধর্মানুসারে কর্ম সম্পাদিত হলেই হবে না—সেই কর্মকে সত্য হতে হবে, আর কর্মের সত্য হওয়ার অর্থ হল সেই কর্মের আত্মিক তাৎপর্য থাকা—সেই কর্ম আত্মার মহত্ত্ব প্রকাশক কি না—সামঞ্জস্য সাধক কি না। অন্যকথায়, সেই কর্ম, আমাদের 'বিশ্বকর্মা' করে তোলে কি না। কর্মযোগে বিশ্বকর্মা হওয়ার অর্থ অনুষ্ঠিত কর্মের স্বরূপকে বিশ্বজনীন করে তোলা। কর্ম প্রাথমিক প্রস্তাবে স্বার্থনিয়ন্ত্রিত, কিন্তু শ্রেয়কর্ম বিশ্বজনীন;

৮১। সঞ্চয় / র. র. / শ. সং / ১২শ খণ্ড / পৃঃ ৫৪৭

অর্থাৎ আমাদের স্বার্থকে বিস্তৃত করে তোলা, আমিত্ববোধের বিচ্ছিন্নতা থেকে উদ্ধার করে বিশ্বব্যাপী মানবত্বের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করা, বিশ্বমানবের কল্যাণকর কর্মই কল্যাণ-কর্ম। এই ব্যাখ্যার অর্থ এমন নয় যে এই মতবাদ একপ্রকার সুখবাদ। কারণ, সুখ প্রেয় এবং তথ্যগত, তার পরিমেয়তা আছে। আবার, উপযোগবাদও নয়, কারণ, কল্যাণ-কর্মের অনুষ্ঠানে কি সংখ্যক লোকের উপযোগ সাধিত হচ্ছে সেই রকম কোনো পরিসংখ্যান বোঝাতে 'বিশ্বমানব' শব্দ রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন নি। রবীন্দ্রনাথ প্রযুক্ত 'বিশ্বমানব' শব্দটি কোঁৎ-এর আপাত-আধ্যাত্মিক 'হিউম্যানিটি'র সমগোত্রীয় ভাবলেও ভুল হবে। মানুষের জীবধর্মের অতিরিক্ত যে সত্তা, সে-ই বিশ্বমানবের প্রতিনিধি। 'মানুষের এই যে কল্যাণের মতি এর সত্য কোথায়। বিশ্বমানবমনে আছে। কিন্তু, সকল মানুষের সমষ্টি ভূত হয়ে বিশ্বমানবমনের মহাদেশ সৃষ্ট, একথা বলব না। ব্যক্তিমন বিশ্বমনে আশ্রিত, কিন্তু ব্যক্তিমনের যোগফল বিশ্বমানব নয়। তাই যদি হয় তাহলে যা কিছু আছে তাই হবে একান্ত, যা হতে পারে তার জায়গা পাওয়া যাবে না। অথচ যা হয় নি যা হতে পারে মানুষের ইতিহাসে তারই জোর তারই দাবি বেশী।'[৮২] অর্থাৎ বিশ্বমানব তথ্য নয়, সত্য এবং শ্রেয় নীতির ব্যাপকতম প্রত্যয়। উপরোক্ত যুক্তিপরম্পরা স্মরণ রাখলে 'বিশ্বকর্মা' হওয়ার বৈশিষ্ট্যটি বুঝতে পারা যাবে। 'বিশ্বকর্মার' কর্ম অসংখ্য ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থে সম্পাদিত কর্ম নয়—তাহলে কোন কর্মের কল্যাণকরতা-বিষয়ক বাক্য বিবৃতি বাক্য হ'ত। কর্মের কল্যাণকরতা 'প্রবর্তমান পুরুষ'-এর ইষ্টধারণা ও অভিসন্ধি দ্বারাই বিচার্য—যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'কল্যাণের মতি'। 'অমুক কর্ম কল্যাণকর'—বাক্যটি আকৃতিবাক্য। তাই একথা বলা যাবে যে, যে কর্ম কল্যাণের মতির প্রেরণায় সম্পাদিত তা ক্ষুদ্র হলেও বিশ্বজনীন, কারণ সেই কর্ম অপর কোন ব্যক্তির স্বার্থকে খণ্ডিত করে না। 'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা', আর সেই জন্যই সেই কর্ম সামঞ্জস্যসাধক। এখন তর্ক তোলা যায় যে, স্বার্থের খাতিরেও মানুষ এমন কর্ম সম্পাদনে নিরস্ত হতে পারে যার দ্বারা সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হব্‌স্‌-সুলভ এই মতবাদকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করবেন না। কারণ, ঐহিক অনিষ্ট নিবারণের জন্য যে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া, তা যথার্থ ঐক্য বা সামঞ্জস্য নয়। এই নীতিতে আমরা বহুত্বকেই পাই, সত্যকে পাই না। প্রকৃত ঐক্য বা সামঞ্জস্য শ্রেয়, কোন উপায়ে শ্রেণীর তথ্যরূপে তাকে পাওয়া যায় না।

যথার্থ সামঞ্জস্য উদ্‌বৃত্তের জগতেই লভ্য। আত্মীয়তার দ্বারা সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আর সুন্দর মাঙ্গল্যবাচক বলেই, মঙ্গল আত্মার বিভুত্ব-সূচক। আত্মার গভীরতম অনুভূতির ব্যাপকতায়, সত্তাচেতনার সর্বানুভূতিতে—যার পারিভাষিক নাম 'প্রেম'—সেই প্রেমই মঙ্গলের আশ্রয়। প্রেম শ্রেয় নীতির চরমতম প্রত্যয় এবং একাধারে ভাববাচক ও কর্মবাচক। প্রেমানুভূতি নিষ্ক্রিয় নয়, সক্রিয়। শ্রেয় নীতির মূল বিশ্বপ্রেম আর প্রেমের সক্রিয়তাই আমাদের বিশ্বকর্মা করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে কেন শ্রেয় নীতির চরমতম প্রত্যয়রূপে গ্রহণ করেছেন তার ব্যাখ্যায় বলা যেতে পারে যে, হৃদয়-বৃত্তির প্রসারের

৮২। মানুষের ধর্ম / র. র. / শ. সং / ১২শ খণ্ড / পৃঃ ৫৯২

ভিত্তিতে স্বার্থ ও পরমার্থের মৌলিক দ্বন্দ্ব নিরসন সম্ভব। প্রেম মানুষের স্বার্থবোধকে শোধন করে তার রূপান্তর ঘটায় এবং একথার যাথার্থ্য আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় দেখি। মানুষ যে সর্বতোভাবে স্বার্থপর তাও নয়। হব্‌সের মতবাদের কথা মনে রেখে তার বিরুদ্ধে হিউম একথা বলেছিলেন। কিন্তু মানুষের পরার্থপরতা বৃত্তির কোন কারণ তিনি দেখাতে পারেন নি, তাঁর বিশেষ দার্শনিক মতবাদের জন্য। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হিউমের মতবাদের সাধর্ম্য এই যে, তাঁরা উভয়েই মানবচরিত্রে স্বার্থপরতা ও পরার্থ-পরতার দ্বন্দ্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মানুষের স্বরূপ আলোচনায় দেখিয়েছেন যে জীবধর্মের অতিরিক্ত যে উদ্বৃত্ত, সেইখানেই মানুষের সত্য, আর ফলত, পরার্থপরতাতেই মানুষ সত্য হয়ে ওঠে; কারণ, তার দ্বারা মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করে। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যদর্শনের মত শ্রেয় নীতিতেও উপযোগবাদ স্বীকার করেন না সে কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। যেখানে হিউম বলবেন যে, পরার্থপরতার সামাজিক উপযোগিতা আছে, আর এই বাক্য তথ্যগত প্রমাণ ও পরিমেয়তা-নির্ভর বলে, মঙ্গলের সংজ্ঞা উপ-যোগিতার মাধ্যমে নির্দেশ করা যায় এমন সিদ্ধান্ত স্বভাবতই সম্ভব হবে। ফলে, মঙ্গল তথ্যে পর্যবসিত হবে, যা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করবেন না। কারণ, তাঁর মতে 'প্রেম' আধ্যা-ত্মিক সত্য, তথ্য নয়; 'এক আত্মার সঙ্গে আর-এক আত্মার যে সম্বন্ধ সকলের চেয়ে নিবিড়, সকলের চেয়ে সত্য, তাকেই বলে প্রেম'।[৮৩] এই আদর্শের যাথার্থ্য মানুষের স্বভাবা-নুযায়ী কারণ, এমন মানুষ দুর্লভ যে কখনো ভালোবাসে নি, স্বার্থত্যাগ করে নি, পরার্থে, তা সে স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু বা আত্মীয় যেই হক না কেন, কোন ত্যাগ স্বীকার করে নি। নিঃশেষে স্বার্থপর বলে মানুষের বিবরণ দেওয়া যায় না। এমন কি স্বার্থপরতার যে উদাহরণই আমরা গ্রহণ করি না কেন, পরার্থপরতার কোনো না কোন ভূমিকা সেখানেও পাওয়া সম্ভব। একদল দস্যু বিশ্বকে হরণ করতে পারে, কিন্তু পরস্পরকে হরণ করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের এই উদাহরণে যে ন্যায়গত যৌক্তিকতা সেইটিই পরার্থপরতার পক্ষে সর্বোচ্চ প্রমাণ। আরও বলা যায় যে, প্রেমে আমাদের সুখ দুঃখাদির অর্থ ভিন্নতর হয়ে ওঠে বলেই প্রেমের দ্বারা সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখপ্রতিহার লক্ষণাক্রান্ত যে স্বার্থবোধ তার শোধন এবং মঙ্গল কর্মে তার রূপান্তর সম্ভব। প্রেমের কর্মবাচকতার জন্যই প্রেম শ্রেয় নীতির চরমতম প্রত্যয়। প্রেমের আরও এক বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, প্রেমানুভূতি বিষয়কে আত্মসাৎ করে নিজেকে প্রকাশ করে। জ্ঞান মিলন আনতে সক্ষম নয়। জ্ঞানে, জ্ঞাতা জ্ঞানের বস্তু থেকে ব্যবধান রক্ষা করে থাকে, তাই জ্ঞানে যে ভাবে সত্যকে পাওয়া যায়, তাতে সত্তার অন্তরের স্পর্শ থাকে না। জ্ঞানে বস্তুকে জানি মাত্র, প্রেমে বস্তুকে পাই। আর এই পাওয়াতেই প্রাপ্তবস্তুর পরিবর্তন সম্ভব। কারণ, প্রেম কর্মেই নিজেকে প্রকাশ করে, আর প্রকাশ সৃজনশীল বলে তথ্য প্রেমানুভূতিতে জারিত হয়ে সত্য হয়ে ওঠে। প্রেম তার বিষয়কে অখণ্ড সমগ্রতায় আত্মসাৎ করে বলেই, উভয় অস্তিত্বের তাদাত্ম্য সমৃদ্ধ-

৮৩। মানুষের ধর্ম / র. র. / শ. সং / ১২শ খণ্ড / পৃঃ ৫৮৫

তর সৃজনশীলতায় প্রকাশ পায়। প্রেমানুভূতিতে নিজেকে পরের মধ্যে ও পরকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করার যে রহস্য—সেই রহস্যেই স্বার্থ ও পরমার্থের সামঞ্জস্য ঘটে।

উপরোক্ত ব্যক্তব্য স্মরণে রেখে আমরা এবার রবীন্দ্রনাথের শ্রেয় নীতির অন্য কয়েকটি বিষয় আলোচনা করবো। মনুষ্যত্বের মূল প্রকৃতি ও আত্মার দ্বন্দ্বের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সংজ্ঞার দিক থেকে স্বার্থ, বন্ধন ও সীমা প্রকৃতির অন্তর্গত আর পরমার্থ, মুক্তি এবং অনন্ত আত্মার অন্তর্ভূত। অর্থাৎ মানুষ পশু এবং মানুষ দুই-ই। কিন্তু মনুষ্যত্বই যেহেতু মানুষের যথার্থ পরিচয়, তাই মাঙ্গল্যবাচক পরমার্থ, মুক্তি ও অনন্তের অভি-মুখীনতাই রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োদর্শনের ক্ষেত্রে কার্যতাজ্ঞান। যাকে তিনি বলেছেন, 'মঙ্গল-লোকের আকর্ষণের বেদনা,'[৮৪] আমরা লক্ষ করবো যে, রবীন্দ্রনাথ কিরূপ দার্শনিকতার সঙ্গে মানুষের শ্রেয় ধারণাকে মানুষের সত্তার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছেন। অতএব, রবীন্দ্রনাথের মতে নৈতিক ঔদাসীন্য (moral neutrality) অসম্ভব। কারণ স্বার্থ ও পরমার্থের যে দ্বন্দ্বচেতনার উপর শ্রেয় নীতির মূল—সেই দ্বন্দ্বই মানুষের স্বভাবে বর্তমান। 'বিশেষকে মানে না বলেই সে বিশ্ব এবং সে বিশ্ব বলেই বিশেষের তাতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা।'[৮৫] বলা যায় যে, মানুষের শ্রেয় সাধনা সামঞ্জস্যের সাধনা, স্বার্থ ও পরমার্থের, বন্ধন ও মুক্তির, সীমা ও অনন্তের। এক কথায়, প্রকৃতি ও আত্মার সামঞ্জস্য। মানুষ অনুভব করে যে, 'বিচ্ছিন্ন আত্মা . . . বিচ্ছিন্ন পদের মত। তার একার মধ্যে তার তাৎপর্যকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। এই জন্যই আত্মা নিজের সত্যকে নানা-র মধ্যে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে।'[৮৬]

এই সামঞ্জস্য সাধিত হয় কর্মে। সামঞ্জস্যবিধায়ক কর্ম নিয়েই শ্রেয় নীতির কর্ম-কাণ্ড। এখন প্রশ্ন করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োদর্শনে কর্মের তাৎপর্য কি? কর্ম যেহেতু মানুষের দ্বারাই সম্পাদিত হয় সেজন্য মানুষের স্বভাবই কর্মে প্রকাশিত, এবং কর্মের সাধ্য আত্মোপলব্ধি। কর্মের সত্তা-বিচ্ছিন্ন কোনো মূল্য নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভারতবর্ষের ইতিহাস-বিষয়ক একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, যে 'ভারতবর্ষ কর্মের ক্রীতদাস নহে'। 'কর্ম যে অধীনতা সে কথা মানতেই হবে'। কর্ম সৃজনশীল হলেই তার সার্থকতা থাকে, নতুবা তা যান্ত্রিক। রবীন্দ্রনাথের মতে কর্ম সত্তার উপলব্ধিসাধক ক্রিয়া, কারণ, 'আমাদের স্বভাবেও . . . ভাববাচ্য ও কর্মবাচ্য দুই বাচ্যই আছে। আমরাও হই এবং করি। আমাদের হওয়া যতই বাধামুক্ত ও সম্পূর্ণ হবে আমাদের করা ততই সুন্দর ও যথাযথ হয়ে উঠবে।'[৮৭] কর্মের দ্বারা মানুষ তার সত্তার উদ্বৃত্তের অনন্ত সম্ভাবনাকে রূপ দেয় ও উপলব্ধি করে। আর এই রূপদান ও উপলব্ধি করাই হওয়া ও করার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন।

৮৪। শান্তিনিকেতন / র. র. / শ. সং / ১২শ খণ্ড / পৃঃ ৩৫৪
৮৫। ঐ / পৃঃ ৪৪১
৮৬। ঐ / পৃঃ ২১৫
৮৭। ঐ / ঐ / ঐ / পৃঃ ১৮২

কর্ম অপরিহার্য বলেই কর্মসন্ন্যাস সমর্থিত হবে না। কারণ কর্ম দ্বারাই মানুষ তার সত্তাকে পায়। কর্মের মধ্যে মানুষের বিরাট আত্মপ্রকাশ। 'কর্মকে ত্যাগ করা নয় কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের কর্মকেই চিরদিনের সুরে ক্রমশ বেঁধে তোলবার সাধনাই হচ্ছে সত্যের সাধনা, ধর্মের সাধনা।'[৮৮] কর্মের মধ্যে মানুষের যে দিকটি প্রকাশ পায় তা তার তপস্যার দিক। তপস্যার দুরূহতাই মানুষের আদর্শের মহত্ত্বের পরিচায়ক। মানুষ তার আদর্শকে যত সত্য বলে জানে, সেই পরিমাণেই সে সেই আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য দুঃখ স্বীকারে আনন্দ পায়। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।' রবীন্দ্রনাথ শ্রেয়সাধনাকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তার বৈশিষ্ট্য হল যে, আনন্দ শ্রেয়সাধনার পরিমাণজ্ঞাপক শুধু নয়, তার সাধনার ও উপলব্ধির তাদাত্ম্য। করা ও হওয়ার পরিপূরকতাই সাধনার পরিচয় ও প্রাপ্তি। 'চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে।' অতএব বলা যায় যে, কর্মযোগই সেই সাধনা যার দ্বারা মানুষ নিয়ত আপনাকে সৃষ্টি করে চলেছে 'তপোহতপ্যত'। কিন্তু এই তপস্যার লক্ষ্য আনন্দ, যা আত্মোপলব্ধিরই নামান্তর। কর্মে যে তপস্যা, তার পরিণাম মনুষ্যত্বের কোন অঙ্গের উচ্ছেদ সাধন নয়। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ পরিণতি।

সত্যোপলব্ধি মনে নির্বেদ জাগায় না, কর্মকে নিরোধ করে না, অবারিত করে। বৈরাগ্যবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট মত আমরা জানি: 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'। মানুষের বৃত্তি বহুমুখী, এবং মানুষের জীবনে বৃত্তিগুলির প্রভাব নিত্য ও ব্যাপ্ত। মানুষ কর্মপ্রবণ, কর্মে তার স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, এবং কর্মের মাধ্যমে সে নিজেকে সীমাহীন ভাবে প্রকাশ করে। উপনিষদে বলা হয়েছে, 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ'। আত্মার বিকাশই সাধনার লক্ষ্য। আত্মহত্যা সাধনার লক্ষ্য হ'তে পারে না। আর কর্মে আত্মার বিকাশ ঘটে বলেই কর্মত্যাগ তাঁর আদর্শ নয়। সংযম শিক্ষার অঙ্গ। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। সন্ন্যাস উপায় মাত্র, সন্ন্যাস উপেয় হলে আত্মপ্রবঞ্চনাকেই বরণ করা হয়। কারণ মানুষের বৃত্তিগুলি পরিপূর্ণতা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। 'ক্ষেত্রকে মরুভূমি করিবার জন্য চাষা খাটিয়া মরে না।' আবার, মনুষ্যত্বকে তুচ্ছ করে আচারের অচলায়তন সৃষ্টি ও তাতে আবদ্ধ হওয়া সৃষ্টিশীল জীবনের আদর্শ নয়। রিপু-দমনের জন্য নিয়ম, কিন্তু 'নিয়মটাকেই যাহারা, যাহারা পুণ্য মনে করে, তাহারা নিয়মের লোভে একেবারে লুব্ধ হইয়া ওঠে। নিয়মলোলুপতা ষড়রিপুর জায়গায় সপ্তমরিপু হইয়া দেখা দেয়'।[৮৯] যেহেতু মানুষের শ্রেয় বোধ মানবসত্তার অসীম উদ্বৃত্তে প্রতিষ্ঠিত, সেই জন্য কোন বিশেষ আচার অনুষ্ঠানই সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর হতে পারে না। কারণ তার দ্বারা আমরা অসীমের পরিবর্তে সীমারই উপাসনা করি। আরও বলা যায় যে, কোন আচার অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণভাবে মানুষকে অধিকার করতে পারে না বা কোন আচারগত তথ্য দ্বারা সমগ্র মানবজীবনের সার্থকতা ও সাধনা ব্যাখ্যাও হতে পারে না। তার দ্বারা মানব-

৮৮। শান্তিনিকেতন / পৃঃ ৩৮৯
৮৯। সাহিত্য / ঐ / ১৩শ খণ্ড / পৃঃ ৭৪৯

সত্তার বৈচিত্র্য ও সৃষ্টিশীলতাকে বন্দী করা হয়। স্মার্তকৃত্যের চেয়ে মানবকৃত্য শ্রেষ্ঠ—এই কথাটিকে বঙ্কিমচন্দ্র নূতন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাছাড়া, যে নিত্য সৃজনশীল সত্তাচৈতন্যের উদ্বৃত্তে সত্যোপলব্ধির আশ্রয়, তার প্রকাশ কর্মে, আর সেই জন্য কর্মের নিত্য নবীন ব্যাপ্তির মধ্যে দিয়েই সত্যেরও নিত্যনূতন বিকাশ ঘটেছে। সংকীর্ণ আচারের স্বার্থবন্ধনে বদ্ধ হওয়া যেমন কর্মের অসম্মান, সত্যস্বরূপকে পাওয়ার উপায়কেও দেশ-কাল-ব্যক্তি নির্বিশেষে চিরকালের জন্য অপরিবর্তনীয় ও অচল ভাবাও তেমনি সত্যের অপমান। রামেন্দ্রসুন্দর ঋত-র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, সত্য কাহারও অধীন নয়। তাই সত্য বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন রূপে প্রকাশমান, কারণ, তা চিরন্তন। সত্যের চিরন্তন রূপটি গতির থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। 'মুক্তি নানা মূর্তি ধরি দেখা দিতে আসে নানা জনে। এক পন্থা নহে।' কালান্তরে 'সত্যের যত পুঁজি' ফুরালে জীর্ণ মূল্যবোধকে আঁকড়ে থাকাই সত্যের অপমান। সত্যের বৈচিত্র্যকে আয়ত্ত করা যায় ব্যক্তির আত্মিক চেতনায়। কারণ এই চেতনা বিভিন্ন দিক থেকে খণ্ডকে অতিক্রম করে যায় ও জীবনের অখণ্ড চঞ্চল রূপ-প্রবাহের সমগ্রতাকে ধারণা করতে সক্ষম হয়। আর এই সামগ্রিক উপলব্ধিতেই মানুষের মনুষ্যত্ব। রবীন্দ্রনাথের আচার বিষয়ক মতবাদকে নিম্নলিখিতরূপে বিন্যস্ত করা যেতে পারে• মানুষ মুখ্যত আধ্যাত্মিক। তার কর্মযজ্ঞ তাৎপর্যে বাহ্যিক নয়। আন্তরিক। 'পুণ্য অন্তরের সামগ্রী এবং সে পুণ্যে পারত্রিক সদ্‌গতির কথাও স্থূল বস্তুতন্ত্রতা।' 'পরমার্থ সাধনাকে অশুচি করা হয় যখন সত্যের কোনো অঙ্গকে অশুচি কল্পনা করে ঘৃণার অন্ধ-সংস্কার রচনা'[৯০] করা হয়। 'শ্রেয়োবোধের অনুমোদিত শুচিতাকেই পালন করতে আমার প্রয়াস—যে বাহ্য আচার মানুষে মানুষে ভেদ ঘটিয়ে প্রাচীর তুলে বেড়ায় মানব-প্রেমকে, ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করে শাস্ত্রের অক্ষর বাঁচাবার জন্যে খুনোখুনি করতেও অগ্রসর হয় তাকে বর্জন করে নাস্তিক অধার্মিক পদবী নিতে আমার কোন সঙ্কোচ নেই।'[৯১] সংক্ষেপে বলা যায় যে, কর্ম নিত্য হোক বা নৈমিত্তিক হোক, তা যদি আধ্যাত্মিক সত্যের বিশুদ্ধতা ও সার্বভৌমিকতার বাহক হয় তাহলে তা অবশ্যই অগ্রাহ্য হবে। কিন্তু নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের তাৎপর্য যদি এই হয় যে, কতকগুলি এমন শ্রেয়কর্ম আছে যার কার্যতাজ্ঞান মানুষের স্বরূপেই নিহিত,[৯২] অর্থাৎ কোন প্রকার ব্যতিক্রমই যে ক্ষেত্রে গ্রাহ্য হবে না, সেই অর্থে রবীন্দ্রনাথ কোন আপত্তি করবেন না। আবার লক্ষণীয়, পতঞ্জলির 'জাতি-দেশ-কাল সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌম মহাব্রতম্'—রবীন্দ্রনাথের আদর্শ। তিনি সাধারণ ধর্ম ও বর্ণাশ্রম অস্বীকার করেন না। তবে উভয়ের সামঞ্জস্য'সাধনই তাঁর কাম্য। তিনি প্রেমের দ্বারা যেমন স্বার্থ ও পরমার্থের দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রয়াসী, তেমন-ই পতঞ্জলিও অহিংসাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। সার্বভৌম মহাব্রত যে অহিংসা, তার দ্বারা একাধারে লৌকিক শ্রেয় নীতির পরস্পর বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করে তিনি এমন এক শ্রেয়োদর্শন

৯০। চিঠিপত্র / র.র. / ৯ম খণ্ড / পৃঃ ৩০৫, পৃঃ ২৬৪
৯১। ঐ / ঐ / পৃঃ ২৬৫
৯২। Maitra, *The Ethics of the Hindus*, p. 20

স্থাপন করতে চেয়েছেন, যা ব্যাসভাষ্যানুসারে 'সর্বথাইব পরিপালনীয়া : সর্বভূমিষু সর্ববিষয়েষু' এবং অহিংসার দ্বারা আত্মকেন্দ্রিক কর্মসন্ন্যাসের পরিবর্তে আত্মার স্বাপ্রশ্লিষ্ট এবং মৈত্রী ও কল্যাণের সামঞ্জস্য-সাধন করেছেন। আধুনিক ভারতীয় শ্রেয় চিন্তায় বিশ্ব-মৈত্রী ও অহিংসার গুরুত্ব সর্বজনবিদিত।

মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ পরিণতিই রবীন্দ্রনাথের নিঃশ্রেয়স্। অর্থাৎ শ্রেয়োদর্শনে তিনি সমুচ্চয়বাদী। সাংখ্যের মতো তিনি বিবেকখ্যাতি মানেন না; শঙ্করের মত তাঁর পক্ষে কর্মের চিত্তশুদ্ধিগত মূল্যমাত্র স্বীকার করা সম্ভব নয়। বরং ন্যায় বৈশেষিক ও রামানুজের মত জ্ঞান ও কর্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। রবীন্দ্রনাথ আরও একটি উপকরণ যোগ করে বলেছেন জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি—এই তিন ধারার সমুচ্চয়। কর্মেই আমাদের স্বাভাবিক মুক্তি, কিন্তু কর্মকে জ্ঞানের সাহায্যে সত্যের অনুগত হতে হবে, কারণ 'ব্রহ্মহীন কর্ম অন্ধকার এবং কর্মহীন ব্রহ্ম ততোধিক শূন্যতা। . . . তাকে নাস্তিকতা বললেও হয়।'[৯৩] আবার কর্মহীন যে রসের সাধনা তাতে বিকারের আশঙ্কা আছে: 'যে প্রেম সম্মুখ পানে চলিতে, চালাতে নাহি জানে। যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন'—সেই প্রেম জীবনের পরিপূর্ণতাকে ব্যাহত করে। তাই সমুচ্চয়ের অর্থ হলো: "জ্ঞান যেদিন পুরোহিত হয়ে সত্যের সঙ্গে আমাদের শক্তির পরিণয় সাধন করিয়ে দেন তখনই আমাদের শক্তি সতী হন, তখন তাঁর বন্ধ্যাদশা থাকে না। তিনি সত্যের অধীন হওয়াতেই সত্যের ঘরে কর্তৃত্ব লাভ করতে পারেন।"[৯৪] এককথায় সত্তার উদ্‌বৃত্তকে 'অজস্র সহস্রাধিক চরিতার্থতায়' উপলব্ধি করা 'হৃদামনীষামনসা'।

মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতাকে অমৃতপদও বলা যায় কারণ, মানুষের দ্বিকোটিক যে চরিত্র তার একপ্রান্ত—যা জীবলীলা—মৃত্যুর অধিকারে, আর অপরপ্রান্ত—যা সত্তার উদ্‌বৃত্ত তা অমৃতের অধিকারে। এই অমৃতপদবীই ইষ্টসাধনতা: '- - - যাহা মুক্ত, যাহা আপনার আনন্দেই আপনাতে পর্যাপ্ত, দেশকালের দ্বারা যাহার পরিমাপ হয় না, জরামৃত্যুর দ্বারা অভিভূত হয় না। এই আনন্দের জোরে (কার্যতাজ্ঞান ও স্বরূপবিশেষণ) মানুষ একেবারে গভীরতম এমন একটি আপনাকে গিয়া স্পর্শ করে যাহাকে পাওয়া তাহার অত্যন্ত বড়ো-পাওয়া।'[৯৫] অমৃতপদবীতে অধিষ্ঠিত হওয়াকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ধর্ম'। মঙ্গলকর্ম ধর্মসাধনা, কারণ মঙ্গলকর্মের দ্বারা আমরা বিশ্বজীবনে প্রবেশ করি, সত্তাচৈতন্যে অধিষ্ঠিত হই। সত্তা সামঞ্জস্য-স্বরূপ বলে বিশ্বমানবতার ভূমিকাতেই তার উপলব্ধি। সত্তাই শ্রেয়, তাই ধর্ম শ্রেয়স্কর।

ভারতীয় দর্শনে 'ধর্ম' শব্দ নানা অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে।[৯৬] সাংখ্যমতে ধর্ম 'মনসোবৃত্তি-বিশেষম্'। পুরুষ ধর্মদ্বারা অসম্পৃক্ত, কারণ ধর্ম প্রকৃতির পরিণাম যে 'মনস্' তারই'

৯৩। শান্তিনিকেতন / র. র. / শ. সং / ১২শ খণ্ড / পৃঃ ১৬৯
৯৪। ঐ / ঐ / ঐ / পৃঃ ১৭৫
৯৫। সঞ্চয় / ঐ / ১২শ খণ্ড / পৃঃ ৫৩৮
৯৬। রামকৃষ্ণ-কৃত সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা

বৃত্তি। ন্যায়মতে ধর্ম 'আত্মনো বিশেষ গুণান্' অর্থাৎ কর্মের মতো বস্তুগত (objective) অপূর্বর মতো নৈর্ব্যক্তিক ইন্দ্রিয়াতীত (transcendental) পদার্থ নয়। ধর্ম কোন কর্মের বস্তুগত গুণও নয়। ধর্মের তাৎপর্য কেবল ব্যক্তিগত (subjective)। তাই কর্মের নৈতিক মূল্য নির্ধারণের জন্য অভিসন্ধির প্রয়োজন এবং প্রশস্তিপাদের মতে বিশুদ্ধ অভি-সন্ধি থেকে ধর্মের উৎপত্তি। বৌদ্ধমতে ধর্ম 'চিত্তস্য শুভম্ বাসনাম্'—যার ফলে ধর্মের তাৎপর্য কেবল ঐহিক ও মানসিক। কারণ চিত্ত ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থায় বাধিত হয়ে যায়। একমাত্র মীমাংসকরাই ধর্মকে বস্তুগত ও অর্থবান্ বা কাম্যরূপে গ্রহণ করেছেন। ধর্ম শুধু অর্থ, এমন অর্থ যা চোদনা বা বিধিবাক্য দ্বারা আদিষ্ট—'চোদনালক্ষণ: অর্থঃ ধর্মঃ'। প্রভাকর মতে ধর্ম পুণ্য ইত্যাদি শব্দের সমতুল্য না হওয়ার জন্য আত্মার গুণ বিশেষ নয়। আবার শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়াও নয়। নিয়োগের দ্বারাই ধর্মের প্রকাশ ঘটে ধর্ম একটি বস্তুগত অথচ অতীন্দ্রিয় পদার্থ। রবীন্দ্রনাথ 'ধর্ম' শব্দটি 'স্বভাব' অর্থে প্রয়োগ করেছেন। 'মানুষের ধর্ম' বলতে তিনি একাধারে মানুষের মনের শুভবাসনা এবং তার শ্রেয়, তার দেশকালাতীত সত্তাকেও বোঝান। অন্যভাবে বলা যায়, 'ধর্ম' তাঁর কাছে সত্তার সমার্থক শব্দ, মানুষের স্বরূপবাচক, কর্মের গুণ নয়, গুণের হেতু; একাধারে ব্যক্তিগত ও সার্বিক, ব্যঞ্জনার ব্যাপকত্বে মানুষের সমগ্র দ্বিকোটিক অস্তিত্বের বলয়। 'ধর্ম মানুষের পূর্ণশক্তির অকুণ্ঠিত বাণী'—অন্যকথায় বলা যায়, মানুষের জৈবিকতার তথ্যকে অতিক্রম করে যে সত্তার উদ্বৃত্ত—সেই অসীম সম্ভাবনাকে—মানবসত্যকে জ্ঞানে, প্রেমে ও শক্তিতে ক্রমশ উপলভ্য-মান করাই ধর্ম। ধর্ম একাধারে ভাববাচক। অর্থাৎ হওয়া ও করার সামঞ্জস্যই ধর্ম। উপায় ও উপেয় দুইই ধর্মের অন্তর্গত। দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথ 'ধর্ম' শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা যেমন মৌলিক তেমনি দার্শনিক সম্ভাবনায় পূর্ণ। তিনি 'ধর্মকে' এমন একটি প্রত্যয়রূপে ব্যবহার করেছেন যার প্রয়োগে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল—এই তিনটি ধারণাকেই ব্যাখ্যা করা যায়। এবং যেহেতু তাঁর কাছে শ্রেয়োদর্শন ও সত্তাদর্শন অভিন্ন, সেই জন্য ধর্মসাধনার তত্ত্ব দিয়ে সত্তার উপলব্ধি ও তার বিভিন্ন প্রকাশের বিবরণ দেওয়া সম্ভব। পূর্বে যে মন্তব্য করা হয়েছে তাকে ঈষৎ অন্যরূপে বলা যায় যে, সত্তার ধর্ম শ্রেয়, এবং ধর্ম শ্রেয়স্কর। অর্থাৎ ধর্ম সত্তা ও শ্রেয়ের সামঞ্জস্য। শ্রেয়বিহীন সত্তা মানুষের ধর্মে স্বীকৃত নয়। রবীন্দ্রনাথ আচার বলতে বুঝতেন, 'মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু কিন্তু অমনস্ক যান্ত্রিক বাহ্যিক আচার সম্বন্ধ-নাশক হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের শ্রেয় নীতির একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে তিনি কর্মকে সৃজনশীলতার নিরিখেই নৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন। তাঁর সৌন্দর্যদর্শনের মত তাঁর শ্রেয় নীতিতেও, সৃষ্টি শ্রেয় কর্মের সামান্য লক্ষণ। সৃষ্টি তাঁর মতে সামঞ্জস্যবোধের নিবিড়তার পরিণাম, ভেদবুদ্ধি তাই যান্ত্রিক। যে কর্ম ভেদবুদ্ধির জনকত্বে সম্পাদিত, তা আত্মার ঐশ্বর্যপ্রকাশক নয়; মৈত্রীর বিপরীত কোটিতে অবস্থিত, আর সেই কারণে অকল্যাণ, শ্রেয় সাধনার অর্থ হ'ল 'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু'—এই প্রার্থনাকে রূপ দেওয়া। 'চিত্তরাজ্যে যেখানে বুদ্ধিকে মানি সেখানে আমার স্বরাজ; সেখানে আমি নিজেকে মানি। অথচ সেই মানার মধ্যে সর্বদেশের ও

চিরকালের মানবচিত্তকে মানা আছে। অবুদ্ধিকে যেখানে মানি সেখানে এমন একটা সৃষ্টিছাড়া শাসনকে মানি যা না আমার, না সর্বমানবের।—ভেদটাই সকল দিক থেকে আমাদের মূল বিষাদ ও চরম অমঙ্গল। অবুদ্ধি হচ্ছে ভেদবুদ্ধি, কেন না চিত্তরাজ্যে সে আমাদের সকল মানবের থেকে পৃথক করে দেয়। আমরা একটা অদ্ভুতের খাঁচায় বসে কয়েকটা শেখান বুলি আবৃত্তি করে দিন কাটাই।'[৯৭] যে বুদ্ধি সকলকে সংযুক্ত করে সেই হচ্ছে শুভবুদ্ধি। রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োদর্শনের চলিষ্ণুতা তার উৎস হ'ল তাঁর মানবদর্শন। মানুষ মৌমাছি নয়। 'লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে মৌমাছি যে চাক তৈরী করে আসছে সেই চাক তৈরী করার একটানা ঝোঁক কিছুতেই সে কাটিয়ে বেরতে পারছে না। এতে করে তাদের চাক নিখুঁত মতো তৈরী হচ্ছে; কিন্তু তাদের অন্তঃকরণ এই চিরাভ্যাসের গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ হয়ে আছে, সে আপনাকে নানা দিকে মেলে দিতে পারছে না।...মানুষ তো মৌমাছির মতো কেবল একই মাপে মৌচাক গড়ে না। মাকড়সার মতো নিরন্তর একই প্যাটার্নে জাল বোনে না; তার সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি হচ্ছে তার অন্তঃকরণে—সেই অন্তঃকরণের কাছে তার পুরো দাবি; জড় অভ্যাসপরতার কাছে নয়।'[৯৮] উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে রবীন্দ্রনাথের দর্শনে শ্রেয় বিচারের স্বরূপটি সুন্দরভাবে বোঝা যায়। শ্রেয়-বাক্য তার মতে সত্যের বিবৃতিমূলক, তার সঙ্গে আকূতির মিশ্রণ থাকতে পারে, কিন্তু নিছক আকূতিবাক্যে শ্রেয়বোধ প্রকাশ পায় না। কারণ শ্রেয়বোধ ও সত্যবোধ অভিন্ন; তাই শ্রেয়বাক্য সত্যের বিবৃতিবাক্যও বটে। এইখানেই পাশ্চাত্ত্য আকূতিবাদীদের (emotionalist) থেকে তাঁর মতবাদের গ্রাহ্যতা ও পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ যে জঙ্গম শ্রেয় নীতির প্রবর্তক, সেই শ্রেয় নীতি শাশ্বত ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য বলে তিনি মনে করতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কথিত হয়েছে, 'চরন্বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্। সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরংশ্চরৈবেতি।' মধ্যযুগে কবীর বলেছিলেন, 'বহতা পানী নিরমলা বংধা গংদা হোয়। সাধ তো চালতা ভলা দাগ ন লাগৈ কোয়।' ভারতপথিকরূপে রবীন্দ্রনাথ শ্রেয় নীতির যে আদর্শ রচনা করেছেন তার মন্ত্র হলো: 'যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ। সঞ্চার করো সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ।' আর এর যে তপস্যার দিক, তার পরিচয় নিম্নরূপ:

> "চিত্তের গহনে যেথা দুরন্ত কামনা লোভ ক্রোধ
> আত্মঘাতী মত্ততায় করিছে মুক্তির দ্বার রোধ
> অন্ধতার অন্ধকারে উঠে সেথা মানবের বাণী
> বাধা নাহি মানি।"[৯৯]

'ধর্ম মানেই মনুষ্যত্ব—যেমন আগুনের ধর্ম অগ্নিত্ব, পশুর ধর্মই পশুত্ব। তেমনি

৯৭। কালান্তর / র. র. / শ. সং / ১৩শ খণ্ড / পৃঃ ৩১৩
৯৮। ঐ / ঐ / ঐ / ১৩শ খণ্ড / পৃঃ ২৯১
৯৯। বীথিকা, জয়ী

মানুষের ধর্ম মানুষের পরিপূর্ণতা।'[১০০] এই সংজ্ঞা মনে রেখে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করতে পারি। রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োদর্শনে পাপের কি স্থান? অন্যভাবে বলব, তাঁর শ্রেয়োদর্শনে পাপের কি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ এমন অভিযোগ করেছেন যে, "পাপসম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অস্পষ্ট . . . কুশ্রীতা ও নীচতার সঙ্গে প্রাণশক্তির দ্বন্দ্বের বর্ণনা তিনি দিতে পারেন নি।"[১০১] রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে এই জাতীয় অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। আর কেবল অবহিতই ছিলেন না, তার উৎস সম্বন্ধেও সম্যক ধারণা তাঁর ছিল। তিনি লিখেছেন: 'বিদেশীরা এবং তাঁহাদের প্রিয় ছাত্র স্বদেশীরা বলেন, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র পাপের প্রতি প্রচুর মনোযোগ করে নাই, ইহাই হিন্দুধর্মের অসম্পূর্ণতা ও নিকৃষ্টতার পরিচয়। বস্তুত ইহাই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। আমরা পাপপুণ্যের একেবারে মূলে গিয়াছিলাম। অনন্ত আনন্দস্বরূপের সহিত চিত্তের সম্মিলন। ইহার প্রতিই আমাদের শাস্ত্রের সমস্ত চেষ্টা নিবদ্ধ ছিল — তাঁহাকে যথার্থ ভাবে পাইলে এক কথায় সমস্ত পাপ দূর হয়, সমস্ত পুণ্য লাভ হয়।'[১০২]

প্রথমেই এ প্রসঙ্গে যে কথা বলা যায় তা হল, পাপের সমস্যার সমাধান প্রত্যেক দেশই সেই দেশের ধর্মীয় ও দার্শনিক পটভূমিতে করে। তাই পাশ্চাত্ত্যে পাপের সমস্যার যেরূপ তা গ্রীক ও খ্রীষ্টীয়, ভারতবর্ষে তার রূপ ভিন্নতর হতে বাধ্য। ভারতীয় দার্শনিক ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন চিন্তার ঐতিহ্যেই তার রূপ ও সমাধান নির্দেশ করবেন। আবার ঐতিহ্যানুসারে কোন ভূখণ্ডে পাপের সমস্যা জটিলতর আকার ধারণ করে, অন্যত্র ঐতিহ্য-ভিন্নতার জন্য অনুরূপ আকার নাও থাকতে পারে। দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন এমন কোন পাপের সমস্যার সমাধান থাকতে পারে না যা আদর্শরূপে যে কোন দার্শনিকের দর্শন-চিন্তায় প্রাপ্তব্য, এমন বলা যায়। তদুপরি, পাপের সমস্যা ব্যক্তিচৈতন্যকে আশ্রয় করে প্রকাশ পায় বলে, তার সমাধানে ব্যক্তিগত ইঙ্গিতটি বিস্মৃত হবার নয়। কারণ সেই ব্যক্তির কাছে উক্ত সমাধানই সার্থক। একের সমাধান অপরেরও সমাধানরূপে স্বীকৃত হবে এমন বলা যায় না। ব্লেকের সমাধান বোদ্‌লেয়ারের সমাধান হয় নি।

এখন দেখা যাক পাপের সমস্যাটি কী? পাপের সমস্যার ধর্মীয় ও দার্শনিক দুটিরূপ হতে পারে। প্রথমে ধর্মীয় সমস্যাটির আলোচনা করা যাক। শোপেনহাওয়ার বলেছিলেন যে, জগতে মৃত্যু না থাকলে দর্শন বা ধর্ম কিছুই সৃষ্টি হত না। ধর্মবোধ যে কেবল শ্রেয় প্রাপ্তি নয়, যা কিছু শ্রেয়বিরোধী তার প্রতিকারও বটে। ধর্মে পাপের সমস্যা দেখা দেয় দুভাবে। যদি শ্রেয়কে চরম বলে ভাবা না যায়, আর যদি শ্রেয়প্রাপ্তি দুরূহ হয়। পৃথিবীতে অসৎ এত বাস্তব যে আদি যুগে মানুষ দেবতাকে সদ্‌বস্তুর উৎস বলে ভেবেছিল। উচ্চতর ধর্মচিন্তায় পৃথিবীর অধিকার সদ্‌গুণাকর ইন্দ্র বা আহুরমাজদা ও অসদ্‌স্বভাবী বৃত্র বা আহ্রিমাণের দ্বন্দ্বে দ্বিধা বিভক্ত।

১০০। পত্রধারা, প্রবাসী, ১৩৩৯ ভাদ্র
১০১। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত রবীন্দ্রদর্শনের ভূমিকা
১০২। ধর্ম / র. র. / শ. সং / ১২শ খণ্ড, পৃঃ ২৪

একেশ্বরবাদে এই সমস্যা আরও জটিলতর রূপ ধারণ করে। ফলে বলতে হয় যে অসতের অস্তিত্ব নেই বা অসৎ কোন ভাবে সতের অনুগত। ধর্ম সাধারণত এক পাপঘ্ন ঈশ্বরের চিন্তায় ও তার কৃপায় পাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ নির্দেশ করে। পাপ অস্তিত্বহীন বা মায়া হলেও ধর্মের কাজ সহজ হয় না, কারণ তখন ঐ মায়াকে দূর করার কাজও সহজসাধ্য নয়। ধর্ম দার্শনিক উপায়ে সমাধান লাভে প্রয়াসী না হলেও, বাস্তবধর্মী সমাধান প্রস্তাব করে বলেই সৎ-অসতের দ্বন্দ্বাকীর্ণ পৃথিবীতে তার অন্যতম আকর্ষণ।

দর্শন সরাসরি এমন কথাও বলতে পারে যে, পাপের সমস্যাটি কাল্পনিক, ঈশ্বরের অস্তিত্বজ্ঞাপক অযথার্থ বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত রূপে প্রাপ্ত। তাই ওই অযথার্থ বাক্যকে অস্বীকার করলেই সমস্যার নিরসন হয়। উপরোক্ত মতবাদ না গ্রহণ করেও বলা যায় যে পাপের সমস্যা আস্তিক্যের বিশেষ সমস্যা। দার্শনিক ঈশ্বরবিশ্বাসী বা নিরীশ্বরবাদী হলেও এই সমস্যা তাঁকে বিচলিত করে। বৈজ্ঞানিক কোন আবিষ্কার শ্রেয়বিচারের অন্তর্ভূত বিষয় নয়। তা যুদ্ধের জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে আবার শান্তির জন্যও। দার্শনিক কখনোই শ্রেয় বোধ উত্তীর্ণ হতে পারে না, যেমন বৈজ্ঞানিক হয়ে থাকেন বা হতে পারেন বলে বলা হয়। দার্শনিককে তাঁর বিশ্ববীক্ষায় অভিজ্ঞতারাজ্যের যাবতীয় তথ্যকেই আশ্রয় ও ব্যাখ্যা দিতে হয় কোন-না-কোন প্রকারে। সত্য যেহেতু অখণ্ড, তাই সত্যান্বেষণ অভিজ্ঞতার কোন দিককেই অবহেলা করে সম্পূর্ণ হতে পারে না। পাপের অভিজ্ঞতা এমনই একটি দিক।

বিভিন্ন ধর্মে পাপের সমস্যার নিম্নপ্রকার সমাধানগুলি লক্ষ্য করা গেছে। যথা উদাসীনতা,— সত্তা বিশুদ্ধ সর্ব প্রকার সৎ-অসৎ-সম্পর্কশূন্য। আশাবাদ,— সত্তাই শ্রেয়, শ্রেয় চরম, অসৎ হয় মায়া নতুবা কোনরূপে শ্রেয়ের অনুগত। নৈরাশ্য,— সত্তা অসৎ দ্বারা কলুষিত, অসৎই চরম, শ্রেয় আপতিক। শেষত, সত্তা অংশত সৎ ও অংশত অসৎ, তবে শ্রেয় বলবৎ, ও তার ক্রমোন্নতি সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ উদাসীনতা স্বীকার করেন না। আশাবাদের সহজ সমাধানও তাঁর নয়। তিনি তপস্যাকে মানেন। নৈরাশ্যকে তিনি মানসিক রোগ বলে মনে করেন।[১০৩] আবার সত্তাকে তিনি শ্রেয় বলে ব্যাখ্যা করেছেন ও পাপ বা অসতের উৎস খুঁজেছেন মানুষের দ্বিকোটিক চরিত্রে। তাঁর জন্য 'অসতো মা সদ্‌গময়' সত্য প্রার্থনা এবং অনিবার্য। তাঁর সমাধানের বৈশিষ্ট্য বুঝি যখন আমরা লক্ষ করি যে, তাঁর মতে "জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেয়ের ক্ষুরধার—নিশিত দুর্গম পথে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করেছে। সে সাবিত্রীর মতো যমের হাত থেকে আপন সত্যকে ফিরিয়ে এনেছে। সে স্বর্গ থেকে মর্ত্যলোকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তবেই অমৃতলোককে আপনার করতে পেরেছে। ধর্মই মানুষকে এই দ্বন্দ্বের তুফান পার করিয়ে দিয়ে এই অদ্বৈতে অমৃতে আনন্দে প্রেমে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়। যারা মনে করে তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি তারা পারে যাবে কী করে। সেই জন্যই তো মানুষ প্রার্থনা করে, 'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়'। 'গময়' এই কথার মানে এই যে পথ পেরিয়ে যেতে

১০৩। *Sadhana*, p. 53

হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই।"[১০৪] রবীন্দ্রনাথ পাপকে মিথ্যা বলেন নি, তাঁর বিশ্ব-বীক্ষায় একে বর্জন করেন নি। পক্ষান্তরে, পাপকে উত্তীর্ণ হওয়াই তাঁর অভিপ্রেত। তাঁর মতে আনন্দের যে মঙ্গলরূপ তা অমঙ্গলকে অতিক্রম করেই, তাকে ত্যাগ করে নয়। আত্ম-অনাত্মের দ্বন্দ্বেই পাপবোধের মূল — সেইখানেই তার সমাধান পাওয়া সম্ভব। আমাদের জীবনে শুভাশুভের তাৎপর্য ব্যাখ্যাই উপরোক্ত সমস্যার সমাধান। দর্শনে আমরা অভিজ্ঞতার সর্বাঙ্গীণ ও সুবিন্যস্ত বিবরণ মাত্র দিতে পারি। বিবরণ যত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যথাযথ হবে ততই তার যাথার্থ্য। তবে সে বিবরণ ভারতীয় ঐতিহ্যেই বিধৃত হবে, নীলকণ্ঠ শিবের মূর্তি কোন-না-কোন ভাবে সেই সমাধানকে অনুপ্রাণিত করবে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের চিন্তায় ব্যক্তিচৈতন্যের খণ্ডদৃষ্টিই অশুভবোধের জনক। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হয়েছে, 'সর্বংহি পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ', অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্ সমস্তই দর্শন করেন এবং সর্বপ্রকারে সমস্তই লাভ করেন। সমস্ত দর্শন করাতেই যাবতীয় অশুভ অতিক্রম করা যায়। এই মন্ত্রে অশুভ অস্তিত্বহীন এমন কোন ইঙ্গিত নেই। খণ্ড-দৃষ্টিতে অশুভের যে তাৎপর্য, অখণ্ড দৃষ্টিতে সেই তাৎপর্য বাধিত হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে অশুভ কেন আছে'? এই প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের মতে অবান্তর, 'অশুভ চেতনা কি প্রকারে আবির্ভূত হয়?' সে প্রশ্ন অবশ্যই সার্থক। অশুভ বলতে আমরা কি বুঝি? রোগ, শোক, মৃত্যু, দুঃখ, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ইত্যাদি নানাবিধ বস্তু — এককথায় যা কিছু আমা-দের পীড়াকর অভিজ্ঞতা — তাই অশুভ। অশুভবোধ বিচ্ছিন্ন নয়, আনন্দবোধের সঙ্গে যুক্ত। আবার অশুভবোধ আমাদের মনে যে অনুভূতিগুলি জাগায় সেগুলি হ'ল অস্তিত্ব বিলোপ, কর্মের শ্রেয়হীনতা ও অসার্থকতার নিরানন্দ। কিন্তু অশুভ তখনই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় যখন ওই অনুভূতিগুলি চরমতার দাবী জানায় ও আমরা সেই দাবী মেনে নিতে প্ররোচিত হই। রবীন্দ্রনাথ বলবেন যে, উপরোক্ত অনুভূতিগুলির চরমতার দাবী অন্যায্য, কারণ চরমের অনুভূতি পীড়া দেয় না, তা সত্যের অনুভূতি, আর সত্য যেহেতু সামঞ্জস্য-স্বরূপ, তাই সত্যের অনুভূতি আনন্দ। লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ কদাপি এমন কথা বলেন নি যে, ওই অনুভূতিগুলি মিথ্যা। তাঁর বক্তব্য এই যে, অনুভূতিগুলি সত্যোপলব্ধির অপূর্ণতা-জাত। এখন দেখা যাক ওই অনুভূতিগুলি কেন চরম নয়। অস্তিত্ব বা সত্তা তাঁর মতে সত্য ব'লে তার বিলোপের প্রশ্ন ওঠে না, আর কর্ম সার্থক হলে সত্তার উদ্বৃত্তের প্রকাশক হয়, এবং কর্ম শ্রেয়হীন নয়, কারণ সত্তাই শ্রেয়। সত্তা প্রকাশধর্মী বলে সত্তার অপ্রকাশ পীড়াকর। প্রকাশের অস্পষ্টতা থেকেই মানুষ সর্বদা মুক্তি চাইছে। তাই বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের মতে অশুভবোধ সত্তার প্রকাশসাধনার অনুষঙ্গী তথ্য মাত্র। কিন্তু সত্য যেহেতু অসীমভাবে জীবধর্মকে অতিক্রম করে যায়, সেই জন্য সত্তাচৈতন্যে অশুভের তথ্যগত তাৎপর্যের রূপান্তর ঘটে। আবার, এমন মানুষ দুর্লভ যার জীবনের আদ্যান্ত অসার্থকতার ব্যাপ্তি। অসার্থকতা মানবজীবনের সত্য হলে মানুষের যাবতীয় কর্ম ও কর্মপ্রণোদনা শূন্যে মিলিয়ে যেত। প্রাকৃতিক ঘটনা, যথা ভূমিকম্প বা জলপ্লাবনকে অশুভ বলা যায়

১০৪। আত্মপরিচয় / র. র. / শ. সং / ১০ম খণ্ড / পৃঃ ২০৪

না। গান্ধীজীর সঙ্গে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতানৈক্য সুবিদিত। ভূমিকম্প ভূবিজ্ঞানের ঘটনামাত্র। এবং 'অশুভ' শব্দ শ্রেয় নীতির বহির্ভূত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে না।

আবার বৃহদারণ্যক যাকে বলেছেন "অক্ষরস্য প্রশাসনে" — সেই নিয়ম স্বার্থ সিদ্ধির ইচ্ছার বা 'অপ্রাপ্ত প্রার্থনার' অনুকূল না হলে আমরা তাকে অশুভ বলে থাকি, অর্থাৎ আমরা চাই যে, আমাদের ইচ্ছাপূরণের জন্য বিশ্বের যাবতীয় বস্তু তাদের 'ধর্ম' পরিবর্তন করুক। এও একপ্রকার সম্যক দৃষ্টির অভাব। আবার শারীর-বৃত্তির 'উপঘাত' বা দুঃখ-কেও অশুভ বলা যায় না। শ্রেয় বোধে দুঃখাদির স্বার্থগত তাৎপর্য পরিবর্তিত হয় ও মানুষকে শ্রেয় লাভের জন্য সানন্দে দুঃখ বরণ করতে দেখা গেছে। 'মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ। দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ। তোমাপানে যবে হইয়ে বিমুখ। আপনার পানে ধাই।' অর্থাৎ অশুভ স্বার্থদৃষ্টি-জন্য। স্বার্থ ও পরমার্থের সামঞ্জস্যেই অশুভ শিবত্বে রূপান্তরিত হয়। দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথ অশুভকে অস্বীকার করেন নি, এবং যে অভিজ্ঞতাগুলিকে আমরা অশুভ বলে থাকি সেইগুলিকে তিনি অলীকও মনে করেন নি। অশুভ যেহেতু মানবচৈতন্যেরই বিশিষ্ট বোধ তাই জাগতিক তথ্যরূপে তিনি অশুভকে দেখেন নি। তাঁর শ্রেয়োদর্শন এবং সত্তাদর্শন অভিন্ন বলে অশুভকে তিনি শ্রেয় চৈতন্যে স্থাপিত করে এবং অশুভের প্রত্যয়কে তাঁর সত্য-সম্পর্কিত ধারণার নিরিখে বিচার করে দেখিয়েছেন যে, অশুভ স্বার্থবোধের অন্তর্গত। উদ্বৃত্তের জগতে তার রূপান্তর ঘটে, কারণ তার স্বভাবই এমন যে, অশুভ 'মরে যায় আপনারি প্রকাশ লজ্জায়'।

ন্যায়সূত্রের বাৎসায়ন ভাষ্যে 'নাস্তিক্য'কে 'অধর্ম' বলা হয়েছে। নাস্তিক্য বলতে সংশয়বাদ বোঝায়। অর্থাৎ শ্রেয়ের চরমত্বে সংশয়। আবার 'মাত্রাদ্যাতিকর্মে'র দ্বারা 'আত্মানুশাসন' গ্রন্থের মতে 'ধর্মঘাতক' পাপের উদ্ভব হয়। যে কর্ম আত্মার ঐক্যের সঙ্গে অসমঞ্জস তাই পাপ, বা অশুভ। ভারতীয় দর্শনে কর্ম মাত্রই অশুভ নয়। স্বার্থবশেই মাত্রাদ্যতিকর্ম সম্পাদিত হয় এবং আমাদের শ্রেয় বোধের অখণ্ডতা থেকে বিযুক্ত ক'রে 'পাপবন্ধে' বদ্ধ করে। অভিসন্ধি দ্বারাই ভারতবর্ষে অশুভ বা পাপকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাহ্যিক তথ্য হিসাবে বা বিশ্বজাগতিক তত্ত্বরূপে নয়। মানুষের অন্তর্জীবনের দ্বন্দ্বেই অশুভের আবির্ভাব ও সেই দ্বন্দ্বের নিরসনে তার রূপান্তর। পাশ্চাত্যদর্শনে অ্যারিস্টটলও এক অর্থে মাত্রাতিরিক্ত সুখান্বেষণকে অশুভ বলেছিলেন। আল্ডুস হাক্সলি খ্রীষ্টীয় মতবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ... "the Fall . . . is due exclusively to the ego-centric use of a free will, which ought to have remained centered in the divine ground and not in the separate self-hood."[১০৫]

এবারে রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োদর্শনে অশুভের কি ভূমিকা তার আলোচনা করা যেতে পারে। জীবধর্মের সীমা উত্তীর্ণ হতে না পারাই অশুভ, কারণ তা শ্রেয়স্কর নয়। জীব-ধর্মের জগতে যা কিছু আয়োজন তা প্রয়োজনের দ্বারাই নির্ধারিত, যেমন কাম। কিন্তু

১০৫। Aldous Huxley, *The Perennial Philosophy*, p. 209

প্রয়োজনের বস্তু অস্থায়ী, প্রয়োজনাতিরিক্ত তার কোন আকর্ষণ নেই, যদি না উদ্বৃত্তের জগতে, শ্রেয়ের আলোকে তার পুনর্জন্ম বা দ্বিজত্ব ঘটে। পশুদের এ সমস্যা নেই। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে জীবধর্মের আয়োজনকে স্থায়ী করে তোলার প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক লোপ পেলেই পাপের উদ্ভব। যে বৃত্তি প্রয়োজনসাধনের সঙ্গে সঙ্গেই মরে না, "বাইরে যথাস্থানে যার একটি যাথার্থ্য আছে, অন্তরের মধ্যে সে পাপরূপে স্থায়ী হয়ে বসে।. . . যাকে যথাকালে বাইরে থেকে মরতে দেওয়াই উচিত তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বাঁচিয়ে রাখলেই নিজের হাতে পাপকে সৃষ্টি করা হয়।[১০৬] লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যের নিত্যানিত্যের দ্বন্দ্বেই শ্রেয় সাধনাকে ব্যাখ্যা করে, পাপের স্থানও নির্দেশ করেছেন। পশুরা অপাপ, কিন্তু মানুষের মধ্যে সত্তার সামঞ্জস্যবোধ অসীমে বিস্তৃত, আর তাই মানুষের মধ্যে পাপের বেদনা। সে বেদনা "মঙ্গল লোকের আকর্ষণেরই বেদনা।"[১০৭] অন্যভাবে বলা যায় যে, মানুষ যতই পায়, যতই তার আত্মপ্রকাশ ও প্রকাশের দ্বারা আত্মবিস্তার ঘটে, ততই তার আনন্দ, যা তার সত্তাচৈতন্যের মূল থেকে উৎসারিত। প্রকাশতত্ত্বের দিক থেকে পাপ "প্রকাশের দুঃখ"।[১০৮] তাই আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে "মানুষের সকল কান্নার মধ্যে বড়ো পাপের কান্না"।[১০৯]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন পাপ "অমিলের বেসুর" অর্থাৎ, সামঞ্জস্যবোধ ব্যাহত হলেই অশুভ জন্ম নেয়। অথচ বাহ্যিক কোন শক্তির দ্বারা এই সামঞ্জস্যবোধ ব্যাহত হয় না বা অশুভ সাধিত নয়। সামঞ্জস্যবোধ প্রেমের ধর্ম যা মানুষের শ্রেয়চেতনার চরম বিকাশ। শ্রেয় সাধনায় মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা জীবধর্মে ও উদ্বৃত্তের দোলাচলে অস্থির থাকে। এই অস্থিরতা থেকে মুক্তি আসে স্বাশ্রয়ী সংকল্পে, যে সঙ্কল্পের দ্বারা আমরা জীবধর্মকে অতিক্রম করে, প্রেয়কে উত্তীর্ণ হয়ে, শ্রেয়ের রাজ্যে প্রবেশ করি। ভাষান্তরে বলা যায়, নিয়ম ও স্বেচ্ছাধীনতার দ্বন্দ্বেই অশুভের জন্ম। পাপ আধ্যাত্মিককে বাহ্যিক ও পরমার্থকে স্বার্থ করে তোলে। শ্রেয় সাধনায় "পাপনামক শব্দের দ্বারা মানুষ নিজের যে একটি গভীরতম দুর্গতিকে ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে, ইহার দ্বারাই মানুষ আপনার সত্যতম পরিচয় দিয়াছে।"[১১০] উদ্বৃত্তের বিপরীতে যে জীবধর্ম, ভূমার বিপরীত যে অহং — জীবধর্মের কেন্দ্রাভিমুখীনতাই অশুভ বা পাপ, কারণ তার দ্বারা মানুষ, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ হয়ে তথ্যরূপে নিয়মবদ্ধ জীবমাত্র হয়ে পড়ে। কিন্তু শ্রেয় সাধনার দ্বারা মানুষ অহরহ এই দ্বন্দ্বকে নিরসন করতে প্রয়াসী। সৌন্দর্যের সাধনায় কুশ্রীতা, মঙ্গলের সাধনায় অশুভ উভয়তই অসামঞ্জস্য থেকে সামঞ্জস্যে উত্তীর্ণ হওয়ার সাধনা স্তরমাত্র। দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ অশুভ বলতে বিশ্বজাগতিক কোন তত্ত্ব বোঝেন নি, অশুভ তাঁর মতে একান্তভাবে অহংবোধ। এই বোধের অপূর্ণতা আত্মোপলব্ধির সাধনার সঙ্গে জড়িত, এবং তাঁর মানব-

১০৬। শান্তিনিকেতন / র. র. / শ. সং / ১২শ খণ্ড / পৃঃ ২০০
১০৭। ঐ / ঐ / ঐ / পৃঃ ৩৫৪
১০৮। ঐ / ঐ / ঐ / পৃঃ ৩৯৯
১০৯। ঐ / ঐ / ঐ / পৃঃ ৪০০
১১০। পথের সঞ্চয় / ঐ / ঐ / ১০ম খণ্ড / পৃঃ ৮৯৩

দর্শন অনুযায়ী মানুষ সর্বদাই তার সত্তার উদ্বৃত্তের শ্রেয় ও সত্যের দ্বারা অশুভকে উত্তীর্ণ হতে সচেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের দর্শনে 'সত্য', 'সত্তা' ও 'শ্রেয়' সংজ্ঞার্থে, উদ্বৃত্তগত, সামঞ্জস্য-লক্ষণাক্রান্ত ও প্রকাশাত্মক হওয়ায়, অশুভের অন্যতর ব্যাখ্যা তাঁর দার্শনিক মতবাদে অসম্ভব। তাঁর অশুভ ধারণা অগ্রাহ্য হবে তখনই, যখন তাঁর মৌল প্রত্যয়গুলির ভিন্নতর সংজ্ঞা প্রস্তাবিত হবে, এবং সেক্ষেত্রেও গ্রাহ্যতা ন্যায়গত না হয়ে ব্যক্তির অভিরুচিগত হবে। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যার যাথার্থ্য, তাঁর চিন্তার ও প্রস্তাবনার সুসংগতি ও কল্যাণকরতায়। 'ভবনে ভুবনে' আধাআধি অবস্থায় যে মানব-অস্তিত্ব, তার অন্তর থেকে নিরন্তর এই গানই উত্থিত হচ্ছে:

> এখনো গেল না আঁধার, এখনো রহিল বাধা।
> এখনো মরণব্রত জীবনে হলো না সাধা॥
> কবে যে দুঃখ জ্বালা হবে রে বিজয় মালা।
> ঝলিবে অরুণরাগে নিশীথ রাতের কাঁদা॥[১১১]

রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োদর্শনের আলোচনার শেষে আমরা কতকগুলি বিকল্প চিন্তা করতে পারি। যথা কল্যাণের তপস্যা ও সৌন্দর্যের সাধনা কি পরস্পর পরিপূরক, যে অর্থে কোন বিভিন্ন দুটি বস্তু পরস্পরের পরিপূরক হতে পারে। নীতিবাদীরা মঙ্গলেরই উপাসক ও আমরা দেখেছি যে তাঁরা সৌন্দর্য-সাধনাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। আবার শিল্পীরা, বিশেষত কলা-কৈবল্যবাদীরা বলেন যে, শিল্প কল্যাণকর কি না এ প্রশ্ন তাঁদের নয়। এমন বলা যায় কি যে, কল্যাণের তপস্যা ও সৌন্দর্যের সাধনার মধ্যে একটি পরাপরক্রম আছে, অর্থাৎ একটি অপরটির চেয়ে অধিক কাম্য, বা একটি অপরটির অপেক্ষা মহত্তর। যেমন গান্ধীজী কল্যাণের তপস্যাকে সৌন্দর্য-সাধনা অপেক্ষা সার্থক ও উচ্চতর ভাবতেন। আবার এমন বলা যায় কি যে, কল্যাণের তপস্যা ও সৌন্দর্যের সাধনা একার্থক। রবীন্দ্র-নাথের ক্ষেত্রে শেষোক্তটি ব্যতীত অন্যান্য বিকল্পগুলি গ্রাহ্য হবে না। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ ও সামঞ্জস্য দ্বারাই সুন্দর ও মঙ্গল উভয় প্রত্যয়ের সংজ্ঞা দিয়েছেন, ফলে 'সুন্দর' ও 'মঙ্গল' দুটি বিভিন্ন অনুভূতিজ্ঞাপক শব্দ হলেও একটু সত্তাচৈতন্যের ঐক্যজাত বলে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। অর্থাৎ এমন শিল্পীকে সার্থক বলা যাবে না যিনি কল্যাণের বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, এবং কোন মঙ্গলের সাধক যিনি সৌন্দর্যবিষয়ে নিরুৎসাহ তিনিও রবীন্দ্রনাথের মতে অচরিতার্থ। কারণ, 'সুন্দর' ও 'মঙ্গল' উভয়েরই তাৎপর্য সত্যোপলব্ধির এবং সে সত্য মানবসত্তা। তাই মানবজীবনের কোন অভিজ্ঞতাই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। আর এই কারণেই মনুষ্যত্বে পরিপূর্ণতা শ্রেয় সাধনার চরম লক্ষ্য।

এখন প্রশ্ন তোলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োদর্শনের আচরণগত আদর্শটি কি? ইতিহাসে তার কোন নিদর্শন আছে কি না। শ্রেয় নীতি কর্মাত্মক বলে শ্রেয় ধারণা যেখানে কর্মে প্রকাশিত হয়েছে বা যে ক্ষেত্রে প্রকাশিত হতে পারে এমন একটি আদর্শ (model)

১১১। গীতবিতান / ১৫১ নং

দেওয়া শ্রেয় নীতির প্রবর্তকের উচিত। রবীন্দ্রনাথের দর্শনালোচনার মহত্ত্ব এইখানে যে, তিনি কখনই জীবনের ও অভিজ্ঞতার ভূমি ত্যাগ করেন না, সর্বদাই দার্শনিক তত্ত্বের মূর্ত উদাহরণ সন্ধান করেন মানুষের অনুভূতিতে বা অন্যতর অভিজ্ঞতায়। সাধারণ দার্শনিক আলোচনা বিমূর্ত ও বস্তুতন্ত্রহীন, শুদ্ধ প্রত্যয়গত। এই পদ্ধতির পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ মূর্ত অভিজ্ঞতা অভিলব্ধ তথ্যের সাহায্যেই তাঁর দার্শনিক সিদ্ধান্ত সকলের গ্রাহ্য করে তোলেন। 'পাত্রাধার কি তৈল কিম্বা তৈলাধার কি পাত্র'—জাতীয় তর্ক যে তৈল ও পাত্র সম্পর্কহীন, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অসন্দিগ্ধ এবং তাকে অসার্থক মনে করেন।

রবীন্দ্রনাথ এইরূপ কোন কল্যাণময় আদর্শ চরিত্র (ethical model) নির্দেশ করবেন? আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেয় নীতির আদর্শ রূপটি পেয়েছিলেন বুদ্ধদেবের জীবনে ও বাণীতে। স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধদেব সম্পর্কে বলেছেন, "He stands as the perfection of the active type, and the very height to which he attained, shows that through the power of work we can also attain to the highest spirituality . . . we have no right to judge him. I wish I had one infinitesimal part of Buddha's heart."[১১২] রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে "সর্বশ্রেষ্ঠ মানব" বলে উপলব্ধি করেছিলেন। বুদ্ধদেবের সাধনা রবীন্দ্রনাথের মতে মনুষ্যত্বের পূর্ণতার সাধনা। কারণ "মানুষের সত্যস্বরূপ দেদীপ্যমান হয়েছে ভগবান বুদ্ধের মধ্যে। তিনি সকল মানুষকে আপন বিরাট হৃদয়ে গ্রহণ করে দেখা দিয়েছেন"।[১১৩] অর্থাৎ যে মৈত্রী ও প্রেম রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োদর্শনের চরমতম প্রত্যয়, তার প্রয়োগ ও সাফল্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বুদ্ধদেবের বাণী ও শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের ইহমুখী সদর্থক শ্রেয় নীতির অনুকূল হবে কি করে। উত্তরে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় আমরা বুদ্ধদেবের বাণীর এক নূতন অথচ স্বল্পপ্রচলিত ব্যাখ্যা পাই যা রবীন্দ্রনাথ মনে করেন বুদ্ধদেবের বাণীর যথার্থ তাৎপর্য। তিনি বলেছেন যে, বুদ্ধদেবের ব্রহ্মবিহারের যে উপদেশ তা প্রেমের অনুজ্ঞা, তা শূন্যগর্ভ নয়, তাই কোন বৈনাশিক আদর্শে উপনীত হওয়ার জন্য কোথাও প্রেমের ন্যায় সদর্থক নিবিড়তম অনুভূতিসূচক অনুজ্ঞা প্রস্তাবিত হতে পারে না। "সর্বভূতের প্রতি প্রেম জিনিষটি শূন্য পদার্থ নহে। . . . প্রেমের দ্বারা সমস্ত সম্বন্ধ সত্য এবং পূর্ণ হয়, কোন মতেই শ্রদ্ধেয় নহে।"[১১৪] বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের বাণীকেই গুরুত্ব দিয়েছেন, সাধারণ্যে প্রচলিত বৌদ্ধ দার্শনিক মতবাদগুলিকে নয়।

এবারে দেখা যাক, বুদ্ধদেবের বাণীতে রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োদর্শনের আদর্শ রূপটি কোথায়। আমরা দেখেছি যে, রবীন্দ্রনাথের মতে শ্রেয় সাধনা মানুষের আত্মোপলব্ধির সাধনা। মঙ্গল মানুষের অন্তরতম সৌন্দর্য। মঙ্গলকর্মের দ্বারা মানুষ তার অসীমের

১১২। *Selections from Swami Vivekananda*, pp. 321-2
১১৩। বুদ্ধদেব / র. র. / শ. সং / ১১শ খণ্ড / পৃঃ ৪৭০
১১৪। ঐ / ঐ / ঐ / পৃঃ ৪৮২

সম্ভাবনাকে দেশে কালে প্রকাশ করে, আর এই প্রকাশের দ্বারা মানুষ তার সত্তার উদ্বৃত্ত, তার আত্মার সীমাহীন বিস্তৃতি উপলব্ধি করে। প্রেমেই সেই বিশ্বাত্মক সামঞ্জস্যের অনুভূতিতেই 'মঙ্গলমুত্তমং' যার দ্বারা মানুষ স্ব-স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে আপনাকে জীবধর্মলোকের অতিরিক্ত উদ্বৃত্তে, সত্যে, সৌন্দর্যে ও মঙ্গলে অধিষ্ঠিত দেখি। রবীন্দ্রনাথের মতে এই হল মনুষ্যত্বের পূর্ণতা।

বুদ্ধদেবের বাণীতে এই সাধনার সিদ্ধির নাম 'ব্রহ্মবিহার'। ব্রহ্মবিহারের মূল ভাব 'বিশ্ব হতে বিমুখ হবার প্রণালী নয়, . . . সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম 'মেত্তিভাবনা'—'মৈত্রীভাবনা'।[১১৫] মৈত্রীভাবনার সর্বত্র বাধাহীন বিস্তারের ফলেই আত্মাকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। আত্মাকে মোহ থেকে, স্বার্থ থেকে মুক্ত করলেই ব্রহ্মবিহার সম্ভব। "অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে ব্রহ্মবিহার বলে। সে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়—মা তাঁর একটি মাত্র পুত্রকে যে রকম ভালোবাসেন সেইরূপ ভালোবাসা।"[১১৬]

এই আদর্শের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনবহিত ছিলেন না। তাঁর শ্রেয়োদর্শনের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে তিনি পরানৈতিক সত্তা স্বীকার করেন না। শ্রেয় সাধনা মানবিক সাধনা। তাঁর মানবদর্শনে পরামানবিক সত্তা স্বীকৃত হয় নি বলেই পরানৈতিক কোন অস্তিত্ব সত্তা নয়। তাই এই শ্রেয়োদর্শন জঙ্গম। বিশ্বমানবের যে সত্য বিশ্বমৈত্রীর আদর্শে রূপায়িত তা অসীম সম্ভাবনার, আর প্রতিদিনের কর্মের দ্বারা আমরা ক্রমশই সেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। মানুষের ধর্ম তার সীমাহীন উদ্বৃত্তে, তাই মানুষের মঙ্গলকর্মের মাধ্যমে আত্মোপলব্ধি কখনও শেষ হয় না। মানুষ মহাপথিক। "আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।"

১১৫। বুদ্ধদেব / র. র. / শ. সং / ১১শ খণ্ড / পৃঃ ৪৭৪
১১৬। ঐ / ঐ / ঐ / পৃঃ ৪৭৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঈশ্বর

রামানুজ ঈশ্বরকে কল্যাণগুণের আকররূপে দেখেছেন। 'ভগবান' শব্দেই ঐশ্বর্যের পূর্ণতা বোঝায়, তাই ঈশ্বর 'অখিল-হেয়-প্রত্যনীক' অর্থাৎ সকল অশুভ নাশ করেন। মানবিক শ্রেয় কূট ঐশ্বরিক কল্যাণের প্রতিচ্ছায়া এবং মানবিক কল্যাণগুণের পূর্ণতা ঈশ্বরের কল্যাণগুণাবলীতে। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য মানবিক শ্রেয়াদির 'ontological essence' বা সত্তাসার। এই ব্যক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাক রবীন্দ্রনাথের মতে ঈশ্বরের ধারণার উৎপত্তি হয় কিরূপে।

রবীন্দ্রনাথের মতে "মানুষ ভাবতে ভালবাসে, কোনো এক কালে তার শ্রেষ্ঠতার আদর্শ পূর্বেই বিষয়ীকৃত।"[১১৭] মানুষের স্বভাবজ এই আকাঙ্ক্ষা অসীম ভবিষ্যৎকাল ও অসীম অতীতকালের ব্যাপ্তিতে যাবতীয় কল্যাণের পূর্ণতার এক মূর্তি রচনা করে। "অনাদিতে যা প্রতিষ্ঠিত, অসীমে তাই প্রমাণিত হতে থাকবে।"[১১৮] কল্যাণের পূর্ণতার মূর্তিই ঈশ্বর। এই মূর্তিতে মানুষ তার মানবত্ব উপলব্ধি করে। কারণ "মানুষ আপন মানবিকতারই মাহাত্ম্যবোধ অবলম্বন করে আপন দেবতায় এসে পৌঁছেছে। মানুষের মন আপন দেবতায় আপন মানবত্বের প্রতিবাদ করতে পারে না। করা তার পক্ষে সত্যই নয়।"[১১৯] রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় মানবিক শ্রেয়চৈতন্য থেকে আমরা ঈশ্বরে পৌঁছাই। ঈশ্বরের ধারণার ইতিহাসে থাকতে পারে — তা তথ্য। কিন্তু অসীমে যখন আদর্শ কল্যাণমূর্তিকে আমরা স্থাপন করি, তখন তার ত্রিকালবিসর্পী রূপ আমাদের শ্রেয় সাধনাকে অনন্ত সার্থকতার দিকে আকর্ষণ করতে থাকে। কারণ, 'মানুষের সাধনা এক স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরের সাধনা।'[১২০]

এই কল্যাণমূর্তি ঈশ্বরের স্বরূপ কি? তিনি মানবব্রহ্ম। অথর্ববেদের উচ্ছিষ্টসূক্তকে আশ্রয় করে রবীন্দ্রনাথ মানবব্রহ্মের ধারণার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মানুষের আত্মিক সম্পদগুলি মানুষের সত্তার উদ্বৃত্তেই আভাসিত, এবং মানবসত্তা বিশ্বমানবিক সত্তার ঐক্যে বিধৃত। এই ঐক্য ইন্দ্রিয়াতীত ঐক্য। এই বিশ্বমানবিক সত্তা মানবিক ভূমা, মানবব্রহ্ম। ইনি বিশ্বমানব। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যক্তিমানবের আত্মোপলব্ধি ঘটে বিশ্বমানবের সঙ্গে সামঞ্জস্য বোধে, "Reality is human"

লক্ষণীয় যে, উপরোক্ত বিবরণ কয়েকটি পরা-দার্শনিক (metaphysical) সামান্য-

১১৭। মানুষের ধর্ম / র. র. / শ. সং / ১২শ খণ্ড / পৃঃ ৫৭৪
১১৮। ঐ / ঐ / ঐ / পৃঃ ঐ
১১৯। ঐ / ঐ / ঐ / পৃঃ ৫৮৪
১২০। ঐ / ঐ / ঐ / পৃঃ ৫৮০

বাক্যের বিন্যাস। এই সামান্য বাক্যগুলির কোন বিশেষ ধর্মীয় মতের দ্বারা সমর্থিত হওয়া বা না হওয়ার উপর এইগুলির যাথার্থ্য নির্ভর করে না, অথচ কোন-কোন ধর্ম চেতনাকে (ধর্মচেতনা সংক্রান্ত তথ্যকে নয়, যথা ধর্মীয় প্রতীকাদি) ও ধর্মীয় তত্ত্বকে উপরোক্ত সামান্য বাক্যগুলির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের মধ্যযুগের রহস্যবাদী সাধক ও বাউল সম্প্রদায়ের ধর্মচেতনার অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ, কয়েকটি পরাদার্শনিক সামান্য বাক্যের সমবায়ে গঠিত যথাক্রমে অপরাপর পরাদার্শনিক বাক্যের স্থান নির্দেশ করা যায় ও পরস্পরের সম্বন্ধও নির্ণয় করা সম্ভব। কারণ, সর্বত্র ব্যবহৃত পরাদার্শনিক প্রত্যয়গুলির যদি একটি কার্যকর সংজ্ঞা পাওয়া যায়, তবে ওই প্রত্যয়-প্রযুক্ত সামান্যবাক্যগুলি পরস্পর সম্বন্ধিত হবে। উপস্থিত ক্ষেত্রে বলতে পারি, যে রবীন্দ্রনাথের "মানুষের ধর্ম" কোন নূতন ধর্মমত নয়, বরং ধর্মচেতনার শ্রেয়োদর্শনগত মূল্যায়ন— Philosophy of religion।

এখন আমরা রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর-ভাবনাকে আরো একটু বিশদ করতে পারি। ঈশ্বর রবীন্দ্রনাথের মতে ঐক্যস্বরূপ। এই ঐক্য অদ্বৈত নয়।[১২১] অদ্বৈতবাদে পরমসত্য পার্থিব জগতের সঙ্গে সর্বসম্পর্কছিন্ন, আবার বহুত্ববাদীরা তাঁদের চরম সত্যগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত করতে অপারগ। অদ্বৈতবাদে পৃথিবী বিলুপ্ত হয়ে এক বিষয়হীন শূন্যতা পরম সত্যের দাবী জানায়, আর মানুষের এই ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে ও আমার আমিত্বের সঙ্গে যদি সেই সত্যের কোন যোগই না থাকে তাহলে তেমন সত্যে আমার লাভ কি?" "মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন?"[১২২]

আবার ঐক্য ভেদাভেদও নয়, কারণ ভেদাভেদবাদ মূলত সৌন্দর্যবোধেই সার্থক, ন্যায়ের দৃষ্টিতে তা স্ববিরোধী। অথচ, সৌন্দর্যানুভূতিতে তা সত্য। সংগীতে বিভিন্ন স্বরের প্রয়োগে সুরসৃষ্টি হয়, সাহিত্যে 'বিরোধাভাস' অলঙ্কার, চিত্রে বর্ণিকাভঙ্গে নানারঙের ব্যবহারে চিত্রের মূল ঐক্যটি প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ, সৃজনশীল কর্মেই বিরোধের ঐক্য সম্ভব, আর প্রেম এমনই এক সৃজনশীল কর্ম। যদি ভেদাভেদ বলতে বুঝি অভেদ ও ভেদ দুইই দুভাবে সত্য, তাহলেও রবীন্দ্রনাথ তা মানতে অসম্মত হবেন। কারণ, এই ন্যায়ে প্রকৃত অভেদ পাওয়া যায় না, এবং ভেদ ভেদরূপে না থাকলেও অভেদের সামগ্রীরূপে থাকছে। যদি বলা হয় যে, ভেদাভেদবাদ সত্য নয় কেবল তথ্যের খাতিরে স্বীকার্য, তার অর্থ হয় যে, বুদ্ধি দিয়ে সত্যকে জানার পদ্ধতি পরিত্যক্ত হল। বহুত্ববাদীদের রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করবেন যে, স্ব-সম্পূর্ণ সত্যগুলি কি প্রকারে পরস্পর যুক্ত, কারণ সামঞ্জস্যের যাথার্থ্য অস্বীকার করা যায় না, আর সামঞ্জস্যকে অস্বীকার করলে অসম্বদ্ধতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। যদি তাঁরা বলেন যে, ঐক্যের বুদ্ধিগত কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না, তাহলে রবীন্দ্রনাথের মতকেই সমর্থন

১২১। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'অদ্বৈত' শব্দ ব্যবহার করেছেন, তবে দর্শনের প্রচলিত অর্থে কখনই নয়।

১২২। মানুষের ধর্ম / র. র. / শ. সং / ১২শ খণ্ড / পৃঃ ৬১৩

করা হল। কিন্তু যদি তাঁরা বলেন যে, স্বসম্পূর্ণ সত্যগুলির মধ্যে সম্বন্ধগুলি বাইরে থেকে আরোপিত, তাহলে সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে নূতনতর সমস্যারই সৃষ্টি হবে। কারণ সম্বন্ধগুলির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন সত্যগুলির সম্পর্ক বিধানের জন্য অন্যতর আর এক শ্রেণীর সম্বন্ধরাজির প্রয়োজন। সমাধানকল্পে যদি কেউ বলেন যে, সম্বন্ধগুলি বিচ্ছিন্ন সত্যগুলির সম্পর্কবিধায়ক মাত্র তাহলে ন্যায়ের সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া হবে, আর তার কারণ বুদ্ধি দিয়ে বিচ্ছিন্ন সত্যসমূহ কিভাবে ঐক্য লাভ করে তার ব্যাখ্যা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যার দাবি পরিত্যাগ করলে রবীন্দ্রনাথের মতবাদকেই মেনে নেওয়া হয়, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যখন ঐক্যের কথা বলেন, তখন কোন বিমূর্ত সামান্য, অথবা গুণবাচক বিশেষ্য বোঝেন না। এই ঐক্য বরং বস্তুবাচক বিশেষ্যের মত যা বৈচিত্র্যের ব্যতিরেকে উপলব্ধ হয় না, অথচ বৈচিত্র্যের সমাহারে নিষ্পন্ন নয়। বলা যায় যে, সমবায় যেমন একটি পদার্থ, ঐক্য তেমন কোন পদার্থ নয়। সমবায়কে বাহ্যিক বলে যাঁরা ভেদাভেদবাদ প্রচার করেছিলেন, তাঁরা এর যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধি দিয়ে ঐক্যের ব্যাখ্যা দেওয়ার দাবি করেন নি। তাঁর কাছে ঐক্য বুদ্ধিগম্য নয়। বোধের বিষয়। সামঞ্জস্য একটি বোধ বা নিবিড়তম অনুভূতি। তা সংযোগ তো নয়ই, সমবায়ের মত কোন পদার্থও নয়, 'অপৃথক্‌সিদ্ধির' মতো কণ্টকর যুক্তি প্রয়োগ নয়। সামঞ্জস্যের বা ঐক্যের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। সামঞ্জস্য ও ঐক্য ভিন্নার্থক নয়। এমন হতে পারে না যে অসমঞ্জস ঐক্য বা ঐক্যহীন সামঞ্জস্য সম্ভব। দুটি প্রত্যয় কেবল যে সমব্যাপক তা নয়, তারা একার্থক। এই জন্যই মানবসত্তা বিশ্বমানবসত্তা থেকে পৃথক থাকতে পারে না, কেবল ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে নূতনতররূপে সজ্জিত হয়ে ওঠে। কারণ, যদি চারটি বস্তু থাকে ও তাদের অবস্থানের প্রকারে যদি একটি নক্সা ফুটে ওঠে, তাহলে যেমন বলা যায় না যে ওই বস্তুগুলি ছাড়া নক্সাটির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তেমনি, ঐক্যের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। এই ঐক্য ধর্ম, কারণ বিভিন্ন অগ্নিতে যেমন একই অগ্নিত্ব, তেমনই বিভিন্ন মানুষে একই মানবত্ব বর্তমান। যা কিছু ভিন্নতা তা মূল ঐক্যের পটভূমিতেই বিকশিত। ঈশ্বর তাই 'ধর্মস্যগোপ্তা'। বিশ্বমানবের মানুষের বাইরে কোন পৃথক সত্তা নেই, কারণ তাহলে তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো ঐক্যসম্বন্ধ থাকতো না। যদি বিশ্বমানবিক সত্তা মানুষের আন্তরিক না হন, তবে বিশ্বমানব ও মানুষের মধ্যে একটি সম্বন্ধ প্রয়োজন হয়। কারণ মানুষের ধর্মে বিশ্বমানব ঈশ্বর। সেক্ষেত্রে দুটি বিকল্প সম্ভব। এক, মানব ও বিশ্বমানবের সামঞ্জস্য যে সত্তায়, সেই সত্তাই প্রকৃত ঈশত্বের অধিকারী; দুই, বিশ্বমানবকেই উক্ত সামঞ্জস্য বা ঐক্যস্বরূপ বলে ভাবা যায়। প্রথমোক্ত বিকল্পটি অনবস্থা সৃষ্টি করে, শেষোক্তটিই রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর, যিনি সর্বগত অসীম, ব্যক্তি ও উদ্বৃত্তের অচ্ছেদ্য ঐক্য। সামঞ্জস্যই যেহেতু সত্যের সংজ্ঞা, তাই ঈশ্বর সত্যস্বরূপ। আবার প্রত্যেক মানুষই তাঁর প্রকাশ কারণ, সত্য সামঞ্জস্যেই প্রকাশিত এবং প্রকাশ সৃজনশীল, সেই ভাবে মানুষ তাঁর সৃষ্টি। প্রত্যেক মানুষই স্বরূপত বিশ্বমানব, এবং রবীন্দ্রনাথের দর্শনে ঈশ্বরের সংজ্ঞা বিশ্বমানবত্বে, সত্তাচৈতন্যের দিক থেকে ঈশ্বর আমাদের "মনের মানুষ" বা "জীবন

দেবতা"। বিশ্বমানব ও ব্যক্তিমানবের ঐক্য অচিন্ত্য প্রেম। বাউলরা বলেন "নিত্য-দ্বৈতে নিত্য-ঐক্য প্রেম তার নাম।"

এবারে আমরা মানুষ ও বিশ্বমানবের মধ্যের সম্পর্কটি বুঝবার চেষ্টা করতে পারি। বিশ্বমানব মানবধর্মরূপে মানবসত্তাতেই অনুভূত; ব্যক্তিচৈতন্য যা মুখ্যত আধ্যাত্মিক ও জীবধর্মগত অহং—এই একত্রে হ'ল মানব অস্তিত্ব। মানুষের আধ্যাত্মিকতা তার জীব-ধর্মাতিরিক্ত উদ্বৃত্তে, আর মানবসত্য হ'ল তার সত্তা ও শ্রেয়ের তাদাত্ম্য। সামঞ্জস্যবোধ তিনটি পর্যায়ে ক্রিয়াশীল। প্রথমত মানবব্যক্তিত্বের ঐক্য, বা ব্যক্তির অনুভূতিপুঞ্জ একটি বিশেষ চৈতন্যের অন্তর্গত হয়ে সত্তার স্বাদ দেয়। দ্বিতীয়ত, একটি মানুষের সঙ্গে আরেকটি বা একাধিক মানুষের ঐক্য, অর্থাৎ বিশেষ ব্যক্তিত্ব নিজেকে উত্তীর্ণ হয়ে অপরের মধ্যে আপনাকে অনুভব করে। যথা লৌকিক ও লোকোত্তর প্রেমের নানা প্রকারসমূহ। তৃতীয়ত, ঐক্যের বিশ্বব্যাপ্তি, ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে বিশ্বমানবের মিলন—যেটিকে মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যের সম্পর্কও বলা যায়—বিশ্বপ্রেম। সামঞ্জস্যবোধের ব্যাপ্তির পর্যায়গুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়—একটির মধ্যেই অপরটির সম্ভাবনা নিহিত, এবং সমগ্রভাবে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতা। আর এক একটি পর্যায় উত্তীর্ণ হওয়াতেই সেই পর্যায়টির সার্থকতা ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য। প্রশ্ন করা যায় যে, সর্বশেষ পর্যায়টিকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না? মানুষ সেইখানেই কেন থেমে যাবে? এর উত্তরে বলা যায় যে এই পর্যায়গুলি মানুষের সংজ্ঞা থেকে প্রাপ্ত এবং চরম বিকাশে অসীমের কোটিতে পৌঁছায়, যার চেয়ে 'পরতরং ন হি'। এই বিশ্বমানব পরমতম আধ্যাত্মিক সত্য বলে, তথ্যে অপরিমেয় এবং অভিজ্ঞতায় এর সীমা স্পর্শ করা যায় না। এইখানেই উদ্বৃত্তের প্রত্যয়গত যাথার্থ্য। অর্থাৎ মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিণতির কোন তথ্যগত সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, তাহলে অসীমের সম্ভাবনা দ্বারা মানুষের যে সংজ্ঞা পূর্বে দেওয়া হয়েছে তা বাধিত হবে। অথচ ঐক্যের অন্যান্য পর্যায়ে অনুভূতিগুলির অভিজ্ঞতায় একটি অপরটিকে নির্দেশ করে। মানুষের আত্মোপলব্ধির পূর্বাপরতা থাকতে পারে কিন্তু তার সীমা থাকতে পারে না।

এবারে দেখা যাক যে, বিশেষ মানব-ব্যক্তিত্বের স্থান বিশ্বমানবে কোথায়? বিশ্বমানবের সঙ্গে মানুষের মিলনে মানুষের ব্যক্তিচৈতন্যের, যা অহং নয়, অথচ একটি বিশেষ চৈতন্যবিন্দু, তার কি অবস্থা হয়। বিশ্বমানব যেহেতু মানুষের শ্রেয়ের পরম আশ্রয় —'শ্রেয়তম' তাই তিনি নির্বিশেষ হতে পারেন না। এখন এই সবিশেষ—'সর্বেন্দ্রিয় গুণাভাসম্'—ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষ মানুষটি যে আমি—তার সম্বন্ধ কি প্রকার? সাযুজ্যের প্রশ্ন অবান্তর, অথচ ঐক্যের যে অর্থ আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি তার অনুসারে ঈশ্বরের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মতে প্রেমেই মানুষ ও ঈশ্বরের মিলন। প্রেমের সম্বন্ধটি অবর্ণনীয় এবং অনুভূতিগম্য। আধুনিক পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রে যাকে Relations বলে তার কোনটির দ্বারাই প্রেমের সম্বন্ধটি ব্যাখ্যাত হয় না।[১২৩] প্রেম ঐক্যবোধের চরম-

১২৩। The relation of loving is probably reflexive in the set of all people ; — the relation of loving is not (Symmetric) — Patrick suppes, Introduction to Logic p.p. 213-4).

স্থিতি, এবং ঐক্যের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। তথ্যগত সম্বন্ধ, যেমন সমবায় ও সংযোগ—প্রেম তার কোনোটিই নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে যখন শ্রেয় বোধের জগতে স্থাপিত করেন তখন তাঁর দার্শনিক দৃষ্টির পরিচ্ছন্নতা বোঝা যায়।

আমরা বলতে পারি যে, একমাত্র প্রেমেই বিশেষ ব্যক্তিত্ব তার বিশিষ্টতা রক্ষা করে ও অপরের সঙ্গে মিলিত হয়। প্রেম একটি স্বাধীন সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রেমে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের নিজ নিজ স্বেচ্ছাধীনতাই ঐক্যানুভূতির জনক। আর প্রেমে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি অধীনতাকে বরণ করতে পশ্চাৎপদ হয় না। "ইচ্ছার মধ্যে স্বাধীনতার সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ স্বরূপ, সেই ইচ্ছার মধ্যেই অধীনতারও সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ মূর্তি।"[১২৪] ইচ্ছাশক্তির মাহাত্ম্যে "জগতের সর্বসাধারণের সঙ্গে সাধারণভাবে আমার মিল আছে। . . . কিন্তু এক জায়গায় আমার মিল নেই—যেখানে আমি হচ্ছি বিশেষ। . . . এর কোন দ্বিতীয় নেই। . . . এ কেবলমাত্র আমি। একলা আমি, অনুপম অতুলনীয় আমি। এই আমির যে জগৎ সে একটা আমারই জগত।"[১২৫] এই অতুলনীয় বিশেষ আমি-রূপ যে চৈতন্য তার স্বাশ্রয়ী সঙ্কল্পেই ঐক্যসম্বন্ধ শ্রেয় হয়ে ওঠে। বিশেষ ব্যক্তি চৈতন্যই সৃজনশীল সত্তার প্রথম উপপাদ্য। এই বিশেষ আমি বিচ্ছিন্নভাবে শূন্যতা, কিন্তু এই বিশেষ আমির চৈতন্যে যা কিছু 'আমি না', তার প্রতিঘাত। 'আমি' ও 'বিশ্ব আমির' মধ্যে নিত্য সম্বন্ধটিই প্রেম। "আমি আমাকে জানছি বলেই তার প্রতিঘাতে সকলকে জানছি এবং সকলকে জানছি বলেই তার প্রতিঘাতে আমাকে জানছি।"[১২৬] আরও লক্ষণীয় যে, এই 'অন্তহীন আমি মণ্ডলীর প্রত্যেক আমির মধ্যেই' 'বিশ্ব আমির' 'একটি বিশেষ রস বিশেষ প্রকাশ যা জগতে আর কোনখানেই নেই।'[১২৭] আর এই বিশেষ মানবব্যক্তিত্বের মাহাত্ম্য এমনই যে "আমি যদি হারাই তবে লোক লোকান্তরেও সমস্ত হিসাব গরমিল হয়ে যাবে।"[১২৮] 'আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি' বিশ্বের বসন্তের সমস্ত আয়োজনই ব্যর্থ হয়ে যাবে। "আমি নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে।" ধর্মচেতনায় এই রকম মানব-মাহাত্ম্য যে সর্বদা সহজলভ্য নয়—একথা স্মরণে রাখলে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার মূল্য বোঝা যাবে। লাইবনিৎস্ তাঁর Pre-established Harmony দ্বারা বহুত্বকে ঐক্যে বাঁধতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর জীবকণাগুলি (monads) ছিল বিরুদ্ধ এবং নিঃসঙ্গ, এবং তাঁর ব্যাখ্যাত ঐক্য আন্তরিক নয়, বাহ্যিক। আবার লাইবনিৎস্-এর ঈশ্বর জীব-কণাগুলির মধ্যে ওতপ্রোতও নন। তিনি স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যার গ্রাহ্যতা এই যে, তিনি নিত্যভেদ ও নিত্য ঐক্যকে মিলিয়েছেন প্রেমে। মানুষ মুক্তি পায় মিলনে, 'আপন হতে বাহির হয়ে বিশ্বে' দাঁড়িয়ে, লাইবনিৎস্-এর জীবনকণার মত সমবায় ও সংযোগের মধ্যবর্তী harmony-র সম্বন্ধে নয়। যদিও লক্ষ করার বিষয় যে, এই বিষয়টি

১২৪। শান্তিনিকেতন / র. র. / শ. সং / ১২শ খণ্ড / পৃঃ ১৫৩-৪
১২৫। ঐ / ঐ / ঐ / পৃঃ ১৪৮
১২৬। ঐ / ঐ / ঐ / পৃঃ ৩৭৮
১২৭। ঐ / ঐ / পৃঃ ৩৭৯
১২৮। ঐ / ঐ / পৃঃ ৩৭৯

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লাইবনিৎস্ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই সাংগীতিক উপমা ব্যবহার করেছেন "বীণার তারগুলো যখন বাজে না, তখন তারা পাশাপাশি পড়ে থাকে, তবুও তাদের মিলন হয় না; তখনো তারা কেউ কাউকে আপন বলে জানে না। যেই বেজে ওঠে ওমনি সুরে সুরে তানে তানে তাদের মিলিয়ে মিলিয়ে দেয়, তাদের সমস্ত ফাঁকগুলো রাগরাগিণীর মাধুর্যে ভরে ভরে ওঠে। তখন তারা স্বতন্ত্র, তবু এক—কেউ বা লোহার কেউ বা পিতলের তবু এক — কেউ বা সরু সুরের কেউ বা মোটা সুরের, তবু এক — তখন তারা কেউ কাউকে আর ছাড়তে পারে না। তাদের প্রত্যেকের ভিতরের সত্য বাণীটি যেই প্রকাশ হয়ে পড়ে অমনি সত্যের সঙ্গে সত্যের, প্রকাশের সঙ্গে প্রকাশের, অন্তরতর মিলটি সৌন্দর্যের উচ্ছ্বাসে ধরা পড়ে; দেখা যায় আপনার মধ্যে সুর যতই স্বতন্ত্র হোক, গানের মধ্যে তারা এক।" . . . ধন্য আমার প্রাণ যে, সেই অনন্ত আনন্দসংগীতের মধ্যে আমারও সুরটুকু জড়িত হয়ে আছে; এই আমিটুকুর তান সকল আমির গানে সুরের পর সুর জুগিয়ে মিড়ের পর মিড় টেনে চলেছে। . . . সকল আমির বিশ্বব্যাপী বিরাট্‌বীণায় এই আমি এবং আমার মত এমন কত আমির তার আকাশে আকাশে ঝংকৃত হয়ে উঠছে।"[১২৯] রবীন্দ্রনাথের দর্শনে মানুষের মনের জানলাগুলি বন্ধ নয়, খোলা।

উপমাটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পাই। (ক) তারগুলি ব্যতীত যেমন বীণার কোন অস্তিত্ব নেই, তেমনি মানুষ-অতিরিক্তভাবে বিশ্বমানবের কোন সত্তা নেই। কারণ আমরা পূর্বে দেখেছি যে, বিশ্বমানব পরম ঐক্য এবং ঐক্য কোন স্বতন্ত্র সত্তা নয়। সমগ্র মানবের সত্তা ও শ্রেয়ের তাদাত্ম্যই ঈশত্ব পদবী। স্পষ্টতই এই মানুষ তথ্যগত মানুষ নয়, এই মানুষ সত্য ও আধ্যাত্মিক। জগতে আমাদের সত্তা ও শ্রেয়ের তাদাত্ম্য উপলব্ধি করতে সাধনার প্রয়োজন হয়। অংশকে বাদ দিয়ে যেমন সমগ্রের ধারণা করা যায় না, তেমনি বিশ্বমানব যদি ঈশ্বর হন, তাহলে মানুষের অসীম ঐক্যই ঈশ্বর। মানুষের বাইরে বিশ্বমানবকে পাওয়া যায় না। প্রশ্ন ওঠা সম্ভব যে, বিশ্ব-মানব কি সর্বমানবের সমষ্টি? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সমষ্টি কথাটার ভুল বোঝার আশংকা আছে। এক বস্তা আলুকে আলুর সমষ্টি যদি বল তবে সে হোল আর এক কথা। মানুষের সজীব দেহ লক্ষকোটি জীবকোষের সমষ্টি, কিন্তু সমগ্র মানুষ জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আত্মানুভূতিতে জীবকোষসমষ্টির চেয়ে অসীম গুণে বড়।"[১৩০] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যখন 'বিশ্বমানব' বা 'পরমমানব' শব্দ প্রয়োগ করেন তখন তিনি কোন তথ্যগত সমষ্টিকে বোঝান না, তা নাহলে পরমমানব 'finite god' হয়ে পড়েন। ধারণাটিকে কিঞ্চিৎ বিশদ করা যেতে পারে। যদি 'ঈশ্বর' শব্দ দ্বারা আমরা পরিমাণগত সমষ্টি বুঝি তাহলে পৃথিবীর জনসংখ্যা গণনা করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে। একটি মানুষের মৃত্যুতে ঈশ্বরের ব্যাপ্তির সঙ্কোচন ও একটি মানুষের জন্মের দ্বারা তাঁর বৃদ্ধি সূচিত হবে। বিশ্বমানবকে যদি একটি শ্রেণী (class) বলে ভাবি এবং যদি তার সদস্যসংখ্যা ১ হয় এবং 'ক' যদি সেই সংখ্যা হয়, তাহলে 'ক'-

১২৯। শান্তিনিকেতন / র. র. / শ. সং / ১২শ খণ্ড / পৃ: ৩৮০ ও ৩৮১-২
১৩০। চিঠিপত্র, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১৭

এর অভাবে ঈশ্বর শূন্যে পরিণত হবেন। অর্থাৎ ১—১=০ আবার ০+১=১। কিন্তু বিশ্ব-মানবকে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য ন্যায়শাস্ত্রের class বলে ভাবা যাবে না, তাই শ্রেণীর ক্ষেত্রে যে গাণিতিক নিয়ম খাটে, ঈশ্বরের ক্ষেত্রে তা অপ্রযোজ্য। কিন্তু ঈশ্বর সেই পরম ঐক্য, যাঁর সম্বন্ধে বলা হয়, 'পূর্ণমদঃ, পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে'। তার অর্থ এই নয় যে, নূতনতর এক গণিতের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবিত হচ্ছে। যেহেতু বিশ্বমানব চৈতন্যগত, এবং চৈতন্যের আদমশুমারি হয় না, সেই জন্য যে পূর্বপক্ষ রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বমানব'কে পরিমেয় ঈশ্বর বলে ভাববেন, তিনি ভ্রান্ত ধারণারই বশবর্তী—এই কথাই প্রমাণিত হবে। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বমানব' একটি পরাদার্শনিক প্রত্যয়,

> "in reality he is the infinite ideal of Man towards whom men move in their collective growth, with whom they seek their union of love as individuals, in whom they find their ideal of father and beloved.[১৩১]

মানুষের অনুভূতিরাজীতেই এই অসীম পরম মানবের আবির্ভাব। মানসিক চৈতন্যসীমাকে অতিক্রম করে বিশ্বমানবকে জানা যায় না। যদি তাই হত তাহলে এই অসীম হতেন পরামানবিক এবং ফলত মানুষের ধর্মে তাঁর আরাধনা অসম্ভব হত। মানুষের শ্রেয় সাধনার বিস্তারে এবং মানবসত্তার উদ্বৃত্তেই পরমমানব অসীম ঐক্যরূপে উপলব্ধ হন।

> "It is not the magnitude of extension but an intense quality of harmony which evokes in us the positive sense of the infinite in our joy, in our love"[১৩২] এবং "infinite whose meaning is the positive ideal of goodness and love, which cannot be otherwise than human."[১৩৩]

পরামানব সকল মানুষে সর্বগত বলেই যে-মুহূর্তে আমার চৈতন্যপ্রসারের বাধক অহংকে অতিক্রম করি সেই মুহূর্তেই সামঞ্জস্য বোধের উন্মেষ। 'আমি' ও 'তুমির' উদ্বৃত্তগত সামঞ্জস্যই পরামানব। দেখা যাচ্ছে যে, ব্যক্তিত্ববিলোপকারী 'নানাস্তি কিঞ্চন' যে ব্রহ্ম তিনি বিশ্বমানব নন,[১৩৪] আবার মানব-অতিরিক্ত যে ঈশ্বর, তিনিও রবীন্দ্রনাথের উপাস্য নন, এবং পরামানবকে পরামানবিক সচ্চিদানন্দও বলা যায় না। তাহলে রবীন্দ্রনাথ কি নাস্তিক? রবীন্দ্রনাথকে দার্শনিক প্রস্তাবে নাস্তিক আখ্যা দেওয়া অসম্ভব, কারণ তিনি সত্তাকে তথ্য থেকে সযতনে পৃথকীকৃত করেছেন। সত্য তাঁর কাছে পরাদার্শনিক সত্তা। তদুপরি, রবীন্দ্রনাথ মানবসত্তার উদ্বৃত্তে ও জীবধর্মসীমার উত্তরণে (transcendence)

১৩১। *Religion of Man*, p. 165.

১৩২। *Religion of Man*, p. 66.

১৩৩। *Religion of Man*, p. 70.

১৩৪। "... religion is not essentially cosmic or even abstract, it finds itself when it touches the Brahma in man ; otherwise it has no justification to exist." — *Religion of Man*, p. 63.

বিশ্বাসী। তাঁর মতে মানুষের সত্যপরিচয়ের জন্য মানুষের উত্তরণের সাক্ষ্য প্রয়োজন। মানুষ ও জড়তথ্যের সমীকরণকে তিনি ভ্রান্ত-দর্শন বলেই মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ শ্রেয় সাধনাকে সুখবাদ ও উপযোগবাদের সমার্থক ভাবেন নি। তাঁর মতে শ্রেয় তথ্য নয়, সত্য। শ্রেয়ত্বজ্ঞাপক বাক্য কেবল আকৃতিজ্ঞাপকই নয়, সত্যের বিবৃতিমূলকও বটে। নাস্তিক্যের বিষয়ে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ অসীম বলতে কদাপি "an indefinite enlargement of the limits of things" বোঝান নি, পক্ষান্তরে, তাঁর মতে অসীম মানুষের সৃজনশীল সত্যের উদ্বৃত্ত, শ্রেয় চৈতন্যের পরম আদর্শ, যা স্বরূপত ঐক্য এবং যার প্রকাশ নিবিড়তম অনুভূতিতে, প্রেমে। বস্তুত, উপরোক্ত লক্ষণগুলি নাস্তিকতার প্রস্তাব নয়। তবে ভারতীয় দর্শনে 'নাস্তিক' শব্দের একটি পারিভাষিক অর্থ আছে, যে অর্থে স্বয়ং বুদ্ধদেব নাস্তিক। এ নাস্তিক্য ধর্মীয় সংজ্ঞা-গত নয়। এই অর্থেও বোধ হয় রবীন্দ্রনাথকে নাস্তিক বলা চলে না। কারণ, তিনি "বেদ-নিন্দুক' ছিলেন না, এবং উপনিষদোক্ত 'পুরুষের' প্রতি তাঁর আকর্ষণ প্রবল। কেবল তিনি স্বানুভূতি দ্বারা সেই 'মহান্তপুরুষের' স্বরূপ অন্যতর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কোন প্রচলিত আচার্যকে অনুসরণ করেন নি।'[১৩৫] আবার 'বৈষ্ণব সাহিত্য এবং উপনিষৎ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরী করিয়াছে।[১৩৬] কিন্তু বৈষ্ণবধর্মের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় অনুভূতির সততাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তাঁর 'ব্যক্তিত্ব-তত্ত্ব' তাঁকে বৈষ্ণবধর্মের মঞ্জরীভাবের সাধনা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে নি। আমরা বলতে পারি যে, উপনিষৎ রবীন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তার প্রস্থানভূমি, আবার বৈষ্ণবীয় প্রেম ও মিলনের তত্ত্ব তাঁর দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়, অথচ স্বীকরণে, ব্যাখ্যায় ও প্রয়োগে তাঁর সচেতন মৌলিকতা। আবার, তাঁর ঈশ্বরবাদকে ইহুদী বা খ্রীষ্টীয় ঈশ্বরবাদের সঙ্গেও তুলনা করা যায় না। প্রথমোক্ত ধর্মে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ প্রেমাস্পদের নয়, তিনি মুখ্যত মানুষের অন্যায় কর্মের বিচারক। দ্বিতীয়োক্ত ধর্মে ঈশ্বর করুণাময় ও প্রেমস্বরূপ, তথাপি, মানুষ স্বভাবত পাপী। এবং উভয় ক্ষেত্রেই ঈশ্বর মানুষে সর্বগত নন, স্বর্গত। এইক্ষেত্রে দার্শনিক হিসাবে তাঁর আধুনিকতাও লক্ষণীয়। কোন পূর্বাচার্যকে সর্বাংশে অনুসরণ করাই দার্শনিকতার একমাত্র পরিচয় নয়। সুরেশ্বর তাঁর আচার্য শংকরকেও সর্বাংশে স্বীকার করেন নি। যাই হোক, আমরা বলতে পারি যে, সত্তাই যাঁর দর্শনে সত্য ও শ্রেয়ের তাদাত্ম্য তাঁর আস্তিক্য অনস্বীকার্য।

এবারে আমরা রবীন্দ্রনাথের দর্শনে মুক্তির প্রশ্নটি আলোচনা করতে পারি। আমাদের

১৩৫। "Scriptures are either revealed teats or their interpretations. Notoriously, however, revealed texts, . . . lose their appeal in course of time. There come commentaries and sub commentaries. But they too differ notoriously. The very emergence of newer commentaries makes it necessary that people holding fast to one mode of life ought to take note of other modes and must have, therefore, the freedom to interpret their own traditions in the way they think best."
—ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য, Homage from Visva-Bharati, p. 44.

১৩৬। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে লিখিত পত্র, তারিখ ১৬ই কার্তিক, ১৩২৮ তুলনীয় ডঃ বিমান-বিহারী মজুমদার : রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান, পৃঃ ১০১

পূর্বের আলোচনা থেকে রবীন্দ্রনাথের দর্শনে মুক্তির স্বরূপ কি তার একটা ধারণা গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের মতে মুক্তি জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির সমুচ্চয়, যার দ্বারা ব্যক্তির জীবনে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতার বোধটি উপলভ্যমান হয়ে ওঠে। কিন্তু মুক্তি বিবিক্ত আত্মোপলব্ধি নয়। মুক্তি সকলের মধ্যে নিজেকে অনুভব করা। মুক্তির আদর্শ বিশ্বমানবে। ব্যক্তিচৈতন্যের পরম প্রসার বা বিশ্বমৈত্রী—"সর্বজনের মনের মাঝে।" মুক্তি বিশ্বমানবের সঙ্গে নিবিড় ঐক্যানুভূতি। জীবধর্ম সীমাকে উত্তীর্ণ হয়ে মানবসত্তায় সত্য ও শ্রেয়ের তাদাত্ম্য লাভ করাই মুক্তি। মুক্ত অবস্থা সৃজনশীল অস্তিত্ব। মুক্তপুরুষ স্রষ্টা। তিনি কর্ম সন্ন্যাসী নন। কারণ, রবীন্দ্রনাথের দর্শনে কর্মের মধ্যেই মানুষের প্রকাশ। আবার কর্মে তাঁর আসক্তি নেই, কারণ যথার্থ কর্ম শ্রেয় সাধনা এবং শ্রেয় সাধনার সাধ্য মানব সত্তার উদ্বৃত্তের উপলব্ধি। আবার যেহেতু মানবসত্তার উদ্বৃত্তে অসীমের সম্ভাবনা, সেই জন্য মুক্তি ক্রমশ 'হয়ে ওঠা'—রবীন্দ্রনাথের উপমায়, নদী যেমন করে সমুদ্র হয়ে থাকে। সীমার দিক থেকে, ব্যক্তিচৈতন্যের দিক থেকে সৃজনশীল কর্মের দ্বারা সত্তার অসীমতার উপলব্ধি বা আত্মোপলব্ধি। আবার অসীমের দিক থেকে সৃজনশীল কর্মে বিশ্বমানবের প্রকাশ। মুক্তি এক উদার জীবনানন্দ — সত্যে অধিষ্ঠিত হওয়া অর্থাৎ বিশ্বমানবের সঙ্গে সামঞ্জস্যযুক্ত হওয়া। সৌন্দর্যে অভিষিক্ত হওয়া, অর্থাৎ অস্মিতাসূচক আনন্দস্বাদ এবং মঙ্গল, অর্থাৎ শুভবুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হওয়া। কিন্তু এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, রবীন্দ্রনাথের ধারণার বৈশিষ্ট্যই এই যে, 'হয়ে ওঠার' কোন সীমা নেই—কোন বিশেষ সময়ে এই আত্মোপলব্ধি, এই বিশ্বমানবের সঙ্গে ঐক্যানুভূতি, শেষ হয়ে যায় না। এই মুক্তির আদর্শ দেশগত নয়। আবার কালগতও নয়। এই মুক্তির আদর্শের যাথার্থ্য মানুষের মুমুক্ষুত্বে। বলা যায় যে, এই আদর্শ জীবনমুক্তিরই আদর্শ যার সঙ্গে শ্রেয় সাধনার, অর্থাৎ, সৃজনশীল কর্মের অব্যভিচারী সম্বন্ধ। 'মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই কর্মের বৃদ্ধি বৈ হ্রাস নয়।'[১৩৭] রবীন্দ্রনাথের মুক্তি 'জগতে-মুক্তি'—'আলোয় আলোয় এই আকাশে, ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে।' মুক্তিতে অস্তিত্বের অধিকার ও অমৃতের অধিকার অদ্বৈত, কারণ মানবসত্তা সত্য ও শ্রেয়ের তাদাত্ম্য।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে মুক্তি বিশ্বমানবের সঙ্গে ঐক্যানুভূতি বলে, এবং মুক্তি মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতা বলে, এই মুক্তির দর্শন কোন পরামানবিক আদর্শের অনুকূল নয়। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দিব্যজীবনবাদে যে মুক্ত জ্ঞানসত্ত পুরুষের বা Gnostic Being এর কথা বলেছেন, তাঁরা পরামানবিক মানসের,—'Super mind' বা অধিমানসের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের দর্শন বা 'মানুষের ধর্মে' মানবিকতার অতিরিক্ত কোন সত্তা স্বীকৃত হয় নি, এবং রবীন্দ্রনাথ বলবেন যে, শ্রীঅরবিন্দের 'অধিমানস' মানবিক মানসেরই ধারণা, অর্থাৎ কোন মানুষ যদি দিব্য জীবনবাদ বোঝে, তাহলে মানবিক ভাবেই বুঝবে।[১৩৮]

১৩৭। শান্তিনিকেতন, / র. র. / শ. সং / ১২শ খণ্ড / পৃঃ ১৭৫

১৩৮। তেমনি শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দর্শন অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখেছিলেন "A glint of the greater era of man's living something that seems to be in

বিজ্ঞান যে বিরাট সৌরলোকের নৈর্ব্যক্তিক সত্যের গাণিতিক জ্ঞান লাভ করে, তাও যেমন রবীন্দ্রনাথের মতে বৈজ্ঞানিক মানুষেরই জ্ঞান, তেমনি, অধিমানসকেও মানুষ তার মানবিক চিন্তার ও অনুভূতির দ্বারাই উপলব্ধি করবে। অন্যভাবে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ অধি-মানবিক রূপান্তর স্বীকার করেন না। পূর্বপক্ষের বিস্মৃত হওয়া উচিত হবে না যে, দুটি পরাদার্শনিক যথাক্রমের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ও অপরটি যথার্থ—একথা বলা যায় না। কারণ তথ্য-সার্থক বাক্যের দ্বারা দুটির কোনটিই বিন্যস্ত হয় না। দুটি যথাক্রমে দুপ্রকারের সত্যের বিবৃতিবাক্য, যার একটির অন্তর্গত কোন বাক্য অপরটির কোন বাক্যকে সমর্থন বা খণ্ডন কিছুই করে না। আবার দুটি যথাক্রমের যাথার্থ্য আভ্যন্তরীণ যুক্তিবিন্যাসের সঙ্গতি এবং মৌল প্রত্যয়গুলির সংজ্ঞা থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত অনুসারেই নিরূপিত হবে। তাই উপরোক্ত মন্তব্য সমালোচনাত্মক নয়, তুলনাত্মক মাত্র। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে তাঁর দার্শনিক প্রত্যয়গুলির সংজ্ঞা দিয়েছেন, তার থেকে অন্যতর সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব নয়। এবং গ্রাহ্যতার প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, মানুষের পরি-প্রেক্ষিতে মানবিক শ্রেয়গুলির পরমতা স্বীকার করে নিলে, জগতে ও জীবনের বিবরণ রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে দিয়েছেন তা অনবদ্য বলেই আমাদের মনে হয়। আবার শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে মানুষ 'অধিমানসিক রূপান্তরে'র দ্বারাই সচ্চিদানন্দের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দর্শনে মানুষ মানবিক চৈতন্যেই বিশ্বমানবের সঙ্গে যুক্ত। আমরা পূর্বে দেখেছি যে, বিশ্বমানব মানবে সর্বগত, তিনি মানব অতিরিক্ত সত্তা নন। শ্রীঅরবিন্দের যোগদর্শনে শেষপর্যন্ত যাবতীয় মানবিক মূল্যবোধই হয় পরিত্যক্ত হবে, নতুবা তার অধিমানসিক রূপান্তর ঘটবে। তাঁর দর্শনের আদ্যন্ত অতিমর্ত্য এবং মানবচৈতন্যের অতিরিক্ত সচ্চিদানন্দের মৌল প্রত্যয় ও তার শ্রীঅরবিন্দ প্রদত্ত সংজ্ঞা ক্রিয়াশীল। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ সত্তা বলতে সর্বদাই মানবসত্তা বোঝেন। কখনই অতিমানবিক সত্তা বোঝেন না। সংক্ষেপে বলা যায় যে, শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে রূপান্তরই সাধ্য। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে মানবসত্তার রূপান্তর নয়, মানব অস্তিত্বের বিভিন্ন পর্যায়ের উত্তরণই অন্বিষ্ট। এমন কি, মানবসত্তার যে উদ্বৃত্ত তাও মানবিক ভূমা। শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে বিবর্তন মানবমানসের রূপান্তরের জন্য, পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে জগতে বিবর্তনের শ্রেষ্ঠ পরিণাম মানবচৈতন্যের পরম আবির্ভাব। মানুষই 'প্রথমজাত অমৃত'।[১৩৯]

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানব অতিমানব বা Superman নন। অতিমানবের যে দুটি ধারণা প্রচলিত তার একটির প্রবক্তা নীৎসে অপরটির শ্রীঅরবিন্দ। নীৎসের অতিমানব আসুরিক শক্তির বিশ্বরূপ এবং এই কল্পনার তাৎপর্য খৃস্টীয় নৈতিকতার প্রতিবাদে।

---

promise" ধর্ক্যমান meta-philosophical মন্তব্যগুলি বাদ দিয়েও শ্রীঅরবিন্দের একথা স্বীকার্য যে "Tagore has been a way farer towards the same goal as ours *in his own way*" ... দ্রষ্টব্য Sri Aurobindo and Rabindranath Tagore, Sri Auro-*binda Ashram, Pondicherry*. বক্রাক্ষর আমাদের।

১৩৯। শেষ সপ্তক, ৪০ নং

স্পষ্টই রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বমানব' কদাপি অনুরূপ তাৎপর্য এবং ব্যাখ্যার অনুগত প্রত্যয় নয়। আর শ্রীঅরবিন্দের অতিমানব দৈবীশক্তির অবতার। জগতের অধিমানবিক রূপান্তরের তিনি পুরোহিত। রবীন্দ্রনাথের যে বিবরণ আমরা পেয়েছি, তার ভিত্তিতে বলা যায়, উপরোক্ত কোনো অর্থেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবকে অতিমানব বলা যায় না।

উপসংহারে, আমরা রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মানসের বিষয়ে কয়েকটি মন্তব্য করব। তিনি তাঁর দর্শন চিন্তায় বচনীয় এবং অনির্বচনীয় সম্বন্ধে যে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন তার থেকে তাঁর দার্শনিকতার একটি দিক রহস্যবাদের[১৪০] সহধর্মী ছিল। রহস্যবাদ বলতে আমরা বুঝব যে বাচ্য এবং অনির্বাচ্য বিষয় ও তার সীমা সম্বন্ধে সচেতনতা ও স্বীকৃতি। কেউ কেউ, যেমন বুদ্ধিবাদীরা বলেন যে যাবতীয় জ্ঞানই বাচ্য, এবং জ্ঞান বলতে তাঁরা তথ্যগত ও অনুভূতিগত দুইই বোঝেন। আবার কেউ কেউ, যেমন সংশয়বাদীরা বলেন যে, বাচ্য কিছুই নেই এবং অনির্বাচ্য কোন সত্যের অস্তিত্বও অপ্রামাণ্য। এমন দার্শনিকও আছেন, যাঁদের মতে বাচ্য বিষয় আছে এবং অনির্বাচ্য কিছু আছে কিনা বলা সম্ভব নয়। অন্যদল বলেন যে সবই অনির্বাচ্য। রবীন্দ্রনাথ উপরোক্ত কোন সম্প্রদায় ভুক্তই নন। তিনি বাচ্য ও অনির্বাচ্য দুইই স্বীকার করেন এবং তাঁর মতে বাচ্যকে সর্বদাই অনির্বাচ্যের পরিমণ্ডল ঘিরে আছে। "অব্যক্তের বিরাট প্লাবন বেষ্টন করিয়া আছে দিবস রাত্রিরে।" রবীন্দ্রনাথের অনির্বাচ্য অপ্রকাশ্য নয়, বরং বোধে বা অনুভূতিতে উদ্ভাসিত। রবীন্দ্রনাথ অনির্বাচ্য মানেন, কিন্তু নৈঃশব্দ্যের সাধক তিনি নন। এবং তাঁর এই রহস্যবাদকে প্রচলিত soul mysticism বা Nature mysticism কোন পর্যায়ভুক্ত করা সম্ভব নয়। কারণ soul mysticism নিঃসঙ্গ চৈতন্যের সাধনা এবং মানব চৈতন্যকে অতিক্রম করেই সেই আত্মানুভূতি বিশ্বাত্মায় লীন হয়ে যায়। এই ধারণা রবীন্দ্রনাথের নয়। আবার Nature mysticism-এ প্রকৃতি অতিমর্ত্যদিব্যসত্যের ব্যঞ্জনাবাহী হয়ে ওঠে এবং তার স্বাশ্রয়ী সত্তা হারায়। মানবতাবাদে এই মতের স্বীকৃতি পাওয়া যাবে না। ফলে রবীন্দ্রনাথের দর্শনে আমরা দুই শ্রেণীর বাক্যের পার্থক্য পাই; তথ্য-বিবরণ মূলক ও সত্যের বিবরণ মূলক। প্রথমটি সার্থক বা অসার্থক হতে পারে, দ্বিতীয়টি পরাদার্শনিক।

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরধারণার শেষে আমরা তাঁর চেতনার সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য করব। যদি প্রশ্ন করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের দর্শনে প্রাথমিক সূত্রটি কি, তাহলে বলতে পারি যে তা হ'ল ধর্ম-জিজ্ঞাসা। ধর্ম-জিজ্ঞাসাই, কেবল ইংরাজী 'religion' অর্থেই নয়, রবীন্দ্রনাথের দর্শনের সবচেয়ে মৌল-জিজ্ঞাসা, যেমন মৌল তাঁর দর্শনে 'সত্তা'-র প্রত্যয়। এবং লক্ষণীয় যে, সত্তা আর সৃজ্যমানতার তাদাত্ম্য তাঁর কাছে স্বতঃসিদ্ধ ছিল। সেই জন্য সৃজনশীল মানবসত্তার অনিবার্য শ্রেয় সাধনা সুন্দর, মঙ্গল, ঈশ্বর ও অস্মিতা-সূচক নিবিড় অনুভূতিবাচক প্রেম—এই চতুরঙ্গের সামঞ্জস্যে বিকাশ লাভ করে। জগৎ

১৪০। রহস্যবাদ শব্দটি আমরা 'mysticism' অর্থে গ্রহণ করেছি। শব্দটির অন্যান্য অর্থ আমাদের অভিপ্রেত নয়।

ও জীবনের বৈচিত্র্যময় উপলব্ধিতে রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই তাঁর দার্শনিক প্রত্যয়গুলির ব্যবহার করেছেন। সেই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের দর্শন জীবনদর্শন।[১৪১] জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সুসংগত ব্যাখ্যাই রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক অন্বিষ্ট। তিনি তাঁর দর্শনের পারিভাষিক নাম দিয়েছেন 'মানুষের ধর্ম'। এই 'মানুষের ধর্ম' তাঁর দীর্ঘদিনের সচেতন অন্বেষণের বিষয় ছিল। তাঁর কয়েকটি নাট্যকাব্য বিশেষভাবে ধর্মজিজ্ঞাসারই উদাহরণ। দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্যেই ধর্মের বিশেষ ভূমিকা। 'সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়।'[১৪২] জগৎ ও জীবনের নানা নিকষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই ধর্মতত্ত্বের পরীক্ষা করেছেন। এ প্রসঙ্গে ন্যায় বিচারের সমস্যাটি উল্লেখযোগ্য। ন্যায় সামঞ্জস্যসাধক, আর ঈশ্বর সামঞ্জস্য-স্বরূপ বলেই তিনি ন্যায়মূর্তি। গান্ধীজী বলেছেন যে, বিধি ও বিধাতা এক। ন্যায় (Law) সুন্দর সামঞ্জস্য-মাহাত্ম্যে। ঋগবেদে যে জাগতিক নিয়ম বা ঋত-এর কথা আছে, সেখানেও নিয়মের সৌন্দর্যগত রূপটি উল্লেখ করা হয়েছে। ঋত-প্রতিভূ অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র, উষা প্রভৃতি দেব-দেবীগণের বিশেষণরূপে 'শ্রী', 'ভর্গস্', 'চারু', 'চিত্র' ইত্যাদি শব্দপ্রয়োগ লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সুন্দর ও মঙ্গল একার্থক। আমরা বলাকা-র ১১নং কবিতাটির বৈদিকতা স্মরণ করতে পারি। 'সুন্দর'-এর 'বিচারঘর'-এর যে চিত্র আমরা কবিতাটিতে পাই তাতে প্রকৃতির ভীষণ-মধুর রূপ ধরা পড়েছে। ঈশ্বরের ন্যায়মূর্তি রূপ রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় অপ্রাপ্য বলে যে মন্তব্য[১৪৩] করা হয়, তা অমূলক। 'সতী', 'গান্ধারীর আবেদন', 'বিদায়-অভিশাপ', 'নরকবাস', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'বিসর্জন', 'মালিনী' প্রভৃতিতে খণ্ড ধর্মাদর্শের দ্বন্দ্ব এবং নিত্যধর্মের সনাতন রূপটির সামঞ্জস্যধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। কচের কাছে কর্তব্যই ধর্ম; দুর্যোধন রাজ্যলিপ্সাকে রাজধর্মের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী, আবার গান্ধারী ধর্মের জন্যই পুত্রকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত। অমাবাই-এর জীবনে পতিধর্ম, সতীধর্ম ও সনাতন ধর্ম একীকৃত; সোমক ক্ষত্রিয়ধর্মকেই ধর্ম মনে করেছিল, পরে সে শাশ্বত ধর্মের সিংহদ্বারে উপনীত হ'ল। কর্ণের কাছে পৌরুষ ও অঙ্গীকারই ধর্ম; মালিনীতে দুই বিরুদ্ধ ধর্মমতের সংঘাত। সংক্ষেপে বলা যায়, খণ্ড ধর্মগুলি পরস্পরের বাধক, সনাতন ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যেই খণ্ডধর্মের তাৎপর্য ও যাথার্থ্য। নচেৎ সেই খণ্ড-ধর্মের অনুশাসন যতই কঠোর হক না কেন, তা ভ্রান্ত। যা মিলন আনয়নে অসমর্থ বা সংজ্ঞার্থেই মিলন-বিরোধী, তাই অধর্ম, তার নিত্যতার ছদ্মবেশ সত্ত্বেও। তা ত্যাজ্য। গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতির দ্বন্দ্ব এর উদাহরণ। আবার, ধর্ম শ্রেয়স্কর, অর্থাৎ, ধর্ম-সাধনা মানবসত্তার উদ্বৃত্তগত। ধর্ম উপায় নয়, উপেয়। ধর্মের পরীক্ষায় মানুষ মহান দুঃখভোগের দ্বারা অনাবিল সত্যকে প্রকাশ করে। ধর্ম 'ক্ষমা স্নিগ্ধতম্'।

১৪১। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁর ব্রহ্মসূত্র অনুবাদ ও টীকার নাম দিয়েছেন A Philosophy of Life.

১৪২। ধর্ম / র. র. / শ. সং / ১২শ খণ্ড / পৃঃ ৪১

১৪৩। দ্রষ্টব্য ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্যের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

"ধৃতরাষ্ট্র। কী দিবে তোমারে ধর্ম ?
গান্ধারী। দুঃখ নব নব।
... ...
ধর্ম নহে সম্পদের হেতু
... নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু ;
ধর্মেই ধর্মের শেষ।"

রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় মানব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধের একটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। সৌন্দর্য সাধনা ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায়রূপে রবীন্দ্রনাথের দর্শনে কীর্তিত হয়েছে।[১৪৪] রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মমতকে শিল্পীর ধর্ম (Religion of an Artist) বলেও অভিহিত করেছেন। মানুষ সৃজনশীল কর্মের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে। ঈশ্বর 'আবিঃ' অর্থাৎ প্রকাশ-স্বরূপ। তিনিও তাঁর সৃষ্টিতেই প্রকাশিত। স্রষ্টা হিসাবেই তাঁর ব্যক্তিত্ব—"God is personal where he creates"। মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে পারে এই স্বাজাত্য ও স্বাধর্ম্যের ফলে। ব্যক্তিমানব ও বিশ্বমানবের মিলনই সীমা ও অসীমের মিলন, এবং এই মিলন সম্বন্ধে উভয়ে উভয়কে সৃষ্টি করে তুলছে—যার অপর নাম লীলা। সৃষ্টিহীন মিলন নেই। জালালুদ্দিন রুমি যেমন বলেছিলেন যে, আমরা ঈশ্বরের আঁচলটুকু ধরতে পারি এবং সৌন্দর্যই সেই আঁচল। তেমনই রবীন্দ্রনাথের মতে গানগুলি তাঁর চরণ ছুঁয়ে আসে, যিনি গানের ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন। সৌন্দর্যসাধনাকে ঈশ্বরভাবনার সঙ্গে মেলান এবং ধর্মসাধনায় সৌন্দর্যসাধনাকে এই মহত্ত্বপূর্ণ পদবী দান করা রবীন্দ্রনাথের একটি কীর্তি। সৌন্দর্যের বিস্ময়কর রহস্যময়তার সাহায্যে আমরা সীমা থেকে অসীমে উপনীত হতে পারি। আমাদের মনে হয় যে, ধর্মসাধনার এই নূতন উপায় প্রস্তাব একাধারে ভারতীয় ও মৌলিক। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন যে, বৈদিক সাহিত্যে তো বটেই এমন কি, 'সৌন্দর্যলহরী'তেও কবিচিত্ত 'চন্দ্র সূর্য পৃথিবী সমস্তই স্ত্রী সৌন্দর্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে—অবশেষে সমস্ত বর্ণনা সমস্ত কবিতাকে একটা স্তরে একটা ধর্মোচ্ছ্বাসে পরিণত করে তুলেছে।'[১৪৫] সৌন্দর্য তাঁর কাছে 'প্রত্যক্ষ দেবতা'।[১৪৬] আবার, 'বৈষ্ণব কবিতার যথার্থ মর্মের ভিতরে যে প্রবেশ করেছে সে সমস্ত প্রকৃতির ভিতর সেই বৈষ্ণব কবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।'[১৪৭] ভারতবর্ষে পুরাণাশ্রিত লৌকিক ধর্মে সৌন্দর্য উপাসনার পরাকাষ্ঠা বৈষ্ণবধর্মে।[১৪৮] চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যদেবের কাব্য নাটকাদির আস্বাদনে উপরোক্ত

১৪৪। The aesthetic approach to reality illustrates the highest refinement of the mind and the finest culture. Dr. A. C. Bose, *The Call of the Vedas*, p. 46.

১৪৫। ছিন্নপত্রাবলী / ১৯৭ নং / র. র. / শ. সং / ১১শ খণ্ড / পৃঃ ২১৫

১৪৬। ঐ

১৪৭। ঐ / ১৪৭ নং / পৃঃ ১৬৪

১৪৮। আনন্দ চিন্ময় রসাত্মতয়া মনঃ সু
• যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলং স্মরতামুপেত্য।

মর্মে সাধনার সমর্থন আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় প্রথম সৌন্দর্যের উপাসনা ও সৌন্দর্যসৃষ্টিকে মিলিয়ে, সাধককে শিল্পীরূপে ও শিল্পীকে সাধকরূপে উপস্থাপন করে শ্রেয় ভাবনার এক নূতন দিক্-নির্দেশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার স্থায়ীসুর : 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই'।

সত্যের বিবরণমূলক যে বাক্যকূটের সমাহারে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেয়োদর্শন রচনা করেছেন, কোন অতি-মর্ত্যপ্রস্তাব স্বীকার না করে এবং মানুষের শ্রেয় ধারণার পরমতাকে গ্রহণ করে যে সৃজনশীল দার্শনিক যথাক্রমে গঠন করেছেন, সেই বাক্যকূটে আদ্যন্ত যে বোধ ক্রিয়াশীল, সেই বোধেই তাঁর দর্শনের অচল প্রতিষ্ঠা। সেই বোধের স্বীকৃতির উদ্ধারেই আমাদের তাঁর শ্রেয়োদর্শন আলোচনা সমাপ্ত হবে।

রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু ফেলে ছায়া,
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত
জড়ের কবলে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।
প্রেমের অসীম মূল্য
সম্পূর্ণ বঞ্চনা করি লবে
হেন দস্যু নাই গুপ্ত
নিখিলের গুহা গহ্বরেতে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।

* * *

সবকিছু চলিয়াছে পরিবর্ত বেগে
সেই তো কালের ধর্ম।
মৃত্যু দেখা দেয় এসে একান্তই অপরিবর্তনে,
এ বিশ্বে তাই সে সত্য নহে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।
সেই তার আমি
অস্তিত্বের সাক্ষী সেই,
পরম-আমির সত্যে সত্য তার
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।[১৪৯]

লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষ তমহং ভজামি॥
—ব্রহ্মপুরাণ, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক তাঁর 'কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ' গ্রন্থে উদ্ধৃত।
১৪৯। শেষলেখা ২ নং

গ্রন্থপঞ্জী

রবীন্দ্রনাথ রচিত

১। রবীন্দ্ররচনাবলী / জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ / পশ্চিমবঙ্গ সরকার / ১-১৪শ খণ্ড
২। চিঠিপত্র / ৯ম খণ্ড / বিশ্বভারতী
৩। Creative Unity, Macmillan, Calcutta
৪। Personality, Macmillan, Calcutta
৫। Sadhana, Macmillan, Calcutta
৬। Man, Kitabistan, Allahabad.
৭। Collected Poems and Plays, Macmillan, London
৮। The Religion of Man, George Allen and Unwin, London
৯। Religion of an Artist, Visva-Bharati,

অন্যান্য

১। উপনিষদ গ্রন্থাবলী / উদ্বোধন / ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড
২। বঙ্কিমরচনাবলী / সাহিত্যসংসদ / দ্বিতীয় খণ্ড
৩। Rabindranath Tagore : A Philosophical Study, Allahabad
৪। The Philosophy of Rabindranath Tagore, Benoygopal Ray, Bombay
৫। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন / প্রবাসজীবন চৌধুরী
৬। Metaaesthetics, Sisirkumar Ghose, Calcutta
৭। উপনিষদের আলোকে রবীন্দ্রনাথ : শশিভূষণ দাশগুপ্ত
৮। বাংলার বাউল : কাব্য ও দর্শন / সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৯। Selections from Vivekananda, Calcutta
১০। Selections from Gandhi, Ahmedabad.
১১। রবীন্দ্রদর্শন / হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
১২। কবিতার কথা / জীবনানন্দ দাশ
১৩। Homage from Visva-Bharati, Santiniketan
১৪। রবীন্দ্রনাথ / নলিনীকান্ত গুপ্ত
১৫। বেদান্ত সংজ্ঞাবলী
১৬। The Romantic Imagination, Sir Maurice Bowra, London
১৭। The Philosophy of Science, Stephen Toulmin, London
১৮। Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein, London
১৯। Philosophy of Science, Philipp Frank, Prentice Hall
২০। Beethovan, J. W. N. Sullivan, London
২১। Modes of Thought, A. N. Whitehead, London
২২। Adventures of Ideas, A. N. Whitehead, London
২৩। The Principles of Art, R. G. Collingwood, London
২৪। Studies in Philosophy, Vol II, Krishnachandra Bhattacharya, Calcutta
২৫। Mysticism and Logic, Russell, London
২৬। Individuals, Strawson, London
২৭। Aesthetics and Language, ed. Elton, London
২৮। Philosophy of Art, Virgil C. Aldrich

২৯। A Mannual of Ethics, Mackenzie, London
৩০। Principia Ethica, G. E. Moore, London
৩১। Critique of Judgment, Kant, অনুবাদ : Meredith
৩২। An Essay on Man, Ernst Cassirer
৩৩। Oxford Lectures on Poetry, A. C. Bradley, London
৩৪। The Ethics of the Hindus, S. K. Maitra, Calcutta
৩৫। সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা / রামকৃষ্ণ
৩৬। প্রবাসী / ভাদ্র / ১৩৩৯ / কলিকাতা
৩৭। The Perennial Philosophy, Aldous Huxley, London
৩৮। Introduction to Logic, Patrick Suppes, Van Nostrand, London
৩৯। রবীন্দ্র-সাহিত্যে পদাবলীর স্থান / ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার
৪০। Sri Aurobindo and Rabindranath Tagore, Sri Aurobindo Asram, Pondichery
৪১। The Call of the Vedas, A. C. Bose, Bombay
৪২। কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ / শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
৪৩। The Structure of Metaphysics, Lazerowitz, London
৪৪। Aesthetics, Croce
৪৫। Enquiries, David Hume
৪৬। রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা / নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী / বিশ্বভারতী
৪৭। সৌন্দর্যের প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ / সত্যেন্দ্রনাথ রায় / বেতারজগৎ ৯ম সংখ্যা / শকাব্দ ১৮৮৭

সংযোজন

সমাজদর্শন

নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমাজদর্শন

রবীন্দ্রনাথের সমাজদর্শন সংক্রান্ত আলোচনার প্রারম্ভে কয়েকটি বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত করে নেওয়া দরকার। সেগুলি হ'ল ঃ

(১) রবীন্দ্রদর্শনের স্বরূপ নিরূপণে কবির সমাজ সংক্রান্ত বক্তব্যের মূল্যায়ন কি আবশ্যিক ?

(২) সমাজ অন্তর্গত মানুষ হিসাবে বিভিন্ন সমস্যায় কবির কিছু উক্তিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক অর্থে সমাজদর্শন বলা চলে কি ?

(৩) রবীন্দ্রনাথের মত বিস্ময়করভাবে বহুমুখী এবং অনায়াস শিল্পপ্রতিভার সমাজ-দর্শন আলোচনার জন্য তাঁর বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমে সৃষ্টিগুলির মূল্য নিরূপণ অথবা মূলত জীবনের বিশিষ্ট অধ্যায়ে লিখিত সমাজ সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলির মূল্যায়ন —আলোচনায় কোন পথ গ্রহণীয়। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ে লিখিত সামাজিক প্রবন্ধগুলিকে কবির দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা হিসাবে গ্রহণ করা চলে কিনা।

(৪) মহৎ শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির মধ্যে বিশ্বসমাজ ও ব্যক্তির অবস্থান ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ামক দর্শনচিন্তা প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্নভাবে আবশ্যিক কিনা তর্কসাপেক্ষ হলেও অবস্থানগুলির বৈচিত্র্যের অনুভূতি ও প্রকাশক্ষমতা অনস্বীকার্য। শিল্পীমনের সংবেদন-শীলতা এবং বৃহৎ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সহানুভূতি প্রবণতা শিল্পীকে দর্শনের আবশ্যিক বিমূর্তিকরণের পক্ষে অনুপযুক্ত করে কিনা ? অর্থাৎ এই ধরনের শিল্পীকে যে কোন দর্শনের প্রয়োজনীয় সাধারণীকৃত সূত্রের পরিধিতে বিচারের প্রচেষ্টার মধ্যে আংশিকতা দোষ নিহিত থাকে কিনা ?

এই প্রবন্ধের সীমাবদ্ধ পরিধিতে উপরে নির্দেশিত সমস্যাগুলির পূর্ণ আলোচনা এবং সার্থক সমাধান হয়ত সম্ভব নয় ; তথাপি সুষ্ঠু আলোচনার স্বার্থে সমস্যাগুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি এবং কতকগুলি কার্যকরী প্রতিজ্ঞা গ্রহণ লেখকের বিবেচনায় অবশ্য প্রয়োজনীয়।

রবীন্দ্রনাথের দর্শনের কেন্দ্রে মানুষ উপস্থাপিত। এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী অংশগুলিতে বিস্তৃতভাবেই আলোচনা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের দর্শনে সামঞ্জস্য কেন্দ্রীয় সত্য। প্রেম বা ভালবাসার মাধ্যমে সামঞ্জস্যের উপলব্ধি এবং খণ্ডিত জীবনকে সমঞ্জস করাই মুক্তি ও আনন্দে পৌঁছিবার পথ। কবির মানুষের কাছে কেবল "জগৎ প্রকৃতি নয় সমাজ প্রকৃতি বলে আর একটি আশ্রয় আছে।"[১] শুধু সমাজ প্রকৃতির বাস্তবতাই নয় এর একটি কল্যাণরূপেও কবি আস্থাবান। প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্ট (necessary

evil) সামাজিক সম্পর্ককে স্বাধীন আত্মার মুক্তির পথে বন্ধন হিসাবে বিবেচনা করার তথাকথিত শিল্পীসুলভ আত্মকেন্দ্রিকতা রবীন্দ্রনাথের নয়। "আমরা অনেক সময় বলেছি ও মনে করেছি প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছে। ... এই প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে আবদ্ধ হয়েছে এই কথাকেই অন্তরের সঙ্গে যদি সত্য বলে জানি তাহলে সমাজকে মানবহৃদয়ের কারাগার বলতে হয়।... তবে সংসারের মধ্যে আমাদের মুক্তি কোনখানে? প্রেমে। প্রেমই যদি মানবসমাজের তত্ত্ব হয় তবে সেতো আমারই তত্ত্ব।"[২]

উপরের উদ্ধৃতি থেকেই পরিষ্কার যে বিশ্বপ্রকৃতি শুধু নয় ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি বিশিষ্ট তত্ত্ব ও দর্শন রবীন্দ্রদর্শনের বিশিষ্ট অঙ্গ। অতএব কবির সামগ্রিক দর্শন আলোচনায় সমাজদর্শনের মূল্যায়ন শুধু প্রাসঙ্গিক নয় আবশ্যিক। সাধারণভাবে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনাকেই সমাজদর্শন বলা হয়। দার্শনিক বিশ্ব সম্বন্ধে যে চরম ব্যাখ্যা দান করেন তারই আলোকে ব্যক্তি ও সমাজের বিভিন্ন আদর্শের মূল্য কি এবং সেগুলি কিরূপ হওয়া উচিত, তার স্থিরীকরণের প্রচেষ্টাই আধুনিক সংজ্ঞানুযায়ী সমাজদর্শন।

উপরের উদ্ধৃতি গ্রহণ করেই বোধ হয় একথা বলা চলে যে ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বা ডঃ কোশাম্বীর মত দু' একজনের আংশিক প্রচেষ্টা এবং জাতীয় নেতাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর ও আধুনিক কালে বিনোবা ভাবে ছাড়া প্রায় আর কেউই ভারতবর্ষের সমাজ-ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি, কাম্য সমাজব্যবস্থার রূপরেখা এবং সেইরূপ সমাজব্যবস্থা অর্জনের পথ নির্দেশ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের সমাজ সংক্রান্ত রচনায় এইরূপ সামগ্রিক প্রচেষ্টা পরিদৃশ্যমান। আলোচ্য লেখাগুলির স্থান কাল এবং বিষয় বিভিন্ন হলেও যে তারা মূল ঐক্যবিরহিত নয় সে বিষয়ে কবির নিজস্ব উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

একটি নিজস্ব অখণ্ড দার্শনিক দৃষ্টির আলোয় ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও সমাজ থেকে সুরু করে সমসাময়িক কালের সমস্যা পর্যন্ত বিচারের প্রচেষ্টা সম্ভবত একমাত্র রবীন্দ্ররচনাতেই উপস্থিত। সমকালীন ইউরোপীয় সমাজচিন্তা এবং ইউরোপীয় প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে ভারতীয় মানের যথেষ্ট পরিচয় সত্ত্বেও সম্পূর্ণ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারত-সমস্যার উত্থাপন ও সমাধানের ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য। আলোচনার পদ্ধতিতে বিচারমূলক ও গঠনমূলক দুটি প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক পন্থাকে তিনি সম্পূরকভাবে ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সমাজসমস্যার আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টিশীল। সেই কারণেই তিনি তথ্যের ব্যবহারে গঠনমূলক প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্বাচন-মূলক (selection) পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। অতি আধুনিক কালের অদার্শনিক সমাজতাত্ত্বিকদের মূলত বিবরণ-ধর্মী সমাজতত্ত্বের কোঠায় রবীন্দ্ররচনাকে ফেলা যায় না এবং ফেলা উচিত নয় বলাই বাহুল্য। অবশ্য এই কারণে, রবীন্দ্ররচনার মূল্য বাড়ে বই কমে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে প্লেটো, আরিস্টটল থেকে রুশো, ভলটেয়ার,

মার্ক্স পর্যন্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম এবং পরবর্তী কালের উপর প্রভাব বিস্তারক্ষম কোনও সমাজদার্শনিকই তাঁদের সৃষ্টিশীল লক্ষ্যের তাগিদে শ্রেয় বিচার এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যমূলক তথ্য নির্বাচন (purposive selection) পরিহার করতে পারেন নি বা করার প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু সেই কারণে যেমন এইসব মনীষীদের লেখাকে সমাজ-দর্শনের আওতা থেকে বাদ দেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে না তেমনই রবীন্দ্রনাথের সমাজবিষয়ক রচনাগুলিও অত্যন্ত সার্থকভাবেই সমাজদর্শনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি রাখে। রবীন্দ্রনাথের এবম্বিধ রচনাগুলির মূল্যবিচারও উপরিউক্ত কারণেই সমাজদর্শনের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে সম্ভব ও উচিত।

পূর্বে উত্থাপিত তৃতীয় এবং চতুর্থ সমস্যা দুটি অবিচ্ছেদ্য; অতএব এ বিষয়ে আলোচনাও একসঙ্গে করা হল। রবীন্দ্রনাথের সমাজদর্শনের আলোচনা শুধুমাত্র তাঁর সুস্পষ্ট-ভাবে ঐ বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধাবলীর উপরই নির্ভরশীল হল সেই আলোচনাকে সর্বাঙ্গীণ বলা সমীচীন কিনা এবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে এ বিষয়ে কবির নিজের সাবধান-বাণী স্মরণীয়—"যখন খবর পাই, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি সম্বন্ধে আমার বিশেষ মত কি তা আমার রচনা থেকে কেউ উদ্ধার করবার চেষ্টা করছেন, তখন নিশ্চিত জানি, আমার মতের সঙ্গে তাঁর নিজের মত মিশ্রিত হবে।"[৩] একথা থেকে মনে হতে পারে যে কবি তাঁর মত সম্পর্কে আলোচনা অন্যের পক্ষে করার অসম্ভাব্যতার কথাই বলেছেন। কিন্তু তা যে নয় এবং এইরূপ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বোধ যে তাঁর ছিল তার প্রমাণ নিচের উদ্ধৃতিতেই পাওয়া যাবে।

"আমি জানি, আমার মত ঠিক যে কি তা সংগ্রহ করা সহজ নয়। বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজও করেছি। যেহেতু বাক্য রচনা করা আমার স্বভাব সেই জন্য যখন যা মনে এসেছে তা প্রকাশ করেছি। রচনাকালীন সময়ের সঙ্গে সেই সব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিক ভাবে দেখাই সঙ্গত। . . . রাষ্ট্রনীতির মত বিষয়ে কোন বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোন এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়নি—জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে নিঃসন্দেহ একটি ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার করতে হ'লে রচনার কোন অংশ মুখ্য, কোন অংশ গৌণ, কোনটা তৎসাময়িক, কোনটা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটা বিচার করে দেখা চাই। বস্তুত সেটাকে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।"[৪]

উপরের উদ্ধৃতিটি থেকে বিচারপদ্ধতির সম্পর্কে দুটি নির্দেশ আমরা পাই। প্রথমটি হল, লেখাগুলিকে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা এবং দ্বিতীয়টি হল অংশকে সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন না করে পরিপূরকভাবে দেখা। দেশ ও সমাজ সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলিকে

তাঁর কাব্য, উপন্যাস, নাটক ও গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে আলোচনা না করলে ভুল হবে এমন ধারণা রবীন্দ্রনাথ পোষণ করতেন না। এতৎসত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথের সমাজসংক্রান্ত প্রবন্ধাবলীতে নিবদ্ধ মতামতগুলিকে সমগ্র শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে বিচার করতে পারলে আলোচনা সমৃদ্ধতর হয়। কিন্তু সে কাজটির বিশালতা এবং দুরূহতা বিবেচনায় প্রবন্ধকার সে প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকছেন বলাই বাহুল্য।

বিশ্ব, ব্যক্তি ও সমাজ

বিশ্বরূপ ঃ

"এই বিশ্বচরাচরে আমরা বিশ্বকবির যে লীলা চারিদিকেই দেখতে পাচ্ছি সে হচ্ছে সামঞ্জস্যের লীলা। সুর, সে যত কঠিন সুরই হোক, কোথাও ভ্রষ্ট হচ্ছে না; তাল, সে যত দুরূহ তালই হোক, কোনও জায়গায় তার স্খলন মাত্র নেই। চারিদিকেই গতি ও স্ফূর্তি, স্পন্দন এবং নর্তন, অথচ, সর্বত্রই সপ্রমত্ততা। ...অথচ এই সামঞ্জস্য তো সহজ সামঞ্জস্য নয়—এতো মেষে ছাগে সামঞ্জস্য নয়, এ যেন বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ানো। এই জগৎক্ষেত্রে যে সব শক্তির লীলা তাদের যেমন প্রচণ্ডতা, তেমনি তাদের বিরুদ্ধতা—কেউবা পিছনের দিকে টানে, কেউবা সামনের দিকে ঠেলে; কেউবা গুটিয়ে আনে, কেউ বা ছড়িয়ে ফেলে; কেউবা বজ্রমুষ্টিতে সমস্তকে তাল পাকিয়ে নিরেট করে ফেলবার জন্যে চাপ দিচ্ছে, তার চক্র যন্ত্রের প্রবল আবর্তে সমস্তকে গুড়িয়ে দিয়ে দিগ্‌বিদিকে উড়িয়ে ফেলবার জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সমস্ত শক্তি অসংখ্য বেগে এবং অসংখ্য তালে ক্রমাগতই আকাশময় ছুটে চলেছে—তার বেগ, তার বল, তার লক্ষ্য, তার বিচিত্রতা আমাদের ধারণাশক্তির অতীত, কিন্তু এই সমস্ত প্রবণতা বিরুদ্ধতা বিচিত্রতার উপরে অধিষ্ঠিত অবিচলিত অখণ্ড সামঞ্জস্য। আমরা যখন জগৎকে কেবল তার কোন একটি মাত্র দিক্ থেকে দেখি তখন গতি এবং আঘাত এবং বিনাশ দেখি, কিন্তু সমগ্রকে যখন দেখি তখন দেখতে পাই নিস্তব্ধ সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যই হচ্ছে তাঁর স্বরূপ যিনি শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্। জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শান্তম্, সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শিবম্, আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি অদ্বৈতম্।"[৫]

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) বিশ্বরূপের এই সামঞ্জস্যদর্শন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বচেতনার ভিত্তিভূমি। স্থান কাল ভেদে এর প্রকাশবৈচিত্র্য প্রদর্শন সম্ভব হলেও মূলত বিরোধী কোনও চেতনার অস্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের বিশাল সৃষ্টিতেও পাওয়া কঠিন।

(খ) বিশ্বভাবনার এই বিশেষ ধারাটি উপনিষদ, গীতা বাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথে উপস্থিত, ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যের এই বিশেষ ভিত্তিভূমিতে রবীন্দ্রনাথকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করার কাজে রামমোহন এবং দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব অনস্বীকার্য।

(গ) রবীন্দ্রনাথের মৌল দর্শনচিন্তায় জগৎ, সমাজ এবং আত্মা পূর্ণ পটভূমিতে পরস্পর বিরোধী নয়, পরিপূরক সম্পর্কেই কল্পিত। এই পরিপূরক সম্পর্কই তাঁর সমাজদর্শনেরও মূল সূত্র।

জগৎ ও মানুষ ঃ

"বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পূর্ণ ঐক্য নেই। বিশ্ব প্রভাবের সঙ্গে মানুষ এক তানে, এক তালে চলে না। এই জন্যেই যেখানেই মানুষ থাকে সেইখানেই চারিদিকে সে নিজের একটা তরঙ্গ তোলে; সে একটি মাত্র কথা না বললেও তারার মত নিঃশব্দ ও একটুমাত্র নড়াচড়া না করলেও বনস্পতির মত নিস্তব্ধ থাকে না। তার অস্তিত্বই অগ্রসর হয়ে আঘাত করে। . . . কেন না, ভগবান ওই যে অহঙ্কারটি জুড়ে দিয়ে আমাদের জগতের সঙ্গে ভেদ জন্মিয়ে দিয়েছেন তাতে আমাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্রই করে দিয়েছেন। . . .আমাদের স্বাতন্ত্র্যগত অসামঞ্জস্য কেবলই সামঞ্জস্যকে প্রার্থনা করছে; সেই জন্যেই আমরা কেবল মাত্র খেয়ে পরে জীবন ধারণ করে বাঁচিনে। আমরা একটি সুরকে, একটি মিলকে চাচ্ছি। সে চাওয়াটা আমাদের খাওয়া পরার চেয়ে বেশী বৈ কম নয়—সামঞ্জস্য আমাদের নিতান্তই চাই। সেই জন্যেই কথা নেই বার্তা নেই আমরা কাব্য রচনা করতে বসে গেছি—কত লিখছি, কত আঁকছি, কত গড়ছি। কত গৃহ, কত সমাজ বাঁধছি, কত ধর্মমত ফাঁদছি। এই সামঞ্জস্যের আকাঙ্ক্ষার তাগিদে নানা দেশের মানুষ কত আকৃতির রাজ্যতন্ত্র গড়ে তুলছে। কত আইন, কত শাসন, কত রকম বেরকমের শিক্ষা দীক্ষা। কি করলে নানা মানুষের নানা অহঙ্কারকে সাজিয়ে একটি বিচিত্র সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হতে পারে এই তপস্যায় পৃথিবী জুড়ে সমস্ত মানুষ ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।

এই চেষ্টার তাড়নাতে মানুষ আপনার একটা সৃষ্টি তৈরী করে তুলেছে। নিখিল সৃষ্টি থেকে এই অহঙ্কারের মধ্যে নির্বাসিত হওয়াতেই তার এই নিজের সৃষ্টির এত অধিক প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। মানুষের ইতিহাস কেবলই এই সৃষ্টির ইতিহাস, এই সমন্বয়ের ইতিহাস, তার সমস্ত ধর্ম ও কর্ম, সমস্ত ভাব ও কল্পনায় কেবলই এই অমিলে মেলবার ইতিহাস রচিত হচ্ছে।

মিলটি হচ্ছে অমৃত তাকে পেতে গেলেই বিচ্ছেদের ভিতর দিয়েই পেতে হয়। মিলে থাকলে তো মিলকে পাওয়া হয় না।. . .

অহঙ্কার নাহলে বিচ্ছেদ হয় না, বিচ্ছেদ নাহলে মিলন হয় না, মিলন না হলে প্রেম হয় না।

কিন্তু, তাই যদি হয় তবে পার হয়ে যাব কোথায়? তবে কি অহঙ্কারকে একেবারে লুপ্ত করে দিয়ে সম্পূর্ণ অবিচ্ছেদের দেশে যাওয়াই অমৃতলোক প্রাপ্তি? সেই দেশেই তো ধূলা মাটি পাথর রয়েছে। তারা সমষ্টির সঙ্গে একতালে মিলে চলেছে, কোন বিচ্ছেদ জানে না। এই রকম আত্মবিলয়ের জন্যই কি মানুষ কাঁদছে?"

"মানুষ সর্বান্তঃকরণে যদি কিছুকে না চায় তো সে বিলয়কে।"

"আমরা কিন্তু দুঃখকেও চাইনে ফাঁকিকেও চাইনে। তবে আমরা কী চাই, আর সেটা পাবই বা কি করে?"

"আমরা প্রেমকেই চাই। কখন প্রেমকে পাই? যখন বিচ্ছেদ-মিলনের সামঞ্জস্য ঘটে; যখন বিচ্ছেদ মিলনকে নাশ করে না এবং মিলনও বিচ্ছেদকে গ্রাস করে না; দুই যখন এক সঙ্গে থাকে অথচ তাদের মধ্যে আর বিরোধ থাকে না, তারা পরস্পরের সহায় হয়।"[৬]

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) মানুষ জড়ভাবে বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গ নয়। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তার বিচ্ছেদ আছে, অসামঞ্জস্য আছে। তারও উপরে বিচ্ছেদচেতনা আছে।

(খ) বিচ্ছেদচেতনাই একদিকে সমস্ত দুঃখ অন্যদিকে প্রেমের বহিঃপ্রকাশ যে কল্যাণ-কর সৃষ্টিচেতনা, এই উভয়েরই মূলে। গৃহনির্মাণ থেকে রাজ্যতন্ত্রগঠন পর্যন্ত সর্বত্র এই সৃষ্টিচেতনারই প্রকাশ।

(গ) শুধু সৃষ্টিচেতনাই নয়, সামঞ্জস্য থেকে সুরু হয়ে অসামঞ্জস্যের মধ্যে দিয়ে সচেতন সামঞ্জস্যে উত্তরণই জীবনের পরমার্থ। এই সূত্রে তিনি মানুষের মধ্যে জড়োত্তীর্ণ আত্মচেতনা, মানুষের সমস্ত সৃষ্টিশীল কাজের উৎস হিসাবে এই চেতনাকে স্বীকৃতি এবং বৃহতের সঙ্গে মিলনে এই চেতনার একান্ত সার্থকতা নির্দেশ করে ব্যক্তি ও সমাজ-কর্মে চেতনার নির্দিষ্ট গতি নির্দেশ করে দিয়েছেন। একই সূত্রে তিনি ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আত্মচেতনার প্রতিযোগী বিভেদ সৃষ্টিকারী সমস্ত রূপকে অমানবিক ঘোষণা করে এই প্রসঙ্গে শ্রেয়-অশ্রেয় বিচারের কষ্টিপাথরটিও সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

(ঘ) সভ্যতার জটিল গতিপথে মানুষের অস্তিত্ব সহজাত একাকিত্ব, অনন্বয় ইত্যাদি সমস্যাগুলি আধুনিক সমাজ ও মনোবিজ্ঞানীদের বিশেষ দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যাগুলিকে স্বীকৃতি দিয়ে সপ্রেম ব্যক্তি ও সমাজকর্মে তার উত্তরণের পথনির্দেশ করে গেছেন। বিচ্ছেদ থেকে অসহায়তাজনিত জিঘাংসার (যা আজ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে প্রায় অবশ্যম্ভাবীভাবে জড়িত সমস্যা হিসাবে সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত।) সম্ভাবনা পরিহারের পথনির্দেশ করেছেন।

ব্যক্তি ও সমাজ ঃ

"মানুষের ধর্মই এই যে সে অনেকে মিলে একত্র বাস করতে চায়। একলা মানুষ কখনই পূর্ণ মানুষ হতে পারে না; অনেকের যোগে তবেই সে নিজেকে ষোল আনা পেয়ে থাকে।

দল বেঁধে থাকা, দল বেঁধে কাজ করা মানুষের ধর্ম বলেই, সেই ধর্ম সম্পূর্ণভাবে পালন করাতেই মানুষের কল্যাণ, তার উন্নতি। লোভ, মোহ প্রভৃতিকে মানুষ রিপু বা

শত্রু বলে কেন? কেননা, এই সমস্ত প্রবৃত্তি ব্যক্তিবিশেষ সম্প্রদায়বিশেষের মনকে দখল করে নিয়ে মানুষের জোট বাঁধার সত্যকে আঘাত করে। . . . তারা আমাদের নিজেরই রিপু। কেননা, সকলের যোগে মানুষ নিজের যে পূর্ণতা পায়, এই প্রবৃত্তি তারই বিঘ্ন করে।"

"স্বধর্মের আকর্ষণে মানুষ এই যে অনেকে এক হয়ে বাস করে, তারই গুণে প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের শক্তির ফললাভ করে।"[৭]

"আমরা যখন বলি স্বাধীনতা চাই, তখন কী চাই সেটা ভেবে দেখা চাই। মানুষ যেখানে সম্পূর্ণ একলা সেইখানে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। . . . কিন্তু মানুষ এ স্বাধীনতা বোধ কেবল যে চায় না তা নয়, পেলে বিষম দুঃখ বোধ করে। . . . রবিন্‌সন্ ক্রুসো তার জনহীন দ্বীপে যতক্ষণ একেবারে একলা ছিল ততক্ষণ সে একেবারে স্বাধীন ছিল। যখনই ফ্রাইডে এলো তখনই তার সেই একান্ত স্বাধীনতা চলে গেল। তখন ফ্রাইডের সঙ্গে তার একটা পরস্পর সম্বন্ধ বেধে গেল। সম্বন্ধ মাত্রেই অধীনতা। . . . কিন্তু রবিন্‌সন্ ক্রুসো ফ্রাইডের সঙ্গে পরস্পর দায়িত্বে জড়িত হয়েও নিজের স্বাধীনতার ক্ষতিজনিত দুঃখ কেন বোধ করেনি? কেননা, তাদের সম্বন্ধের মধ্যে ভেদের বাধা ছিল না। . . . যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পূর্ণতা, সে আমার পরম বন্ধু, সুতরাং যে আমাকে বাঁধে, আমার চিত্ত তারই সম্বন্ধের মধ্যে স্বাধীনতা পায়, কোন বাধা পায় না। যে স্বাধীনতা সম্বন্ধহীনতায় সেটা নেতিসূচক, সেই শূন্যতামূলক স্বাধীনতায় মানুষকে পীড়া দেয়।"[৮]

". . . মানুষকে ঈশ্বর সেই বহুধা শক্তি দিয়েছেন, তাই মানবসভ্যতার এত ঐশ্বর্য। বিধাতা চান মানবসমাজে সেই বহুকে গেঁথে সৃষ্টি হবে ঐক্যের; বিশেষ ফললুব্ধ শাসনকর্তারা চান সেই বহুকে দলে ফেলে পিণ্ড পাকানো হবে সাম্যের। তাই সংসারে এত অসংখ্য এক কলের মজুর, এক-উর্দি-পরা সেপাই, এক দলের দড়িতে বাঁধা কল্কের পতুল। যেখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব জুড়িয়ে হিম হয়ে যায়নি সেখানেই এই হামানদিস্তায়-কোটা সমীকরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছেই। কোথাও যদি সেই বিদ্রোহের লক্ষণ না থাকে, যদি দেখি সেখানে হয় প্রভুর চাবুকে নয় গুরুর অনুশাসনে মানুষকে অনায়াসেই একই ধূলিশয়নে অতি ভালমানুষের মতো নিশ্চল শায়িত রাখতে পারে, তাহলে সেই 'দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিমকলেবর' দেশের জন্যে শোকের দিন এসেছে বলেই জানব।"[৯]

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) সমাজবদ্ধতা মানুষের স্বভাবধর্ম। স্বভাবধর্ম পালনেই কল্যাণ।

(খ) সমাজের মধ্যে দিয়েই মানুষ বৃহতের সঙ্গে সামঞ্জস্যের বোধ পায়, স্বাদ লাভ করে।

(গ) সামগ্রিক সহযোগিতাকে সাহায্য করে এমন সমস্ত মনোবৃত্তি মঙ্গলকর। যা কিছু সমাজের মধ্যে ভেদকে শক্তিশালী করে তাই অসামাজিক, অকল্যাণকর অতএব মানবরিপ।

(ঘ) যে স্বাধীনতাবোধ মানুষকে সম্পূর্ণ একলা করে তাই মানুষকে পীড়িত করে। অসম্বদ্ধ স্বাধীনতা নিরর্থক। অসম্বদ্ধ মানুষ অসার্থক। প্রেম ও বন্ধুতাই সম্বন্ধের পূর্ণতা দেয়। সম্বন্ধের মধ্যে স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা।

(ঘ) সামাজিক ঐক্য বৈচিত্র্য-ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। শাসনের সুবিধার্থে সামাজিক বৈচিত্র্যের বিনাশ অকল্যাণকর। আর যা কিছু অকল্যাণকর তার বিরোধিতা করাই মানবিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সমাজনীতির একটি ধ্রুব অর্থাৎ দেশ কাল নিরপেক্ষ দিক আছে। উপরের সিদ্ধান্তগুলি সেই ধ্রুব নীতিরই পরিচায়ক। সমাজনীতির বিবর্তনমূলক দিকটি সম্পর্কেও তিনি বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। নিচের অংশে বিবর্তনশীল সামাজিক সমস্যা এবং দেশ কালের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলি বিচারের রাবীন্দ্রিক পদ্ধতির কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় উদাহরণ উপস্থিত করা হল।

ভারত ইতিহাসের বিচার

প্রাচীন ইতিহাস ঃ

"(কিন্তু) বিধাতার পরীক্ষার নিয়ম এত সহজ নয়। এক এক জাতির কাছে তিনি এক একটি স্বতন্ত্র সমস্যা পাঠিয়েছেন। সেই সমস্যার সত্য মীমাংসা করলে তবেই তারা তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাবে ও মান পাবে। ভারতকেও তিনি একটি বিশেষ সমস্যা দিয়েছেন, যতদিন না তার সত্য মীমাংসা হবে ততদিন ভারতের দুঃখ কিছুতেই শান্ত হবে না। আমরা চাতুরী খাটিয়ে য়ুরোপের পরীক্ষাপত্র থেকে উত্তর চুরি করছি। এক দিন বোকার মতো করছিলুম মাছি-মারা নকল, আজকে বুদ্ধিমানের মতো করছি ভাষার কিছু বদল ঘটিয়ে। পরীক্ষক বারে বারে তার পাশে নীল পেন্সিল দিয়ে যে গোল গোল চিহ্ন কাটছেন তার সবকটাকেও একত্র যোগ করতে গেলে বিয়োগান্ত হয়ে ওঠে।"[১০]

"ভারতবর্ষের ইতিহাস ঠিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে। কেন নহে তাহার কারণ আছে। প্রত্যেক জাতির একটি একটি সাধনার বিষয় আছে। সেই মূলগত সাধনাটি লইয়াই সেই জাতির সকল আঁট বাঁধে।...

প্রত্যেক জাতির সমস্যা সেখানেই, যেখানে তাহার অসামঞ্জস্য।... সভ্যতাই এই মিলন। আমাদের প্রাচীন ভারতে অসামঞ্জস্য রাজায় প্রজায় ছিল না, সে ছিল এক জাতি-সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য জাতি-সম্প্রদায়ের। এই সকল নানা উপজাতির বর্ণ ভাষা আচার ধর্ম চরিত্রের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। অথচ ইহারা সকলেই প্রতিবেশী। ইহাতে একদিকে যেমন পরস্পরের লড়াই চলিতেছিল তেমনি আর এক দিকে পরস্পরের সমাজ ও ধর্মের সামঞ্জস্য-সাধন চেষ্টারও বিশ্রাম ছিল না। কী করিলে পরস্পরে মিলিয়া এক বৃহৎ সমাজ গড়িয়া উঠে, অথচ পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য একেবারে বিলুপ্ত না হয়, এই দুঃসাধ্যসাধনের প্রয়াস বহু কাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে, আজও তাহার সমাধান হয় নাই।"[১১]

"য়ুনাইটেড্ স্টেট্‌সের ইতিহাসে যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া চলিতেছে তাহার সঙ্গে ভারত-ইতিহাসের মিল আছে, কিন্তু অমিলও যথেষ্ট। সেখানে য়ুরোপের নানা স্থান হইতে নানা জাতি মিলিতেছে। কিন্তু তাহারা একই বর্ণের, সুতরাং তাহাদের মিলনের বাধা সুগভীর নহে। . . . (কিন্তু) নিগ্রোদের সমস্যার কোন ভাল মীমাংসা আজ পর্যন্ত সেখানে হয় নাই . . . আমেরিকার ইতিহাসে আর একটা ব্যাপার দেখতে পাই, তাহাকে ঐক্যসাধন না বলিয়া একাকারীকরণ বলা যায়। . . . ইহাতে রাষ্ট্রীয় দিক হইতে সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু বৈচিত্র্যমূলক মানব সভ্যতার দিক হইতে ইহাতে ক্ষতিই ঘটে।"[১২]

"ভারতবর্ষের নানা জাতির এই সংঘাত ও সামঞ্জস্যের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় বৈদিকযুগ বৌদ্ধযুগে, বৌদ্ধযুগ পৌরাণিক যুগে পরিণত হইয়াছে। এই সৃষ্টির উদ্যমে রাজা ও রাষ্ট্র-নীতি প্রধান শক্তি নহে। অবশ্য বিদেশী রাজা যখন হইতে ভারতে আসিয়াছে তখন হইতে এই স্বাভাবিক সৃষ্টিকার্য বাধা পাওয়ার আর একটি অসামঞ্জস্য দেখা দিয়াছে। এইজন্যই ইংরেজ যাহাকে ইতিহাস বলিয়া গণ্য করে ভারতে সেই ইতিহাস মুসলমান-অধিকারের পরে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার অর্থ এমন নহে যে বিদেশী রাজত্বের পর ভারত ইতিহাসের প্রকৃতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই পর্যন্ত বলা যায় যে পূর্বের চেয়ে আমাদের ইতিহাস জটিল হইয়াছে, আমাদের দুরূহ সমস্যায় আরও একটি নূতন গ্রন্থি পড়িয়াছে। এখনো আমাদের মধ্যে ভেদের সমস্যা। এই ভেদ সমাজের ভিতরে থাকাতেই অন্যদেশীয় রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের অভিজ্ঞতা আমাদের দেশে কিছুতেই ঠিকমত খাটিতেছে না। আমরা অন্য দেশের নকলে যে-সব পন্থা অবলম্বন করিতেছি, বারম্বার তাহা ব্যর্থ হইতেছে।"[১৩]

"একটি কথা মনে রাখা দরকার যে হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা স্থায়ী যুদ্ধের অবস্থা রয়ে গেল। কারণ এই সমাজ ভারতবর্ষের একমাত্র সমাজ নয়—নানা প্রকারের ভিন্ন আচার ব্যবহারের দ্বারা এই সমাজ চারিদিকে বেষ্টিত। তাদের আক্রমণ থেকে নিজের সত্তাকে রক্ষা করবার জন্যে একে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়েছে। এইজন্য এই সমাজ সর্বদা গড়ের মধ্যে বাস করেছে। অন্য কোন সভ্য দেশে হিন্দুসমাজের মত অবস্থা কোন সমাজের নেই। এই জন্যে সে সকল সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এতদূর খর্বতা ঘটেনি।"[১৪]

"যে দেশের সমাজ বহু ব্যাপক জালে জটিল, সে দেশে ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে নানাদিক থেকে দাবিয়ে রাখতে হয়। জীবন ধারণের জন্য যেখানে মানুষকে সর্বদা দূরে দূরান্তরে যেতে বাধ্য করে সেখানে সমাজবন্ধন বহু বিস্তীর্ণ হয়ে উঠ্‌তে পারে না, সেখানে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দাবী স্বীকার সমাজবিধির অন্তর্গত হয় না, তা স্বেচ্ছাধীন হয়ে থাকে।"

"পর্দা উঠিবামাত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথমাঙ্কে আমরা আর্য অনার্যের প্রচণ্ড জাতি সংঘাত দেখিতে পাই। এই সংঘাতের প্রথম প্রবল বেগে অনার্যের প্রতি আর্যের যে বিদ্বেষ জাগিয়াছিল তাহারই ধাককায় আর্যেরা নিজের মধ্যে নিজে সংহত হইতে পারিল।"[১৫]

"বিশ্বের সকল পদার্থের মত সংঘাত পদার্থেরও দুই প্রান্ত আছে—তাহার এক প্রান্তে বিচ্ছেদ, আর এক প্রান্তে মিলন। তাই এই সংঘাতের প্রথম অবস্থায় স্ববর্ণের ভেদ রক্ষার দিকে আর্যদের যে আত্মসংকোচন জন্মিয়াছিল সেইখানেই ইতিহাস চিরকাল থামিয়া থাকিতে পারে না। বিশ্ব ছন্দ-তত্ত্বের নিয়মে ইতিহাসকে একদিন ফিরিতে হইয়াছিল।

অনার্যদের সহিত বিরোধের দিনে আর্যসমাজে যাঁহারা বীর ছিলেন, জানিনা তাঁহারা কে। তাঁহাদের চরিতকাহিনী ভারতবর্ষের মহাকাব্যে কই তেমন করিয়া তো বর্ণিত হয় নাই। . . .

কিন্তু অনার্যদের সহিত আর্যদের মিলন ঘটাইবার অধ্যবসায়ে যিনি সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তিনি আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে অবতার বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছেন।"[১৬]

"আমাদের ভারতবর্ষের অতীত যদিবা যত্নের অভাবে আমাদিগকে ফল দেওয়া বন্ধ করিয়াছে, তবু সেই অতীত ধ্বংস হয় নাই, হইতে পারে না; সেই অতীতই ভিতরে থাকিয়া আমাদের পরের নকলকে বারংবার অসঙ্গত ও অকৃতকার্য করিয়া তুলিতেছে। সেই অতীতকে অবহেলা করিয়া যখন আমরা নূতনকে আনি তখন অতীত নিঃশব্দে তাহার প্রতিশোধ লয়—নূতনকে বিনাশ করিয়া, পচাইয়া, বায়ু দূষিত করিয়া দেয়। . . .

সেইজন্য আমাদের অতীতকেই নূতন বল দিতে হইবে, নূতন প্রাণ দিতে হইবে।"[১৭]

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) প্রত্যেক জাতির ইতিহাস তার সামনে একটি স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট সমস্যা উপস্থিত করে। সেই সমস্যার সত্য মীমাংসা ছাড়া কোন জাতি বৃহৎ হতে পারে না এবং সম্মানিত জাতিগোষ্ঠীতে নিজের স্থান অর্জন করতে পারে না।

(খ) ভারতের ইতিহাস-উদ্ভূত এই সমস্যাটি হল—বহু জাতি-ধর্ম-সংস্কৃতি-পল্লবিত দেশ ও সমাজের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সমস্যা।

(গ) ভারতের ইতিহাস মূলত রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নয়। বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত হলেও আমেরিকার সঙ্গে ভারতের মিল নেহাৎই আপতিক। আমেরিকার ঐক্য সমীকরণের ফল। সেটি সম্ভবপর হয়েছে কারণ আমেরিকায় আগত মানুষেরা বেশীর ভাগই একই ধরনের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যপুষ্ট য়ুরোপীয় সমবর্ণের জাতিগুলির অংশ। আদিবাসী রেড্ ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর প্রায় বিলোপ এবং অন্য মহাদেশ থেকে আগত নিগ্রো সমাজের অবস্থা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

(ঘ) ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংঘাত ও সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টিশীল ক্রমবিকাশের পথে বিদেশী রাষ্ট্রাধীনতা নতুন জটিলতার সৃষ্টি করল। এই জটিলতা মুসলমান যুগ থেকে শুরু হয়ে বৃটিশ শাসনের যুগে প্রকট হল। সমাজভেদের মূল সমস্যাটি সমাধান হল না— বিনাশও সম্ভব নয়, শুধু জটিলতর হল।

(ঙ) আর্য অনার্য সংঘাতকে সমাজের অভ্যন্তরে এনে যে হিন্দুসমাজ গড়ে উঠল—তার রক্ষণশীলতা সমাজ-অভ্যন্তরে স্থায়ী যুদ্ধের ফল।

(চ) সমাজ সম্বন্ধের ব্যাপকতা এবং জটিলতাই হিন্দুসমাজে অপেক্ষাকৃত ব্যক্তি-স্বাধীনতা হীনতার কারণ।

(ছ) আর্য অনার্য বিরোধ প্রথম যুগে সমাজকে কেন্দ্রমুখী এবং পরবর্তী যুগে প্রসার-মুখী করেছিল। কেন্দ্রানুসন্ধানের প্রতীক বেদের ব্রহ্মজ্ঞান। সমাহার প্রচেষ্টার নিদর্শন মহাভারত এবং রামায়ণ। প্রাক মুসলিম যুগ পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত দুর্বলভাবে ভারতসমাজের অভ্যন্তরে সংকোচন ও প্রসারণ উভয় ধারাই ক্রিয়াশীল ছিল।

(জ) ভারতবর্ষের অতীতের সৃজনশীলতা রুদ্ধ হয়েছে। রুদ্ধ সৃজনশীলতাকে পুনরুজ্জীবিত করেই ভবিষ্যতের দিকে যাত্রার উদ্যম করতে হবে। অতীতকে অস্বীকার করতে গেলে সব প্রচেষ্টাই নিষ্ফল নকলিয়ানায় পর্যবসিত হবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ঃ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ইতিহাস ও সমাজের তুলনামূলক আলোচনায় বিভিন্ন পর্যায়ে ও একাধিক প্রসঙ্গে জড়িত। ভারতইতিহাসের পর্যালোচনা করতে গিয়ে তার কিছু উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এই অংশে আরও কয়েকটি উদ্ধৃতির সাহায্যে তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্টতররূপে উপস্থিত করা গেল।

"য়ুরোপ এশিয়ায় প্রধান প্রভেদ এই যে য়ুরোপে মনুষ্যের একটা গৌরব আছে। এশিয়াতে তাহা নাই। এই হেতু এশিয়ায় বড়লোককে মহৎ মনুষ্য বলে না, একেবারে দেবতা বলিয়া বসে; কিন্তু য়ুরোপের কর্মপ্রধান দেশে প্রতিদিনই মনুষ্য নানা আকারে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে, সেইজন্য তাহারা আপনাকে নগণ্য, জীবনকে স্বপ্ন এবং জগৎকে মায়া মনে করিতে পারে না। প্রাচ্য খৃষ্টীয় ধর্মের প্রভাবে য়ুরোপীয়দের মনে মধ্যে মধ্যে বিপরীত ভাব উপস্থিত হইলেও তাহা প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যায়। তাই সেখানে রাজার একাধিপত্য ভাঙ্গিয়া আসে, পুরোহিতদের দেবত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং গুরুবাক্যের অভ্রান্তিকতার উপরে স্বাধীন বুদ্ধি জয়লাভ করে।"[১৮]

"য়ুরোপীয় সভ্যতা এক্ষণে বিপুল আয়তন ধারণ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।... এত ভিন্ন ভিন্ন বহুসংখ্যক দেশের উপরে এক মহা সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীতে এমন আশ্চর্য বৃহদ্ ব্যাপার ইতিপূর্বে আর ঘটে নাই।...

য়ুরোপীয় সভ্যতাকে দেশে দেশে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে অন্য সকল বিষয়েই তাহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য দেখা যায়, কেবল একটা বিষয়ে তাহার ঐক্য দেখিতে পাই। তাহা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ।"[১৯]

"'নেশন' শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না।... আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ কিছুই নেশন-গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না।"[২০]

"আমাদের হিন্দু-সভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা

যদি মনে করি য়ুরোপীয় ছাঁদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য—তবে আমরা ভুল বুঝিব।"[২১]

"প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম আছে তেমনি জাতিধর্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে তাহা মানব সাধারণের। আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্মের সংকীর্ণতা নিত্যধর্মকে নানাস্থানে খর্ব করিয়াছিল বলিয়াই তাহা উন্নতির দিকে না গিয়া বিকৃতির পথে গেল। য়ুরোপীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যদি এত অধিক স্ফীতিলাভ করে যে, ধর্মের সীমাকে অতিক্রম করিতে থাকে তবে বিনাশের ছিদ্র দেখা দিবে এবং সেই পথে শনি প্রবেশ করিবে।. . .

. . . রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে য়ুরোপীয় সভ্যতা এতই আত্যন্তিক প্রাধান্য দিতেছে যে সে ক্রমশঃই স্পর্ধিত হইয়া ধ্রুব ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

বস্তুত প্রত্যেক সভ্যতারই একটি মূল আশ্রয় আছে। সেই আশ্রয়টি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা তাহাই বিচার্য। যদি তাহা উদার ব্যাপক না হয়, যদি তাহা ধর্মকে পীড়িত করিয়া বর্ধিত হয়, তবে তাহার আপাত উন্নতি দেখিয়া আমরা তাহাতে যেন ঈর্ষা, এবং তাহাকেই একমাত্র ঈপ্সিত বলিয়া বরণ না করি।"[২২]

ফরাসী মনীষী গিজোর মতামতের সমালোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত। গিজো পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে তার বৈচিত্র্যমুখীনতা, স্বাধীনতাস্পৃহা ও ঐতিহাসিক দীর্ঘস্থায়িতার কারণে ভগবান নির্দেশিত মহত্ত্বের পথ অনুসারী বলিয়া দাবী করিলে রবীন্দ্রনাথ এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

"একথা অস্বীকার করবার যো নেই যে বর্তমান যুগে সমস্ত পৃথিবীর উপরে য়ুরোপ আপন প্রভাব বিস্তার করেছে। তার কারণ আকস্মিক নয়, বাহ্যিক নয়।. . . সে এমন কোন সত্যের নাগাল পেয়েছে যা সর্বকালীন, সর্বজনীন, বা তার সমস্ত প্রয়োজনকে পরিপূর্ণ করে অক্ষয়ভাবে উদ্‌বৃত্ত থাকে। এই হচ্ছে তার বিজ্ঞান।"

"পশ্চিম মহাদেশ তার পলিটিক্সের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে পর করে দিয়েছে, তার বিজ্ঞানের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে নিমন্ত্রণ করেছে।. . . বিজ্ঞান বিশ্বকে প্রকাশ করে; আর সর্বভুক ক্ষুধিত পলিটিক্স তার বিনাশকেই সৃষ্টি করছে।"[২৩]

"আমাদের সৃষ্টিছাড়া ভারতবর্ষ বরাবর সহজ স্বভাবের নিয়মের উপর জয়ী হইবার চেষ্টা করিয়াছে। ছোট বড় সকল বিষয়েই ভারতবর্ষ মানব স্বভাবকে সহজ স্বভাবের ঊর্ধ্বে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। . . . এই দুঃসাধ্য কার্যে সে অনেক সময় মূঢ়তাকে সহায় করিয়া অবশেষে সেই মূঢ়তার দ্বারা নিজের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। ইহা হইতে তাহার চেষ্টার একান্ত লক্ষ্য কোনদিকে তাহা বুঝা যায়।

আমাদের প্রাচীন সমাজ আজ নিজের মঙ্গল হারাইয়াছে, দুর্গতির বিস্তীর্ণ জালের মধ্যে অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে জড়ীভূত হইয়া আছে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি বটে; তবু বলিতে হইবে, মঙ্গলকেই লাভ করিবার জন্য ভারতবর্ষে সর্বাঙ্গীণ চেষ্টা ছিল।"[২৪]

"আমাদের সমাজে প্রাচীন কালটা নিজের সচেতন আদর্শকে অন্তরাল করিয়া ফেলি-

য়াছে বলিয়া, জড় অনুষ্ঠানে জ্ঞানকে সে আধ-মরা করিয়া পিঁজরার মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে বলিয়া, আমরা য়ুরোপীয় আদর্শের সহিত নিজেদের আদর্শের তুলনা করিয়া গৌরব অনুভব করিবার অবকাশ পাই না। আমরা কথায় কথায় লজ্জা পাই। আমাদের সমাজের দুর্ভেদ্য জড়স্তূপ হিন্দুসভ্যতার কীর্তিস্তম্ভ নহে, ইহার অনেকটাই সুদীর্ঘকালের যত্নসাধিত ধুলা-মাত্র। অনেক সময় য়ুরোপীয় সভ্যতার কাছে ধিক্কার পাইয়া আমরা এই ধূলিস্তূপকে লইয়াই গায়ের জোরে গর্ব করি, কালের এই সমস্ত অনাহূত আবর্জনারাশিকেই আমরা আপনার বলিয়া অভিমান করি — ইহার অভ্যন্তরে যেখানে আমাদের যথার্থ গর্বের ধন হিন্দুসভ্যতার প্রাচীন আদর্শ আলোক ও বায়ুর অভাবে মূর্ছান্বিত হইয়া পড়িয়া আছে সেখানে দৃষ্টিপাত করিবার পথ পাই না।"[২৫]

"বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন — ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। . . .

আমরা ভারতবর্ষের বিধাতৃনির্দিষ্ট এই নিয়োগটি যদি স্মরণ করি তবে আমাদের লক্ষ্য স্থির হইবে, লজ্জা দূর হইবে — ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে তাহার সন্ধান পাইব। আমাদিগকে ইহা মনে রাখিতেই হইবে যে য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানকে যে চিরকালই আমরা শুদ্ধমাত্র ছাত্রের মত গ্রহণ করিব তাহা নহে—ভারতবর্ষের সরস্বতী জ্ঞান বিজ্ঞানে সমস্ত দল ও দলাদলিকে একটি শতদল পদ্মের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবেন, তাহাদের খণ্ডতা দূর করিবেন। ভারতবর্ষ কাহাকেও ত্যাগ করিবার, কাহাকেও দূরে রাখিবার পক্ষে নহে — ভারতবর্ষ সকলকেই স্বীকার করিবার, গ্রহণ করিবার, বিরাট একের মধ্যে সকলকেই স্ব স্ব প্রধান প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিবার পন্থা এই বিবাদ নিরত ব্যবধান-সঙ্কুল পৃথিবীর সম্মুখে একদিন নির্দেশ করিয়া দিবে।"[২৬]

"জীবনের পরিবর্তন বিকাশ, মৃত্যুর পরিবর্তন বিকার, আমাদের সমাজেও দ্রুতবেগে পরিবর্তন চলিতেছে, কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে সচেতন অন্তঃকরণ নাই বলিয়া সে পরিবর্তন বিকার ও বিশ্লেষণের দিকে যাইতেছে—কেহ তাহা ঠেকাইতে পারিতেছে না।

সজীব পদার্থ সচেষ্টভাবে বাহিরের অবস্থাকে নিজের অনুকূল করিয়া আনে — আর নির্জীব পদার্থকে বাহিরের অবস্থাই সবলে আঘাত করিয়া নিজের আয়ত্ত করিয়া লয়। আমাদের সমাজে যাহা কিছু পরিবর্তন হইতেছে, তাহাতে চেতনার কার্য নাই; তাহাতে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য চেষ্টা নাই — বাহির হইতে পরিবর্তন ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতেছে এবং সমাজের সমস্ত সন্ধি শিথিল করিয়া দিতেছে।"[২৭]

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) য়ুরোপীয় সভ্যতা রাষ্ট্রভিত্তিক। ভারতীয় সভ্যতা সমাজভিত্তিক।

(খ) য়ুরোপে মনুষ্যের স্থান উচ্চে। কর্মপ্রধান য়ুরোপ মানুষের বুদ্ধি ও ক্ষমতার অসীমতায় আস্থাবান। এশিয়ায় এই উপলব্ধি অনুপস্থিত।

(গ) রাষ্ট্রিক বা নেশনভিত্তিক চেতনা য়ুরোপকে বর্তমান বিশ্বে আধিপত্য প্রদান করলেও ইতিহাসে সেইটি একমাত্র বা চূড়ান্ত সত্য নয়। এই সাফল্যের মধ্যেই মানবিক ধর্ম পীড়িত হচ্ছে। ফলে এই ব্যবস্থার বিরোধী শক্তিরও অনিবার্যভাবে জন্ম হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে য়ুরোপের উগ্র জাতীয়তাবাদই সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়ে য়ুরোপীয় সভ্যতার কল্যাণকর মূল ভিত্তিটিকে দুর্বল করেছে।

(ঘ) যদিও রাষ্ট্রশক্তিই য়ুরোপের সাফল্যের বাহ্যিক রূপ তথাপি তার সত্য রূপ বিজ্ঞানময়তায়।

(ঙ) সামাজিকতা ভারতবর্ষের প্রাণ। বহু জাতির বহু বর্ণের ভারতবর্ষের মূল বাণী সামাজিক আত্মীয়তা। জাতিতে জাতিতে প্রেম ও সৌভ্রাত্র, বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি।

(চ) ভারতবর্ষ পরিবর্তনহীন অবস্থায় নেই। কিন্তু জাতির অন্তরের সজীবতার অভাব বাইরের জিনিষকে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করে আত্মস্থ করার পরিবর্তে, বাইরের ধাক্কা জাতিকে অভিভূত করছে। ভারতবর্ষের নিজের ঐতিহ্যবাহী শক্তিকে পুনর্জাগরিত করলে তবেই পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে সুস্থ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্ভব হবে।

(ছ) যে কোন সভ্যতারই গতি যদি সর্বমানবের ধ্রুবধর্ম বিরোধী হয় তবে সাময়িক সাফল্য সত্ত্বেও তার বিকার ও পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব সে সাময়িক সাফল্যের ঔজ্জ্বল্যকে অস্বীকার না করতে পারলেও অভিভূতভাবে তা অনুকরণ করার প্রয়োজন নেই।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনা ও মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রনীতির সাফল্যকে নস্যাৎ না করে তার মূল বিজ্ঞানময়তার শক্তিকে দেখতে পেয়েছিলেন। তেমনই আবার শ্রেষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানীদের মত একথাও মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি যে এই সাফল্যই ইতিহাসের চূড়ান্ত রায় নয়; মানব সত্যেরও চূড়ান্ত বিকাশ নয়।

গ্রাম ও সহর (লোকালয়ের রূপ)ঃ

"লোকালয় বলতে কেবলমাত্র অনেকে একত্র জমা হওয়ার গণিতরূপ নয়, ব্যবহার নীতির দ্বারা এই একত্র জমা হওয়ার একটা কল্যাণ রূপ। . . ."

". . . মানুষের অন্ন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত ও প্রচুর হতে পেরেছে বড় বড় নদীর কূলে —সেইখানে জন্মেছে বড় বড় সভ্যতা, অর্থাৎ লোকালয় বন্ধনের সুব্যবস্থা। . . . মানুষ যখন একই জায়গায় প্রচুর ফসল ফলিয়ে তুললে তখনই অনেক লোক একস্থানে স্থায়ীভাবে আবাস পত্তন করতে পারলো—তখনই পরস্পরকে বঞ্চিত করার চেয়ে পরস্পরের আনুকূল্য করায় মানুষ সফলতা দেখতে পেল। . . . দেখতে পেল পরস্পরের যোগ কেবলমাত্র সুযোগ নয়, তাতে আনন্দ। দৈন্যে মানুষের দাক্ষিণ্য সঙ্কুচিত করে, অথচ দাক্ষিণ্যেই সমাজের প্রতিষ্ঠা। তাই ধরণীর অন্নভাণ্ডারের প্রাঙ্গণেই বাঁধা হয়েছে মানুষের গ্রাম। . . . গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে নগরেরও উদ্ভব। সেখানে রাষ্ট্রশাসনের শক্তি পুঞ্জীভূত; . . . সেখানে মাটির বুকের পরে জগদ্দল পাথর, জীবিকা সেখানে কঠিন, শক্তির সঙ্গে শক্তির প্রতিযোগিতা। সেখানে সকল মানুষকে হার মানিয়ে

একলা মানুষ বড় হতে চাচ্ছে। বাড়াবাড়ি না হলে তারও ফল মন্দ নয়। ... শহরে মানুষ আপন কর্মোদ্যমকে কেন্দ্রীভূত করে; তার প্রয়োজন আছে।

পূর্বকালে ধনসৃষ্টি প্রভৃতির প্রয়োজনসাধনে যন্ত্রের হাত ছিল অতি সামান্যই। তখনকার যন্ত্রগুলির সঙ্গে মানুষের শরীর মনের যোগ সর্বক্ষণ অব্যবহিত ছিল। সেইজন্য তার থেকে যা উৎপন্ন হতে পারত তা ছিল পরিমিত, আর তার মুনাফা বিকট প্রকাণ্ড ছিল না। তাই তখনকার নগরগুলি মানুষের কীর্তির আনন্দরূপ গ্রহণ করতে পারত।

অন্যান্য সকল রিপুর মতই লোভটা সমাজবিরোধী প্রবৃত্তি। আধুনিককালে যন্ত্রের সহযোগে কর্মের শক্তি যেমন বহু গুণিত, তেমনি তার লাভ বহু অঙ্কের, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তার লোভ। এতে করেই ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে সমাজস্বার্থের সামঞ্জস্য টলমল করে উঠ্‌ছে। ...

এই অবস্থায় গ্রামের সঙ্গে শহরের একান্নবর্তিতা চলে যায়, শহর গ্রামকে কেবল শোষণ করে, কিছু ফিরিয়ে দেয় না।

এখনকার কালের সাধনা লোকালয়কে আবার সমগ্র করে তোলা। বিশিষ্টে সাধারণে, শক্তিতে সৌহার্দ্যে, শহরে গ্রামে মিলিয়ে সম্পূর্ণ করা।"[২৮]

"অন্নের উৎপাদন হয় পল্লীতে আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে। অর্থ উপার্জনের সুযোগ ও উপকরণ সেখানেই কেন্দ্রীভূত, স্বভাবতঃ সেখানেই আরাম, আরোগ্য, আমোদ ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোককে ঐশ্বর্যের আশ্রয় দান করে। পল্লীতে সেই ভোগের উচ্ছিষ্ট যা কিছু পৌঁছোয় তা যৎকিঞ্চিৎ। গ্রামে অন্ন উৎপাদন করে বহুলোকে, শহরে অর্থ উৎপাদন ও ভোগ করে অল্পসংখ্যক মানুষ, অবস্থার এই কৃত্রিমতায় অন্ন এবং ধনের পথে মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ ঘটেছে। এই বিচ্ছেদের মধ্যে যে সভ্যতার বাসা বাঁধে তার বাসা বেশীদিন টিকতেই পারে না।"[২৯]

"অন্ততঃ ভারতবর্ষে এমন একদিন ছিল যখন পল্লীবাসী, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে দেশের জনসাধারণ, কেবল যে দেশের ধনের ভাগী ছিল তা নয়, দেশের বিদ্যাও তারা পেয়েছে নানা প্রণালী দিয়ে।"

...আজ পল্লী আমাদের আধমরা; যদি এমন কল্পনা করে আশ্বাস পাই যে, অন্ততঃ আমরা আছি বেচে, তবে ভুল হবে। কেননা মুমূর্ষুর সজীবের সহযোগ মৃত্যুর দিকেই টানে।"[৩০]

"পল্লীগ্রামের মানুষের যে বিশেষ পরিচয় পেয়েছিলুম তাতে এই অনুভব করেছিলুম যে আমাদের জীবনের ভিত্তি রয়েছে পল্লীতে। আমাদের দেশের মা, দেশের ধাত্রী পল্লী-জননীর স্তন্যরস শুকিয়ে গিয়েছে।"[৩১]

"তখন কেবলই মনে হতো জনকতক ইংরেজী জানা লোক ভারতবর্ষের উপর — যেখানে এত দুঃখ দৈন্য, এত হাহাকার ও শিক্ষার অভাব সেখানে কেমন করে রাষ্ট্রীয় সৌধ নির্মাণ করবে।"[৩২]

"এই সঙ্গে একটা কথা বিশেষ করে বলা দরকার। আমি যখন ইচ্ছা করি যে আমাদের দেশের গ্রামগুলি বেঁচে উঠুক, তখন কখনও ইচ্ছা করিনে যে গ্রাম্যতা ফিরে আসুক। গ্রাম্যতা হচ্ছে সেই রকম সংস্কার, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিশ্বাস ও কর্ম, যা গ্রামসীমার বাইরের সঙ্গে বিযুক্ত — বর্তমান যুগের যে প্রকৃতি তার সঙ্গে যা কেবলমাত্র পৃথক নয়, যা বিরুদ্ধ। বর্তমান যুগের বিদ্যা ও বুদ্ধির ভূমিকা বিশ্বব্যাপী, যদিও তার হৃদয়ের অনুবেদনা সম্পূর্ণ সে পরিমাণে ব্যাপক হয়নি। গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে, যে প্রাণের উপাদান তুচ্ছ ও সংকীর্ণ নয়, যার দ্বারা মানব প্রকৃতিকে কোনদিকে খর্ব ও তিমিরাবৃত না রাখা হয়।"[৩৩]

"প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে পরের উপর নির্ভর করবার ব্যবস্থা চলে আসছে। . . . সমস্ত গ্রামের শ্রী নির্ভর করতো সম্পন্ন গৃহস্থদের উপর। আমি এই ব্যবস্থার প্রশংসা করেছি, কিন্তু একথাও সত্য যে এতে আমাদের স্বাবলম্বনের শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে। . . .

আমাদের সমাজে যারা দরিদ্র তারা অনেক অপমান সয়েছে, যারা শক্তিমান তারা অনেক অত্যাচার করেছে, তার ছবি আমি নিজেই দেখেছি। অন্যদিকে এই সব শক্তিমানেরাই গ্রামের সকল পূর্তকাজ করে দিয়েছে। অত্যাচার ও আনুকূল্য এই দুই-এর ভিতর দিয়ে পল্লীবাসীর মন অসহায় ও আত্মসম্মানহীন হয়ে পড়েছে।"[৩৪]

. . . "য়ুরোপীয় সভ্যতার সমস্ত আয়োজন, শিক্ষা, আরোগ্যবিধান প্রভৃতির সমস্ত ব্যবস্থা সংহত বড় বড় শহরে, এইজন্য শহর গ্রামবাসীর চিত্তকে আকর্ষণ করে, গ্রামে তারা বোধ করে বঞ্চিত।

তবে য়ুরোপে শহর ও গ্রামের এই যে ভাগ তা প্রধানতঃ পরিমাণগত, শহরে যা বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় গ্রামে সেটা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হয় না।

য়ুরোপে নগরই সমস্ত ঐশ্বর্যের পীঠস্থান, এটাই য়ুরোপীয় সভ্যতার লক্ষণ। এইজন্য গ্রাম থেকে শহরে চিত্তধারা আকৃষ্ট হয়ে চলছে। কিন্তু এটা লক্ষ্য করতে হবে যে শহর গ্রামের চিত্তধারার মধ্যে, শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে কোন বিরোধ নেই; যে কেউ গ্রাম থেকে শহরে যাওয়ামাত্র তার যোগ্যতা থাকলে সেখানে সে স্থানলাভ করতে পারে, শহরে নিজেকে বিদেশী মনে করবার কোন কারণ ঘটে না। এই কথাটা আমার মনে লেগেছিল। আমাদের সঙ্গে এর প্রভেদটা লক্ষ্য করবার বিষয়।"[৩৫]

"একদিন আমাদের দেশের যা-কিছু ঐশ্বর্য, যা প্রয়োজনীয়, সবই বিস্তৃত ছিল গ্রামে গ্রামে—শিক্ষার জন্য, আরোগ্যের জন্য, শহরের কলেজ হাসপাতালে ছুটতে হতো না . . . দেশবাসীর মধ্যে পরস্পর মিলনের কোন বাধা ছিল না, শিক্ষা আনন্দ সংস্কৃতির ঐক্যটি সমস্ত দেশে সর্বত্র প্রসারিত ছিল।

ইংরেজ যখন এদেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলে তখন দেশের মধ্যে এক অদ্ভুত অস্বাভাবিক ভাগের সৃষ্টি হলো।

. . . সেই ভাগেরই ফল আজ আমরা দেখছি। পল্লীবাসীরা আছে সুদূর মধ্যযুগে,

আর নগরবাসীরা আছে বিংশ শতাব্দীতে। দুই-এর মধ্যে ভাবের কোন ঐক্য নেই, মিলনের কোন ক্ষেত্র নেই, দুই এর মধ্যে এক বিরাট বিচ্ছেদ।"৩৬

"য়ুরোপের মত আমাদের জনসমূহ নাগরিক নয় — চিরদিনই চীনের মত ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান। নাগরিক চিত্তবৃত্তি নিয়ে ইংরেজ আমাদের সেই ঘনিষ্ঠ পল্লীজীবনের গ্রন্থি কেটে দিয়েছে। তাই আমাদের মৃত্যু আরম্ভ হয়েছে ঐ নিচের দিক দিয়ে। দেশকে কোন-দিক থেকে রক্ষা করতে হবে আমার তরফ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর আমার ঐ গ্রামের কাজে।"৩৭

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগিতায় সৃষ্টিশীল মানুষের লোকালয় গ্রাম। গ্রামের মূল রূপ সামাজিক ও কল্যাণধর্মী।

(খ) সীমিত ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং প্রতিযোগিতার উপরে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সহযোগিতা গ্রামেই প্রত্যক্ষ।

(গ) শহরে মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যের রূপই প্রধান। শহরের মূলধর্ম সহযোগিতা নয় প্রতিযোগিতা।

(ঘ) পুঞ্জীভূত শক্তির রূপই রাষ্ট্রশক্তিতে প্রকাশিত। শহরে রাষ্ট্রশাসনের শক্তি পুঞ্জীভূত। তাই রাষ্ট্রনৈতিক য়ুরোপের প্রাণ শহরে, সমাজকেন্দ্রিক ভারতবর্ষের প্রাণ গ্রামে।

(ঙ) পুরাতন নগর ও বর্তমান যুগের শহর এক নয়। যন্ত্রবিপ্লব পরবর্তী যুগের শহরে মানুষ অনেক বেশী অনন্বয়িত। বর্তমানকালে শহর গ্রামের সম্পর্ক বিকৃত। শহর গ্রামের সম্পর্ক শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক।

(চ) নগরকেন্দ্রিক য়ুরোপে গ্রাম শহর সম্পর্কের মধ্যে কোন দুস্তর পারাবার নেই। কিন্তু বৃটিশশাসিত ভারতবর্ষে শহর ও গ্রামের বিচ্ছেদ প্রায় অলঙ্ঘ্য।

(ছ) গ্রাম যেমন সহজ সামাজিকতার ক্রীড়াভূমি, শহর তেমনই শিক্ষাচর্চা বিজ্ঞান-মুখীনতা এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের কেন্দ্র, অতএব পশ্চাৎমুখীন গ্রামসর্বস্বতা নয়, গ্রামও শহরের সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তিতে সমৃদ্ধতর লোকালয়ই লক্ষ্য।

(জ) ভারতবর্ষের পুরাতন গ্রামসমাজ ধনীদের মুখাপেক্ষী ছিল এবং স্বাবলম্বনের চর্চা চিরকালই দুর্বল ছিল। সে আদর্শ বর্তমান কালের অনুপযোগী।

(ঝ) যেহেতু গ্রামই ভারতীয় সমাজের ভিত্তি তাই জাতীয় পুনরুজ্জীবনের কার্যক্রম গ্রাম দিয়েই সুরু করতে হবে।

(ঞ) গ্রামের পুনরুজ্জীবন মানে গ্রাম্যতার পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নয়। বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কহীন গ্রামস্বাতন্ত্র্য এবং সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে ন্যাসবাদ যুগপ্রকৃতি বিরুদ্ধ, তাই অসত্য।

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে রুশো ভলটেয়ার থেকে টলস্টয় গান্ধী পর্যন্ত মনীষীদের গ্রাম স্বরাজ, প্রকৃতিতে ফিরে যাওয়া এবং সম্পত্তির প্রশ্নে ন্যাসবাদী চিন্তাধারার বহু

মৌলিক সত্য রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেও তার ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী উল্লেখ-যোগ্য পার্থক্যও সৃষ্টি করেছে। উপরন্তু এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীতেও রাশিয়া ভ্রমণ অভিজ্ঞতার পূর্বে ও পরে লক্ষণীয় পার্থক্য ঘটেছে।

কয়েকটি বিশিষ্ট সমাজসমস্যার বিচার

দারিদ্র্যের মূল ও তার সমাধান—উৎপাদন ও বন্টন ঃ

"সকল দেশেই গরীব বেশী, ধনী কম। তাই যদি হয় তবে কোন্ দেশকে বিশেষ করিয়া গরীব বলিব? এ কথার জবাব এই, যে দেশে গরীবের পক্ষে রোজগার করিবার উপায় অল্প, রাস্তা বন্ধ। যে দেশে গরীব, ধনী হইবার ভরসা রাখে সে দেশে সেই ভরসাই একটা মস্ত ধন। আমাদের দেশে টাকার অভাব আছে, একথা বলিলে সবটা বলা হয় না। আসল কথা আমাদের দেশে ভরসার অভাব।"

"এই সময় (বৃটিশ পূর্বকাল—লেখক) ভারতবর্ষ তার বিপুল ঐশ্বর্যের জন্য জগতে বিখ্যাত ছিল। তখনকার বিদেশী ঐতিহাসিকেরা সেকথা বারংবার ঘোষণা করে গেছেন। . . . তখন বিদেশ থেকে যারা এসে এখানকার রাজাসনে বসেছে তারা এ ধর্ন ভোগ করেছে, কিন্তু নষ্ট করেনি। অর্থাৎ তারা ভোগী ছিল, কিন্তু বণিক ছিল না। . . . ধন উৎপাদনের বিচিত্র কাজ তখন অব্যাহত চলছিল, . . . তা যদি না হতো তাহলে এখানে বিদেশী বণিকের ভীড় ঘটবার কোন কারণ থাকতো না — মরুভূমিতে পঙ্গপালের ভীড় জমবে কেন?

তারপরে ভারতবর্ষে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের অশুভ সঙ্গমকালে বণিক রাজা দেশের ধনকল্পতরুর শিকড়গুলোকে কী করে ছেদন করতে লাগলেন, সে ইতিহাস শতবার-কথিত এবং অত্যন্ত শ্রুতিকটু। কিন্তু পুরাতন বলে সেটাকে বিস্মৃতির মুখ ধূলিচাপা দিয়ে রাখবার চেষ্টা চলবে না। এ দেশের বর্তমান দুর্বহ দারিদ্র্যের উপক্রমণিকা সেইখানে।"[৩৯]

"আমাকে এক পাড়াগাঁয়ে মাঝে মাঝে যাইতে হয়। সেখানে বারান্দায় দাঁড়াইয়া দক্ষিণের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখা যায় পাঁচ-ছয় মাইল ধরিয়া ক্ষেতের পরে ক্ষেত চলিয়া গেছে। ঢের লোকে এইসব জমি চাষ করে। . . . এই জমির যখন চাষ চলিতে থাকে তখন প্রথমেই এই কথা মনে হয় হালের গরু কোথাও-বা জমির পক্ষে যথেষ্ট, কোথাও-বা যথেষ্টর চেয়ে বেশী, কোথাও-বা তার চেয়ে কম। . . . যদি প্রত্যেক চাষী কেবল নিজের ছোট জমিটুকুকে অন্য জমি হইতে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া না দেখিত, যদি সকলের জমি এক করিয়া সকলে এক যোগে মিলিয়া চাষ করিত, তবে অনেক কম লাগিত, অনেক বাজে মেহনৎ বাঁচিয়া যাইত। . . . যদি অনেক চাষী মিলিয়া এক গোলায় ধান তুলিতে পারিত ও এক জায়গা হইতে বেচিবার ব্যবস্থা করিত তাহা হইলে অনেক বাজে খরচ ও বাজে পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইত। যার

বড় মূলধন আছে তার এই সুবিধা থাকাতে যে মুনাফা করিতে পারে, খুচ্‌রো খুচ্‌রো কাজের যে-সমস্ত অপব্যয় ও অসুবিধা তাহা তার বাঁচিয়া যায়।

যত অল্প সময়ে যে যত বেশী কাজ করিতে পারে তারই জিত। এইজন্যই মানুষ হাতিয়ার দিয়ে কাজ করে। ... যে অসভ্য শুধু হাত দিয়া মাটি আঁচড়াইয়া চাষ করে তাহাকে হলধারীর কাছে হার মানিতেই হইবে। ... সকল কাজেই মানুষ গায়ের জোরে জেতে নাই, কল-কৌশলেই জিতিয়াছে। ... ইহাতেই মানুষের এত উন্নতি হইয়াছে, নহিলে মানুষের সঙ্গে বনমানুষের বেশী তফাৎ থাকিত না।

এইরূপ হাতের সঙ্গে হাতিয়ারে মিলিয়া আমাদের কাজ চলিতেছিল। এমন সময় বাষ্প ও বিদ্যুতের যোগে এখনকার কালের কল-কারখানার সৃষ্টি হইল। ... যেমন একদিন হাতিয়ারের কাছে শুধু হাতকে হার মানিতে হইয়াছে। তেমনি কলের কাছে আজ শুধু হাতিয়ারকে হার মানিতে হইল। ...

একথা আজ আমাদের চাষীদেরও ভাবিবার দিন আসিয়াছে। নহিলে তাহারা বাঁচিবে না। কিন্তু এসব কথা পরের কারখানা-ঘরের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ভ্রুঝা যায় না। নিজে হাতে-কলমে ব্যবহার করিলে তবে স্পষ্ট বোঝা যায়।"[৪০]

"মানুষের ধর্মই এই যে সে অনেকে মিলে একত্র বাস করতে চায়। একলা মানুষ কখনই পূর্ণমানুষ হতে পারে না ...।

দল বেঁধে থাকা, দল বেঁধে কাজ করা মানুষের ধর্ম বলেই সেই ধর্ম সম্পূর্ণভাবে পালন করাতেই মানুষের কল্যাণ, তার উন্নতি। ...

... কল্যাণের দাবি হচ্ছে স্বার্থের দাবির বিপরীত এবং স্বার্থের দাবির চেয়ে তা উপরের জিনিস। দানের যে উপদেশ আছে তাতে ধনীর স্বার্থকে সাধারণের কল্যাণের সঙ্গে জড়িত করবার চেষ্টা করা হয়েছে বটে, কিন্তু কল্যাণকে স্বার্থের অনুবর্তী করা হয়েছে, তাকে পুরোবর্তী করা হয়নি। সেইজন্য দানের দ্বারা দারিদ্র্য দূর না হয়ে বরঞ্চ তা পাকা হয়ে ওঠে।"[৪১]

... "ধর্মের দোহাই বা গায়ের জোরের দোহাই এই দুয়ের কোনটাই মানব সমাজের দারিদ্র্য-মোচনের পন্থা নয়। মানুষকে দেখানো চাই যে, বড় মূলধনের সাহায্যে অর্থ-সম্ভোগকে ব্যক্তিগত স্বার্থের সীমার মধ্যে একান্ত আটকে রাখা সম্ভব হবেনা।" ...

... জনসাধারণে যদি নিজের অর্জনশক্তিকে একত্র মেলাবার উদ্যোগ করে তবে এই কথাটা স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারে যে, যে মূলধনের মূল সকলের মধ্যে তার মূল্য ব্যক্তি-বিশেষের মূলধনের চেয়ে অসীমগুণে বেশী। এইটি দেখাতে পারলেই তবে মূলধনকে নিরস্ত্র করা যায়, অস্ত্রের জোরে করা যায় না। মানুষের মনে ধনভোগ করার ইচ্ছা আছে, সেই ইচ্ছাকে কৃত্রিম উপায়ে দলন করে মেরে ফেলা যায় না। সেই ইচ্ছাকে বিরাট-ভাবে সার্থক করার দ্বারাই তাকে তার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করা যেতে পারে।

(কিন্তু) যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডিমক্রাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। কেননা, সকল-রকম প্রতাপের প্রধান বাহক হচ্ছে অর্থ।

. . . যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতাকে সর্বসাধারণের সম্পদ্ করে তোলবার মূল উপায় হচ্ছে ধন-অর্জনে সর্বসাধারণের শক্তিকে সম্মিলিত করা। . . . সমবায়-প্রণালীতে অনেকে আপন শক্তিকে যখন ধনে পরিণত করতে শিখবে তখনই সর্বমানবের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপিত হবে।"[৪২]

"বর্তমান যুগে ধনোপার্জনের অধ্যবসায়ে প্রকৃতির শক্তিভাণ্ডারের নানা রুদ্ধ কক্ষ খোলবার চাবি যখন থেকে বিজ্ঞান খুঁজে পেয়েছে তখন থেকে যারা সেই শক্তিকে আয়ত্ত করেছে এবং যারা করেনি তাদের মধ্যে অসাম্য অত্যন্ত অধিক হয়ে উঠেছে। এককালে পণ্য-উৎপাদনের শক্তি, তার উপকরণ ও তার মুনাফা ছিল অল্পপরিমিত; সুতরাং তার দ্বারা সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট হতে পারেনি। কিন্তু এখন ধন জিনিসটা সমাজের অন্য সকল সম্পদকেই ছাড়িয়ে গিয়ে এমন একটা বিপুল অসাম্য সৃষ্টি করছে যাতে সমাজের প্রাণ পীড়িত, মানবপ্রকৃতি অভিভূত হয়ে পড়ছে। . . . যন্ত্রসহায় পুঞ্জীভূত ধন আর সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক শক্তির মধ্যে এমন অতিশয় অসামঞ্জস্য যে, সাধারণ মানুষকে পদে পদে হার মানতে হচ্ছে।

. . . ঐক্যের সত্য অর্থনীতির মধ্যেও প্রচলিত হতে পারলে তবেই অসাম্যগত বিরোধ ও দুর্গতি থেকে মানুষ রক্ষা পেতে পারে।"[৪৩]

"ইংরেজিতে যাকে বলে এক্স্‌প্লইটেশন, অর্থাৎ শোষণনীতি, বর্তমান সভ্যতার নীতিই তাই। . . .

. . . এই সভ্যতা দরিদ্রকে প্রতিক্ষণেই অপমানিত করে। কেননা, দারিদ্র্য একে বাধাগ্রস্ত করতে থাকে।

. . . আজকালকার দিনের রাষ্ট্রনীতির মূলে রাজপ্রতাপের লোভ নেই, ধন-অর্জনের জন্য বাণিজ্যবিস্তারের লোভ।"[৪৪]

. . . "জ্ঞানসমবায়ের ফলে য়ুরোপ যে প্রচণ্ড শক্তিকে হস্তগত করেছে আত্ম-বিনাশের জন্য সেই শক্তিকেই য়ুরোপ ব্যবহার করবার জন্য উদ্যত। মানুষের সমবায়-নীতি ও অসমবায়নীতির বিরুদ্ধফলের এমন প্রকাণ্ড দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর দেখিনি। জ্ঞানের অন্বেষণে বর্তমান যুগে মানুষ বাঁচাবার পথে চলেছে, আর বিষয়ের অন্বেষণে মারবার পথে। শেষ পর্যন্ত কার জয় হবে সে কথা বলা শক্ত হয়ে উঠল।

কেউ কেউ বলেন, মানুষের ব্যবহার থেকে যন্ত্রগুলোকে একেবারে নির্বাসিত করলে তবে আপদ মেটে। একথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়।

. . . মানুষের কর্মশক্তির বাহনযন্ত্রকে যে জাতি আয়ত্ত করতে পারেনি সংসারে তার পরাভব অনিবার্য, যেমন অনিবার্য মানুষের কাছে পশুর পরাভব।

শক্তিকে খর্ব করব না, অথচ সংহত শক্তিদ্বারা মানুষকে আঘাত করা হবে না, এ-দুয়ের সামঞ্জস্য কী করে হতে পারে সেইটেই ভেবে দেখবার বিষয়।"[৪৫]

"অর্থশক্তি সম্বন্ধেও এই কথাটাই খাটে। আজকালকার দিনে অর্থশক্তি বিশেষ ধনী-সম্প্রদায়ের মুঠোর মধ্যে আটকা পড়েছে। তাতে অল্প লোকের প্রতাপ ও অনেক লোকের

দুঃখ। অথচ বহুলোকের কর্মশক্তিকে নিজের হাতে সংগ্রহ করে নিতে পেরেছে বলেই ধনবানের প্রভাব। তার মূলধনের মানেই হচ্ছে বহুলোকের কর্মশ্রম তার টাকার মধ্যে রূপক মূর্তি নিয়ে আছে। সেই কর্মশ্রমই হচ্ছে সত্যকার মূলধন, এই কর্মশ্রমই প্রত্যক্ষ-ভাবে আছে শ্রমিকদের প্রত্যেকের মধ্যে। তারা যদি ঠিকমত করে বলতে পারে যে 'আমরা আমাদের ব্যক্তিগত শক্তিকে এক জায়গায় মেলাব' তাহলে সেই হয়ে গেল মূলধন।"[৪৬]

"বিষয় ব্যাপারে মানুষ অনেক কাল থেকে আপন মনুষ্যত্বকে উপেক্ষা করে আসছে। এইক্ষেত্রে সে আপন শক্তিকে একান্তভাবে আপনারই লোভের বাহন করেছে। সংসারে তাই এইখানেই মানুষের দুঃখ ও অপমান এত বিচিত্র ও পরিব্যাপ্ত।

. . . পৃথিবী জুড়ে আজ শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত অগ্নিকাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। ব্যক্তিগত লোভ আজ জগৎব্যাপী বেদীতে নরমেধযজ্ঞে প্রবৃত্ত।

তাই আজকের দিনের সাধনায় ধনীরা প্রধান নয়, নির্ধনেরাই প্রধান। বিরাট্‌কায় ধনের পায়ের চাপ থেকে সমাজকে, মানুষের সুখশান্তিকে বাঁচাবার ভার তাদেরই পরে। . . . নির্ধনের দুর্বলতা এতদিন মানুষের সভ্যতাকে দুর্বল ও অসম্পূর্ণ করে রেখেছিল, আজ নির্ধনকেই বল লাভ করে তার প্রতিকার করতে হবে।"

"একথা মাঝে মাঝে শোনা যায় যে, এক কালে আমাদের জীবনযাত্রা যে-রকম নিতান্ত স্বল্পোপকরণ ছিল তেমনি আবার যদি হতে পারে তাহলে দারিদ্র্যের গোড়া কাটা যায়। তার মানে, সম্পূর্ণ অধঃপাত হলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তাকে পরিত্রাণ বলে না।"[৪৭]

"অতীত কালের সামান্য সম্বল নিয়ে বর্তমান কালে কোনোমতে বেঁচে থাকা মানুষের নয়। মানুষের প্রয়োজন অনেক, আয়োজন বিস্তর, সে আয়োজন যোগাবার শক্তিও তার বহুধা। . . . একদিন পায়ে-হাঁটা মানুষ যখন গোরুর গাড়ি সৃষ্টি করলে তখন সেই গাড়িতে তার ঐশ্বর্য প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সেই গোরুর গাড়ির মধ্যেই আজকের দিনের মোটরগাড়ির তপস্যা প্রচ্ছন্ন ছিল। যে মানুষ সেদিন গোরুর গাড়িতে চড়েছিল সে যদি আজ মোটর-গাড়িতে না চড়ে তবে তাতে তার দৈন্যই প্রকাশ পায়। যা এক কালের সম্পদ তাই আর এক কালের দারিদ্র্য। সেই দারিদ্র্যে ফিরে যাওয়ার দ্বারা দারিদ্র্যের নিবৃত্তি শক্তি-হীন কাপুরুষের কথা।"

"একথা আমি বিশ্বাস করিনে, বলের দ্বারা বা কৌশলের দ্বারা ধনের অসাম্য কোন-দিন সম্পূর্ণ দূর হতে পারে। কেননা, শক্তির অসাম্য মানুষের অন্তর্নিহিত।"[৪৮]

"রাষ্ট্রনীতি যেমন একান্ত নেশন-স্বাতন্ত্র্যে, জীবিকাও তেমনি একান্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে আবদ্ধ। এখানে তাই এত প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, প্রতারণা, মানুষের এত হীনতা। কিন্তু মানুষ যখন মানুষ তখন তার জীবিকাও কেবল শক্তিসাধনার ক্ষেত্র না হয়ে মনুষ্যত্ব সাধনার ক্ষেত্র হয়, এইটেই উচিত ছিল। . . . কয়েক বছর পূর্বে যেদিন সমবায়-মূলক জীবিকার কথা প্রথম শুনি, আমার মনে জটিল সমস্যার একটা গাঁট যেন অনেকটা খুলে গেল।"[৪৯]

সিদ্ধান্ত ঃ

রবীন্দ্রনাথ অর্থনীতিবিদ্ নাহলেও তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনা (সমাজ) দার্শনিক ধারায় একদিকে সাধারণ অর্থনৈতিক তত্ত্ব অন্যদিকে বিশেষভাবে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের অভিজ্ঞতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। তাঁর মতে ঃ

(ক) ভারতবর্ষের দারিদ্র্য কোনও ইতিহাস বর্জিত, বিবর্তনহীন চিরস্থায়ী দুর্ভাগ্য নয়। কয়েক শতাব্দীর বিশেষত বিগত দু'শতাব্দীর, সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও ধনলোভী বিদেশী বণিকের সুপরিকল্পিত লুন্ঠনের এটি ফলশ্রুতি।

(খ) সম্ভোগের ইচ্ছা মানুষের সহজাত। তাকে কৃত্রিমভাবে দমনের চেষ্টা অমানবিক।

(গ) মানুষের ধর্ম অনেকে মিলে বাস করা। কিন্তু অর্থোপার্জনের কাজে এই জায়গায় একটা বাধা ঘটে। অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা ও সামাজিক সুসামঞ্জস্যের মূল সমস্যা এইখানে।

(ঘ) যেকোন পশ্চাৎপদ দেশের দারিদ্র্যের সমস্যা আপেক্ষিক ও ঐতিহাসিক। তার সমাধান মানুষের শ্রম ক্ষমতারূপ মূলধনের সম্মেলনে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক উৎপাদন পদ্ধতির পূর্ণ-ব্যবহারে।

(ঙ) ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত উদ্যোগ কিছুদূর পর্যন্ত সাহায্য করে বটে কিন্তু বিপুল ধন ও ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে বৈষম্য এতদূর বাড়ে যে সমাজের মূল ভিত্তি সংকটগ্রস্ত হয়।

(চ) ধন সম্পদের ভোগের ইচ্ছা মানুষের সহজাত এবং আত্মপ্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। তাই একে অস্বীকার নয় বিরাটভাবে সার্থক করাতেই ভোগ সংকীর্ণতার সমাধান।

(ছ) অর্থনৈতিক বৈষম্যের সমাধানে বলপ্রয়োগ অনভিপ্রেত। কারণ ধনের অসাম্যের ভিত্তি মানব মনের গভীরে প্রোথিত।

(জ) যন্ত্র মানবসভ্যতার অগ্রগতির স্বাক্ষর। যন্ত্রকে পরিহার করে স্বল্পোপকরণ জীবন-যাত্রার আদর্শ অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তর। যন্ত্রকে পরিহার নয় সামবায়িক মালিকানায় যন্ত্রকে সামাজিক পীড়ন থেকে সামাজিক অগ্রগতির বাহনে পরিণত করার মধ্যেই সভ্যতার জয়।

এই প্রসঙ্গে একদিকে গান্ধীবাদের যন্ত্রবিমুখতা ও সম্ভোগবিরোধী অবাস্তব সংস্কার-বাদী সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় বলপ্রয়োগের তত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক পার্থক্য লক্ষণীয়।

রায়তের কথা

"আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। . . . তুমি বলেছ, জমি চাষ করে যে, জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে তা হবে জমি যদি পণ্যদ্রব্য হয়, যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে? . . .

"জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রী হয়ই তা হলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই। যে লোক চাষ করে না কিন্তু যার আছে টাকা, অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই। . . .

আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি আমাদের দেশের মূঢ় রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। এক সময়ে সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকী থাকবে?

রায়তের জমিতে জমাবৃদ্ধি হওয়া উচিত নয়, একথা খুব সত্য। রাজসরকারের সঙ্গে দেনা-পাওনায় জমিদারের রাজস্ববৃদ্ধি নেই, অথচ রায়তের স্থিতিস্থাপক জমায় কমা সেমিকোলন চলবে, কোথাও দাঁড়ি পড়বে না, এটা ন্যায়বিরুদ্ধ।"[৫০]

"বহু কাল থেকেই আশা করেছিলুম, আমাদের জমিদারি যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারি হয়—আমরা যেন ট্রাস্টির মত থাকি।... কিন্তু দিনে দিনে দেখলুম, জমিদারি-রথ সে রাস্তায় গেল না—তারপরে যখন দেনার অঙ্ক বেড়ে চলল তখন মনের থেকেও সংকল্প সরাতে হল।

ও জিনিষটার (জমিদারি) উপর অনেককাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার ছিল, এবার সেটা আরও পাকা হয়েছে। যে সব কথা বহুকাল ভেবেছি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারি-ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়।"[৫১]

"চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এসম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে—জমির সত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর; দ্বিতীয়তঃ, সমবায়নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙ্গল নিয়ে আল বাঁধা টুক্‌রো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা।"[৫২]

সিদ্ধান্ত ঃ

ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে জমির মালিকানা ও ব্যবহারের প্রশ্নটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রায়তের কথার ঐতিহাসিক বিতর্ক থেকে শুরু করে রাশিয়ার চিঠির কাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের এই সম্পর্কের চিন্তায় বিবর্তন হয়েছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যে পরিবর্তন স্ববিরোধী মনে হতে পারে একটু তলিয়ে ভাবলেই সেই পরিবর্তনকে চিন্তার ক্রমবিবর্তন হিসাবে বোঝা যাবে। প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত দেশপ্রেমিকদের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যে অনেক বেশী গভীর এবং সুদূরপ্রসারী ছিল তা আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা সহজতর।

অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপের সামন্ত প্রথার অবসান এবং কৃষিতে ব্যাবসায়িক মূলধনের অবাধ প্রবেশ অধিকারের ব্যবস্থা বিংশ শতাব্দীর উপনিবেশিক ভারতবর্ষের কৃষিতে প্রয়োগ করলে যে সংকট গভীরতর হবে একথা রবীন্দ্রনাথই বুঝেছিলেন। সেই কারণেই

জমিদারি ব্যবস্থার অক্ষমতা সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হয়েও যতদিন পর্যন্ত সামবায়িক কৃষির উৎপাদনের সম্ভাবনার সমাধান পাননি ততদিন ভূমিস্বত্ব বিষয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন। জমির মালিকানা যে চাষ করে তারই একথা যেমন অস্বীকার করতে পারছিলেন না তেমনই দরিদ্র চাষীকে জমি বেচার অধিকার দিলে সে জমিকে অর্থবান মালিকের গ্রাস থেকে রক্ষা করা যাবেনা---এই আশঙ্কা তাঁকে বিচলিত করেছিল। রাশিয়ায় সামবায়িক চাষের বিরাট সাফল্য তাঁকে জমিদারি উচ্ছেদ ও সমবায় প্রণালীর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে চূড়ান্তভাবে নিঃসন্দেহ করে।

সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা ঃ

হিন্দু-মুসলিম প্রশ্ন ঃ

রবীন্দ্রনাথের বিচারে ভারতবর্ষের ইতিহাসের মৌলিক সমস্যাই ঐক্যের সমস্যা। হিন্দু, মুসলিম, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সেই বৃহৎ ঐক্যের সমস্যারই অন্তর্ভুক্ত সমস্যা।

বিচার পদ্ধতির মূল ঐক্য বজায় থাকলেও রাষ্ট্রনৈতিক জটিলতার পরিবর্তনশীল পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের চিন্তারও ঝোঁকের লক্ষণীয় পার্থক্য ঘটেছিল। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলির কালানুক্রম লক্ষ্য করলে এই মিল ও পার্থক্য স্পষ্টতর হবে বলে আশা করি।

"আমরাও তাঁহাদের (বৃটিশ গভর্ণমেন্টের লেখক) কথা অবিশ্বাস করিনা। কংগ্রেসের প্রতি গভর্ণমেন্টের সুগভীর প্রীতি না থাকিতে পারে এবং মুসলমানগণ হিন্দুদের সহিত যোগ দিয়া কংগ্রেসকে বলশালী না করুক এমন ইচ্ছাও তাঁহাদের থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব; তথাপি রাজ্যের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের অনৈক্যকে বিরোধে পরিণত করিয়া তোলা কোন পরিণামদর্শী বিবেচক গভর্ণমেন্টের অভিপ্রেত হইতে পারে না। অনৈক্য থাকে সে ভালো, কিন্তু তাহা গভর্ণমেন্টের সুশাসনে শান্তমূর্তি ধারণ করিয়া থাকিবে। গভর্ণমেন্টের বারুদখানায় বারুদ যেমন শীতল হইয়া আছে অথচ তাহার দাহিকাশক্তি নিবিয়া যায় নাই — হিন্দু-মুসলমানদের আভ্যন্তরিক অসদ্‌ভাব গভর্ণমেন্টের রাজনৈতিক শস্ত্রশালায় সেইরূপ সুশীতলভাবে রক্ষিত হইবে, এমন অভিপ্রায় গভর্ণমেন্টের মনে থাকা অসম্ভব নহে।"

"আমাদের এমন সন্দেহ হয় যে ইংরাজ মুসলমানকে মনে মনে কিছু ভয় করিয়া থাকেন। এইজন্য রাজদণ্ডটা মুসলমানের গা ঘেঁষিয়া ঠিক হিন্দুর মাথার উপরে কিছু জোরের সহিত পড়িতেছে।

ইহাকে নাম দেওয়া যাইতে পারে 'ঝিকে মারিয়া বউকে শেখান' রাজনীতি।

জানিনা হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ অথবা ভারতবর্ষীয় ও ইংরাজের সংঘর্ষস্থলে আমরা যাহা অনুমান ও অনুভব করিয়া থাকি তাহা সত্য কি না, আমরা যে অবিচারের আশঙ্কা করিয়া থাকি তাহা সমূলক কি না; কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানি যে, কেবলমাত্র বিচারকের অনুগ্রহ ও কর্তব্যবুদ্ধির উপর বিচারভার রাখিয়া দিলে সুবিচারের অধিকারী হওয়া যায় না।"[৫৩] (১৩০১ বঙ্গাব্দ)

"আজ আমরা সকলেই এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি যে, ইংরেজ মুসলমান-

দিগকে গোপনে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। কথাটা যদি সত্যই হয় তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন। দেশের মধ্যে যতগুলি সুযোগ আছে ইংরেজ তাহা নিজের দিকে টানিবে না, ইংরেজকে আমরা এতবড়ো নির্বোধ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব এমন কী কারণ ঘটিয়াছে।

মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়। . . .

এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।

আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখ-দুঃখে মানুষ; তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই।

কোন বিখ্যাত 'স্বদেশী'-প্রচারকের নিকট শুনিয়াছি যে, পূর্ববঙ্গে মুসলমান শ্রোতারা তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া পরস্পরে বলাবলি করিয়াছে যে, বাবুরা বোধ করি বিপদে ঠেকিয়াছে। ইহাতে তাঁহারা বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু চাষা ঠিক বুঝিয়াছিল। . . .

হিন্দু-মুসলমান এক হইলে পরস্পরের কত সুবিধা একদিন কোনো সভায় মুসলমান শ্রোতাদিগকে তাহাই বুঝাইয়া বলা হইতেছিল। তখন আমি এই কথাটি না বলিয়া থাকিতে পারি নাই যে সুবিধার কথাটা এস্থলে মুখে আনিবার নহে; . . . কারণ ঘটনাক্রমে সুবিধার গতি পরিবর্তন হওয়াও আশ্চর্যকর নহে। . . . আমাদের পরস্পরের মধ্যে, সুবিধার চর্চা নহে, প্রেমের চর্চা, নিঃস্বার্থ সেবার চর্চা যদি করি তবে সুবিধা উপস্থিত হইলে তাহা পুরা গ্রহণ করিতে পারিব এবং অসুবিধা উপস্থিত হইলেও তাহাকে বুক দিয়া ঠেকাইতে পারিব।"[৫৪] (১৩১৪ বঙ্গাব্দ)

"ইংরেজ যদি মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া থাকে তবে ইংরেজ আমাদের একটি পরম উপকার করিয়াছে — দেশের যে—একটি প্রকাণ্ড বাস্তব সত্যকে আমরা সুচের মতো না বিচার করিয়াই দেশের বড়ো বড়ো কাজের আয়োজনের হিসাব করিতেছিলাম, একেবারে আরম্ভেই তাহার প্রতি ইংরেজ আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়াছে। . . .

এই সঙ্গে একটা কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দু ও মুসলমান, অথবা হিন্দুদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা উচ্চ ও নীচ বর্ণের মধ্যে মিলন না হইলে আমাদের কাজের ব্যাঘাত হইতেছে, অতএব কোনমতে মিলন সাধন করিয়া আমরা বল লাভ করিব, এই কথাটাই সকলের চেয়ে বড়ো কথা নয়, . . . এ নহিলে আমাদের ধর্ম পীড়িত হইতেছে, আমাদের মনুষ্যত্ব সংকুচিত হইতেছে। এ নহিলে আমাদের বুদ্ধি সংকীর্ণ হইবে, আমাদের জ্ঞানের বিকাশ হইবে না — আমাদের দুর্বল চিত্ত শত শত অন্ধসংস্কারের দ্বারা জড়িত হইয়া থাকিবে — আমরা আমাদের অন্তর-বাহিরের সমস্ত অধীনতার বন্ধন ছেদন করিয়া নির্ভয়ে নিঃসংকোচে বিশ্বসমাজের মধ্যে মাথা তুলিতে

পারিব না। সেই নির্ভীক নির্বাধ বিপুল মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবার জন্যই আমাদিগকে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরকে ধর্মের বন্ধনে বাঁধিতে হইবে।"[৫৫] (১৩১৫ বঙ্গাব্দ)

আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে। আমি যখন প্রথম আমার জমিদারি কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বসতে দিতে হলে জাজিমের এক প্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানে তাকে স্থান দেওয়া হত। অন্য-আচার-অবলম্বীদের অশুচি বলে গণ্য করার মত মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছু নেই।... ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল, আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয় ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যেদিকে দ্বার খোলা অন্য পক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে?... মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। য়ুরোপ সত্য সাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্য যুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁছেচে, হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে।"[৫৬] (১৩২৯ বঙ্গাব্দ)

"পৃথিবীতে অপ্রতিহত প্রভুত্ব নিয়ে রাজা যেমন কতবার দুর্দান্ত অরাজকতায় মত্ত হয়েছে, প্রজার রক্ষাকর্তা নাম নিয়ে প্রজার সর্বনাশ করতে কুণ্ঠিত হয়নি এবং সেই কারণেই আজকের ইতিহাসে রাজ্য থেকে রাজার কেবলই বিলুপ্তি ঘটছে, ধর্ম সম্বন্ধেও অনেকস্থলে সেই একই কারণে ধর্মতন্ত্রের নিদারুন অধার্মিকতা দমন করবার জন্যে অনেক-বার চেষ্টা দেখা গেল। আজ সেই সেই দেশেই প্রজা যথার্থ স্বাধীনতা পেয়েছে যে দেশে ধর্মমোহ মানুষের চিত্তকে অভিভূত করে এক দেশ-বাসীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঔদা-সীন্য বা বিরোধকে নানা আকারে ব্যাপ্ত করে না রেখেছে।

পলিটিক্সের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে যেটুকু তালি দেওয়া মিল হতে পারে সে মিলে আমা-দের চিরকালের প্রয়োজন টিকবে না।

ধরে নেওয়া গেল গোল বৈঠকের পরে দেশের শাসনভার আমরাই পাব।... সেইটি আমাদের বিষম পরীক্ষার সময়। সে পরীক্ষা সমস্ত পৃথিবীর কাছে। এখন থেকে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত থাকতে হবে যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টির সামনে মূঢ়তায় বর্বরতায় আমাদের নূতন ইতিহাসের মুখে কালি না পড়ে।"[৫৭] (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ)

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) হিন্দু মুসলমান সমস্যা ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ-শূদ্র, উচ্চ-নীচ ভেদেরই মত অমানবিক সমাজবিধি ও আচরণ উদ্ভূত।

(খ) আমাদের মধ্যে এই বিভেদের অস্তিত্বই ইংরেজ সরকারকে সাম্প্রদায়িক বিভেদের অস্ত্র ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছে। অবশ্য গভর্ণমেন্টের বিভেদনীতির সম্যক রূপ সম্পর্কে চেতনায় রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকে এবং পরে কিছু পার্থক্য ঘটে। বঙ্গভঙ্গ ষড়যন্ত্রের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক সমস্যা বিশেষত হিন্দু-মুসলিম সমস্যায় ব্রিটিশ

সরকারের নিরপেক্ষতায় সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। বঙ্গভঙ্গের পরবর্তীযুগে তাঁর এই বিশ্বাস নষ্ট হয়। তা সত্ত্বেও তিনি এই সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার মূল দায়িত্ব ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতির উপরই নির্দিষ্ট করেন।

(গ) হিন্দু-মুসলিম সমস্যা যেহেতু সামাজিক সমস্যা তাই এর সমাধানও রাজনৈতিক প্রয়োজন অনুবর্তী করার চেষ্টা করলে ব্যর্থ হবে। হিন্দু-মুসলিম মিলন হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মমোহ ও অমানবিক আচারকে অক্ষত রেখে সম্ভব হবে না। আধুনিক জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তার এবং ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়েই তা অর্জন করতে হবে।

(ঘ) রাজনৈতিক ক্ষমতা পাবার লোভে রচিত কোনও সুবিধাবাদী সমাধানই ক্ষমতা-হস্তান্তর-পরবর্তী পরীক্ষায় আমাদের উত্তীর্ণ করতে পারবে না।

উদ্ধৃতি নির্দেশিকা

ক্রমিক সংখ্যা	পুস্তক	খণ্ড	পৃষ্ঠা	রচনাকাল*
১	রবীন্দ্র রচনাবলী†	দ্বাদশ	১৭৫	—
২	—	—	১৭৬	—
৩	—	ত্রয়োদশ	৩৬৯-৭০	১৩৩৬ বঃ
৪	—	—	—	১৩৩১
৫	—	দ্বাদশ	৩৬৭-৬৮	—
৬	—	—	১৩৫—৩৭	—
৭	—	ত্রয়োদশ	৪১৯-২০	১৩২৫ বঃ
৮	—	—	৩০৭	১৩৩০ বঃ
৯	—	—	৩২৭	১৩৩২
১০	—	—	৩০৬	১৩৩০
১১	—	—	৪৫০-৫১	—
১২	—	—	৪৫১	—
১৩	—	—	—	—
১৪	—	—	—	১৩৩২ বঃ
১৫	—	—	—	—
১৬	—	—	১৪৪	১৩১৮ বঃ
১৭	—	দ্বাদশ	১০৪৩	১৩০৯ বঃ
১৮	—	ত্রয়োদশ	১০৮	১২৯৮ বঃ
১৯	—	দ্বাদশ	১০৫৮-৬১	১৩০৮ বঃ
২০	—	—	—	১৩০৮ বঃ

* বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকৃত জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ বুঝাইবে।

† রচনাকাল প. ব. সরকারকৃত সংস্করণ উল্লিখিত কালনির্দেশ অনুসরণ করা হইয়াছে, রচনাকাল উল্লিখিত না থাকিলে লেখক সুনির্দিষ্ট রচনাকাল নির্ধারণ করিতে পারেন নাই বুঝিতে হইবে।

ক্রমিক সংখ্যা	পুস্তক	খণ্ড	পৃষ্ঠা	রচনাকাল
২১	রবীন্দ্র রচনাবলী	দ্বাদশ	১০৫৮-৬১	১৩০৮ বঃ
২২	—	—	ঐ	১৩০৮ ,,
২৩	—	একাদশ	৭৮৫-৮৬	১৩৩২ ,,
২৪	—	দ্বাদশ	১০৬৩-৬৪	১৩০৮ ,,
২৫	—	—	১০৬৫	১৩০৮ ,,
২৬	—	—	৭০১	১৩১১ ,,
২৭	—	—	৬৮২	১৩০৮ ,,
২৮	—	ত্রয়োদশ	৫১০-১৩	১৯৩৪ খ্রীঃ
২৯	—	ত্রয়োদশ	৫২৯	১৯৩৪ ,,
৩০	—	—	৫৩০	১৯৩৪ ,,
৩১	—	—	৫৬৭	১৩৪৩ বঃ
৩২	—	—	৫৬৮	১৩৪৩ ,,
৩৩	—	—	৫৭৯-৮০	১৯৩০ খ্রীঃ
৩৪	—	—	৫৩৮-৩৯	১৩৪৬ বঃ
৩৫	—	—	৫৪৩-৪৪	১৯৪০ খ্রী
৩৬	—	—	৫৪৪	১৯৪০ ,,
৩৭	—	—	৫৮২	১৯৩৪ ,,
৩৮	—	—	৪১৫-১৬	১৩২৫ বঃ
৩৯	—	দশম	৭২০	—
৪০	—	ত্রয়োদশ	৪১৬-১৭	১৩২৫ ,,
৪১	—	—	৪১৯-২০	১৩২৯ ,,
	—	—	৪২০-২১	১৩২৯ ,,
৪২	—	—	৪২০-২১	১৩২৯ ,,
৪৩	—	—	৪২৫-২৬	১৩৩৪ ,,
৪৪	—	—	৪২৯	১৩৩৫ ,,
৪৫	—	—	৪৩২	১৩৩৫ ,,
৪৬	—	—	৪৩৩	১৩৩৫ ,,
৪৭	—	—	৪৩৩-৩৪	,, ,,
৪৮	—	—	৪৩৪-৩৫	,, ,,
৪৯	—	—	৪৩৭	১৩৩২ ,,
৫০	—	—	৩৪৭-৫০	১৩৩৩ ,,
৫১	—	দশম	৬৮৪	১৯৩০ খ্রীঃ
৫২	রাশিয়ার চিঠি	—	১৪৭	১৯৩০ ,,
৫৩	রবীন্দ্র রচনাবলী	দ্বাদশ	৯৫৩-৫৭	১৩০১ বঃ
৫৪	—	—	৯০৮-১০	১৩১৪ ,,
৫৫	—	দ্বাদশ	১০০১-০৩	১৩১৫ ,,
৫৬	—	ত্রয়োদশ	৩৫৭	১৩২৯ ,,
৫৭	—	—	৩৬৩-৩৬৯	১৩৩৮ ,,